একাত্মপীঠের সাধক

নিগূঢ়ানন্দ

শরৎ পাবলিশিং হাউস
১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
নববর্ষ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক
সত্যেন্দু চ্যাটার্জী

মুদ্রক
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০০০৪

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

যাঁরা এখন স্বর্গে আছেন সেই মা ও বাবার
পুণ্যস্মৃতি স্মরণে।

এই লেখকের

মহাতীর্থ একান্নপীঠের সন্ধানে (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সতীতীর্থ ছাব্বিশ উপপীঠের সন্ধানে

রাজপথ তীর্থপথ

খুঁজে ফিরি কুণ্ডলিনী

সর্পতান্ত্রিকের সন্ধানে

প্রভৃতি।

একান্নপীঠ একটা প্রবল কৌতূহলের বিষয় শাক্তদের কাছে। এই একান্নপীঠের গল্পকথা আমরা সবাই জানি। দক্ষযজ্ঞে দক্ষকন্যা সতী শিবনিন্দা শুনে করেছিলেন দেহত্যাগ। দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করে শোকে মুহ্যমান শিব সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে গেলেন ভারত পরিক্রমায়, বিষ্ণু তাঁর সুদর্শনচক্র দিয়ে সেই দেহ কেটে দিলেন টুক্‌রো টুক্‌রো করে। উদ্দেশ্য শিবকে মৃত পত্নীর দেহ থেকে মুক্ত করা। বিষ্ণুচক্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে সতীর দেহ ভারতের একান্নটা স্থানে পড়েছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। যেসব স্থানে পড়েছিল সতীদেহের এইসব নানা অংশ সেইসব স্থানে শিবও বিরাজ করতে লাগলেন ভৈরব হয়ে লিঙ্গরূপে। শিবশক্তির উপাসকদের কাছে এইসব তীর্থস্থান অতি পবিত্র। দক্ষযজ্ঞের এ কাহিনী নিয়ে নানা মত আছে, ঐতিহাসিকদের নানা ব্যাখ্যা। সে-সব ব্যাখ্যায় আমাদের প্রয়োজন নেই। তবে একটি প্রশ্ন বড় প্রশ্ন। সে প্রশ্ন এই যে, এই একান্নপীঠ কি কেবলমাত্র মাতৃপূজারী অর্থাৎ শক্তি পূজারীদেরই স্থান, না অন্যান্য ধর্মপিয়াসী ও মুক্তি পিয়াসীদেরও তীর্থক্ষেত্র? হিন্দুদের মধ্যে দেবতার উপাসক হিসেবে তিনটি শ্রেণী খুবই বিখ্যাত—বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত। অন্যান্য দেবতাদের নামে এবং গুরুদের নামেও যে উপাসক সম্প্রদায় নেই তা নয়। কিন্তু তাঁরা তেমন প্রবল নয়, একমাত্র দাক্ষিণাত্যে গণপতি বা গণেশের উপাসক সম্প্রদায় ছাড়া। সুতরাং এই সব শাক্তপীঠে কারা যান তীর্থ করতে? কারা যান সাধনা করতে?

শাক্তপীঠে সাধনার ধারা হল তন্ত্রমতে। তন্ত্র জিনিসটাই শৈবদের দান। শাক্তরাও তন্ত্রপথের পথিক। বৈষ্ণবরাও যে তন্ত্রহীন তা নয়। এমন কি জৈন ও বৌদ্ধধর্মেও তন্ত্র আছে। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মেও

তন্ত্রের প্রভাব পড়েছিল এত যে, বলা যায় না। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে মনে হয়, বৌদ্ধতন্ত্র, শৈবতন্ত্রের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে গিয়েছিল যে, দুইয়েকে ভিন্ন করাই কষ্টকর। তাছাড়া বৌদ্ধরাও গৌতম বুদ্ধের শক্তি হিসেবে কল্পনা করেছিলেন নানা শক্তিমূর্তি—যেমন প্রজ্ঞাপারমিতা, তারা ইত্যাদি। এখন কথা, কারা ঐ শাক্তপীঠের সাধক? শুধুমাত্র যাঁরা ৺কালী ৺দুর্গা প্রভৃতি হিন্দু শাক্তদেবীতে বিশ্বাস করেন তাঁরাই, না আরও কেউ?

তন্ত্রপীঠে যাঁরা তন্ত্রমতে সাধনা করেন তাদের তন্ত্রের ধারা শৈব শাক্ত দুইয়ের ক্ষেত্রেই এক। শৈব চান পরমপুরুষ শিবের স্পর্শ পেয়ে মুক্তি লাভ করতে। সে জন্য দেহের ষটচক্র ভেদ করে তাঁরা লিঙ্গমূলের নিকটবর্তী চেতনাকে ঊর্ধ্বে সহস্রারে নিয়ে যান। শাক্তরা মনে করেন লিঙ্গমূলের কাছে মূলাধারে শক্তি আছেন ঘুমিয়ে, তাঁকে জাগরিত করে সহস্রারে নিয়ে গেলেই হয় সিদ্ধিলাভ। শক্তি উপাসনার কোন মূল্যই নেই যদি না শিবশক্তির মিলন ঘটানো যায় দেহের অভ্যন্তরে। নানামত নানাপথে সেই এক দিকেই এগোন শৈব এবং শাক্ত সাধকেরা। বৈষ্ণবদের মধ্যেও তন্ত্র আছে। পুরুষের গুণ হিসেবে শক্তিরূপা দেবী আছেন। কিন্তু তাঁদের সাধনা নয় শাক্ত ও শৈবদের মত। তাঁদের পীঠ, তাঁদের তীর্থক্ষেত্র আলাদা। মূলতঃ শাক্তপীঠের সাধক হলেন শৈব এবং শাক্ত উভয়েই। সুতরাং একান্নপীঠের সাধকদের আলোচনা-প্রসঙ্গে শাক্ত ও শৈবদের উপরই মূলতঃ নির্ভর করতে হবে আমাদের। যদিও অন্যান্য সাধনার ধারাও টিকে আছে এই তান্ত্রিক সাধকদের মধ্যে। মুখে কালী কালী তারা তারা বললেই যে শাক্তসাধক তা নয়—যেমন ধরুন, তারাপীঠের তারা মূলতঃ বৌদ্ধদেবী। তেমনই অনেক স্থানে মহাকালীর রূপও এসেছে বৌদ্ধতন্ত্র থেকে। আবার তারকেশ্বরের শিবসাধনায় 'ভোলে বাবা পার করেগা' বললেই শিব-সাধক হওয়া যায় না। কারণ তারকেশ্বরের শিব হলেন নাথপন্থীদের জটেশ্বর শিব। পরে হয়েছেন তারকনাথ শিব। এই নাথপন্থীরা মূলতঃ

ছিলেন বৌদ্ধ। অন্ততঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর তাই অভিমত। সুতরাং, শাক্তপীঠ বা শাক্তপীঠের সাধকের চরিত্র নিরূপণ করা দুরূহ ব্যাপার।

তন্ত্রসাধনার নানা ধারা আছে ভারতবর্ষে। এই সব নানা ধারার তন্ত্রসাধকই সাধনা করেছেন শাক্তপীঠে। সুতরাং একমাত্র শক্তির উপাসকই যে শাক্তপীঠের সাধক তা নয়। ভিন্নপথের সাধনপন্থীও হয়তো সাধনা করেছে একান্নপীঠে, সুতরাং একান্নপীঠের সাধকদের আলোচনা কালে তাঁদেরও নাম এসে যেতে পারে অবধারিত রূপেই। বৈষ্ণব বাদে (অবশ্য বৈষ্ণবদের মধ্যেও অনেকে যে শাক্ত পীঠে সাধনা করেননি তা নয়) শৈব, দশনামী, দণ্ডী, সন্ন্যাসী—(যাঁদের মধ্যে আছেন অবধূত, নাগা, আলেখিয়া, দঙ্গলী, অঘোরী, অবধূতানী, ব্রহ্মচারী, যোগী ইত্যাদি) শাক্ত (যাঁদের মধ্যে আছেন পশ্বাচারী, বীরাচারী ইত্যাদি) অসংখ্য শ্রেণীর সন্ন্যাসীই সাধনা করেছেন এই পীঠে। এমনকি বৌদ্ধতন্ত্র মতে বিশ্বাসীরাও যে সাধনা করেননি এসব তীর্থে তা বলা যায়না জোর করে। সুতরাং একান্নপীঠের সাধকদের আলোচনা প্রসঙ্গে কোন্ জাতীয় সাধকের আলোচনা হবে সে-কথা বলা দুষ্কর। তাছাড়া এই সব পীঠের কোন্ পীঠ থেকে আরম্ভ করা হবে সাধকদের কাহিনী সেকথা বলায়ও অত্যন্ত অসুবিধা। সাধু সন্ন্যাসীর দেশ ভারতবর্ষে অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসীর শেষ নেই। তাঁদের মধ্যে প্রতারক জোচ্চোর আছে অনেকেই, আবার যথার্থ সাধু সন্ন্যাসীও আছেন বহু জনেই। এঁদের খুঁজে বের করে পরিচিত করা আকাশের এক একটি নক্ষত্রকে চিহ্নিত করার মতনই অসম্ভব। তাছাড়া বড় অসুবিধা এই যে, অনেকেই বিশেষ একটি শ্রেণীর নামেই চিহ্নিত, স্বতন্ত্র নাম নিয়ে নেই, যেমন অঘোরী বাবা, পরমহংস অবধূত ইত্যাদি। সেজন্য এইসব পার্থিব জগৎ সম্পর্কে উদাসীন শ্মশানচারী, প'হারী, স্বল্পহারী, মৌনী, স্বল্পবাক্ ইত্যাদি সাধকদের জীবনী আলেখ্য রচনা করাও কঠিন। বিশেষকরে শ্মশানচারী সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে তথ্য আহরণ করা অসম্ভব। তা ছাড়া এক একটি পীঠে অসংখ্য পুণ্যপ্রয়াসী সাধক করেছেন সাধনা। সুতরাং প্রত্যেকটি পীঠে প্রত্যেকটি

সন্ন্যাসী সম্পর্কে আলোচনা করা সাধ্যের অতীত। প্রতিনিধি স্থানীয় দু'একজন যাঁদের সম্পর্কে জানা যায়, যাঁরা অলৌকিক ক্ষমতাবলে চমক সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের সাধক জীবনে, তাঁদের সম্পর্কেই মাত্র করা যেতে পারে আলোচনা। এছাড়া পীঠে পীঠে সাধনপ্রয়াসী সন্ন্যাসীদের আছে বিচিত্র বিশ্বাস। তাঁরা মনে করেন, যত সম্ভব বেশী পীঠে সাধনা করাতেই সার্থকতা। যেমন শাক্ত তান্ত্রিকেরা মনে করেন যে, একান্ন পীঠে সাধনা করা তাঁদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। সেদিক থেকে ধরতে গেলে অধিকাংশ সন্ন্যাসীই প্রায় সর্বতীর্থের সাধক। শাক্তেরা প্রায় অধিকাংশই ভ্রমণ করেছেন একান্নপীঠে। ফলে কোন এক সাধকের নাম যদি একটি পীঠে করা যায় তাহলে তিনি যে অন্য পীঠে ছিলেন না এমন অনুমান করা অনুচিত। সেইজন্য একান্নপীঠের সাধক সম্পর্কে আলোচনা করতে যাওয়া জটিল একটা সমস্যার ব্যাপার। তবু সেই দুঃসাহসে ব্রতী হচ্ছি প্রকাশকের ইচ্ছাতে, বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন জনৈক তন্ত্রসাধকের প্রেরণায় এবং পুণ্যসঞ্চয়কারীদের মধ্যে অনেকের কৌতূহলের তাড়নায়। এই মহাব্রত উদ্‌যাপন করতে পারব কিনা জানি না। আমি চিরকালই বিশ্বাস করি, আমাদের সচেতন ইচ্ছার পেছনে আছে আর এক ইচ্ছা। সে ইচ্ছা যিনি পরিচালনা করেন তিনিই হলেন ইচ্ছাময়ী। তাঁর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে হাত দিচ্ছি এই দুরূহ কাজে। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

করতোয়াতটের সাধক

কাকে নিয়ে আরম্ভ করি সেটাই সমস্যা। একান্নপীঠের কোন্ পীঠ যে আগের পীঠ সে-কথা বলবে কে? সতীর দেহের কোন্ অংশ আগে খসে পড়েছিল কোথায় সে-কথা বলবার নেই কেউ। তবে পীঠ-নির্ণয়, শিবচরিত, তন্ত্রচূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থের তালিকায় গ্রন্থকারেরা একটা বিশেষ ধারণায় একের পর এক কতকগুলি পীঠের করেছেন সংযোজনা। এই সংযোজনাতেও একের সঙ্গে অপরের নেই তেমন মিল। সুতরাং একান্নপীঠের কোন পীঠের একটিকে নিয়ে আরম্ভ করলে ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু আছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া একান্নপীঠের নাম নিয়েও আছে মতভেদ, যেমন, তারাপীঠকে পীঠনির্ণয় বলেননি একান্ন-পীঠের এক পীঠ। অথচ শিবচরিতে তারাপীঠকে স্থান দেওয়া হয়েছে তৃতীয়ে। আবার উজ্জয়িনী পীঠকে বহুজনেই মেনেছেন পশ্চিমবঙ্গের উজানী পীঠ বলে। অথচ উজ্জয়িনীতেও একান্নপীঠের একপীঠ আছে বলে অনেকেই করেছেন কল্পনা। এমনি মতভেদ আছে জয়ন্তী, শ্রীপর্বত, প্রভাস আদি নানা পীঠ নিয়েও। সুতরাং একটি বিশেষ গ্রন্থ নির্দেশিত পীঠের বাইরে অন্য পীঠের সাধক নিয়ে যদি করি আলোচনা—তাতেও যে একান্নপীঠের সাধক সম্পর্কে আলোচনা হবে না তাও নয়। সুতরাং সাধকজীবনী রচনাতে এক্ষেত্রে লেখকের স্বাধীনতা থাকাই বাঞ্ছনীয়। সেই স্বাধীনতা নিয়েই আরম্ভ করছি বর্তমান এই সাধকপ্রসঙ্গ আলোচনা।

পাবনার স্থলের পাকড়াশীদের এক বংশধর ৺গোপেন্দ্রলাল পাকড়াশী, দেশ বিচ্ছেদের পর বাড়ি করেছেন বেহালার বিশালক্ষ্মী তলায়। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত নিবিড় পরিচয় ছিল এবং আত্মীয়তা। স্বগৃহে তন্ত্রমতে অষ্টধাতুর কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন

তিনি। অদ্যাবধি তাঁর পূজা হয়। স্বর্গীয় গোপেন্দ্রলাল পাকড়াশী ছিলেন গৃহী সাধক। ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না তাঁর। তবে ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও তিনি পরমৈশ্বর্য কামনা করতেন। আমার সঙ্গে তাঁর যতবার আলোচনা হত, ততবারই আলোচনার বিষয় হত অতীন্দ্রিয় জগৎ। নিজের শোবার ঘরে ৺মা কালীর এক ছবি ছিল। সেই ছবিতে শিবের বুকের ওপর দণ্ডায়মানা ৺মায়ের ঊর্ধ্ব দুইদিকে ছিল দুটি যুগল মূর্তি। একদিকে শিব আর রাধার যুগলরূপ। আর এক দিকে কালী আর কৃষ্ণ। নিচে একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ আর একদিকে সারদামণি, মাঝখানে বিবেকানন্দ। ওঁ-এর মধ্যে মা কালীর ছবি। মাঝে মাঝেই আমাকে বলতেন ঐ প্রতীক ছবির বর্ণনা করতে। নানা প্রকার মনগড়া ব্যাখ্যা করেছি আমি। কোনটাই তাঁর মনঃপুত হয় নি। অবশ্য নিজেও কখনও আমাকে তিনি ব্যাখ্যা করে দেন নি সেই ছবির অর্থ। আমি ব্যর্থ হলে প্রসঙ্গান্তরে চলে যেতেন। অন্য কোন অতীন্দ্রিয় বিষয় নিয়ে কথা আরম্ভ করতেন।

স্বর্গীয় গোপেন্দ্রলাল পাকড়াশীর কাছে প্রায়ই শুনতাম বগুড়ার জঙ্গলে এক সন্ন্যাসীর কথা। সন্ন্যাসী ঘোরতর তান্ত্রিক। সারাদিন সারারাত কোথায় থাকতেন জানে না কেউই। একটা নির্দিষ্ট সময় আসতেন পূজো দিতে মন্দিরে। বহুলোক নানা মানসিক করে পাঁঠা বলি দিতে আসতেন সেখানে। এক অলৌকিক রহস্যে সেই পাঁঠাগুলো বলি দিতেন তিনি। যাঁরা মানসিক পূজো দিতে আসতেন, তাঁদের কাছ থেকে একে একে পাঁঠাগুলি নিয়ে যেতেন ৺মায়ের প্রাঙ্গনে মাটিতে পোতা হাঁড়িকাঠের কাছে। গিয়ে বলতেন, ধর্ বেটি ধর্। পাঁঠা নাকি নিজে থেকেই গলা বাড়িয়ে দিত হাঁড়িকাঠে। নিজের শূন্য হাতটাই সেই পাঁঠার গলার উপর চালিয়ে দিতেন সন্ন্যাসী। দ্বিখণ্ডিত ছিন্নশির মাটিতে পড়ে যেত। আশ্চর্য এবং অলৌকিক সন্দেহ নেই। আমি এক অবাক কৌতূহলে বগুড়ার সেই সন্ন্যাসীর কথায় শুনতাম। ভাবতাম, বগুড়ার সেই মন্দিরের কথাও। সেই আমার চর্মচক্ষে না

দেখা স্থানটি অলৌকিকতায় ভরে উঠত। বগুড়ার সেই মন্দির, মন্দিরের বিগ্রহ এবং তান্ত্রিক সন্ন্যাসীকে নিয়ে ভাবতাম। আশ্চর্য পুণ্যস্থান বলে মনে হত স্থানটিকে।

বগুড়ার পুণ্যত্ব সম্পর্কে তখনও কোন ধারণাই ছিলনা। বহুদিন পরে আমার বর্তমান প্রকাশকের তাড়নায় যখন 'মহাতীর্থ একান্নপীঠের সন্ধানে' গ্রন্থ লিখি, তখন চোখে পড়ে বগুড়ার এই অঞ্চল। এ-স্থান সামান্য নয়। শাক্তদের কাছে অলৌকিক পুণ্যস্পর্শ ভরা এই স্থান। একান্নপীঠের এক পীঠ এই স্থানটি। সেই সত্যযুগ থেকে সতী ৺মায়ের পুণ্য দেহাংশ ধরে বর্তমান। তবে বগুড়া নাম নিয়ে এ স্থান যে চিরকালই এমনভাবেই বিরাজ করত, তা নয়। যুগে যুগে নানা ভাবেই নাম পাল্টেছে স্থানটির। কিন্তু তার পুণ্যস্মৃতি ও পুণ্যদায়িনী শক্তি পাল্টায় নি একটুও।

পীঠনির্ণয়ে একান্নপীঠের বর্ণনা প্রসঙ্গে এ স্থানের নাম করা হয়েছে 'করতোয়াতট'। এখানে সতী ৺মায়ের বামকর্ণ বা গুল্‌ফ বা তল্প পড়েছিল বলে ধারণা। তাই বলা হয়েছে :

'করতোয়া তটে তল্পং বামে বামন ভৈরব।
অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা॥'

এই করোতোয়াতটই আধুনিককালের বগুড়া। ইতিহাস বর্জিত এবং ঐতিহ্য বর্জিত যে, তা নয়। পুণ্যতোয়া করতোয়া একে পুণ্যক্ষেত্রে এবং ইতিহাসক্ষেত্রে পরিণত করেছে। উত্তরভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে যেমন গঙ্গা, তেমনি উত্তরবঙ্গে একদা ছিল এই পুণ্যসলিলা করোতোয়া। গায়ত্রী মন্ত্রে করতোয়ার নাম না থাকলেও এর পুণ্যদানের ক্ষমতা বিন্দু-মাত্র কম নেই। করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্র নদীর মধ্যাঞ্চলে সমগ্র ভূ-ভাগে এ নদী এক সময় পুণ্যতোয়া হিসেবেই খ্যাত ছিল। মৎস্যনারী সদৃশা নদীদেবী কৌশিকী এই সমগ্র ভূ-ভাগে পূজা পেতেন পরম শ্রদ্ধায়। গঙ্গার উৎপত্তি যেমন বিষ্ণুর-পাদদেশ থেকে তেমনি মহাদেবের করবারি থেকে করতোয়া নদীর উৎপত্তি বলে বিশ্বাস। দেবাদিদেবের করবাধি

থেকে জন্ম বলেই ব্রহ্মা এর নাম রেখেছিলেন করতোয়া। স্কন্দপুরাণে করতোয়ার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে এই বলে :

'করতোয়ে ! সদানীরে সরিৎ শ্রেষ্ঠেতি বিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে।
তত্তুল্য রূপসী নদী ন ক্বাচিৎ।
রজো বিহীনা তরুণী যতোসি ধন্যাসি সবিদ্বরাসি।
শ্রীকণ্ঠ পাণি প্রভবে নমস্তে।'

অর্থাৎ হে করতোয়ে তুমি সরিৎশ্রেষ্ঠা বলে বিশ্রুতা। হর করোদ্ভবে তুমি প্রতিনিয়ত পৌণ্ড্রদেশকে প্লাবিত করছ, পাপ হরণ করছ। তোমার তুল্য রূপবতী নদী নেই। যেহেতু তুমি তরুণী হয়েও রজোবিহীনা, অতএব তুমি ধন্যা ও পুণ্যা, তোমাকে নমস্কার করি।

এই পুণ্যতোয়া করতোয়াতটেই কোথাও সতীর বামকর্ণ বা তল্প অথবা গুল্ফ পড়েছিল বলে পীঠনির্ণয়ে বলা রয়েছে। পীঠনির্ণয়ে বলা হয়েছে :

'করতোয়া তটে তল্পং (কর্ণো) বামে বামন ভৈরব।
অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা ॥'

অর্থাৎ পুণ্যতোয়া করতোয়া তটে পড়েছে সতীর তল্প (পৃষ্ঠদেশের মাংস)। এখানে দেবীর নাম অপর্ণা। তাঁর বামে ভৈরবের নাম বামেশ। স্রোতস্বিনী করতোয়া ব্রহ্মরূপিনী। এই নদী অপর্ণাদেবীর মহাত্ম্য প্রচার করে চলেছে।

পীঠনির্ণয় বর্ণিত এই করতোয়াতট হল পাবনা জেলার উত্তরে এবং বগুড়া জেলার দক্ষিণে প্রায় একশ' বর্গ মাইল স্থান জুড়ে। সতীর অঙ্গ পতনের ফলে এ অঞ্চল গড়ে উঠেছে বিশেষ এক শাক্তপীঠ হিসেবে।

এ অঞ্চলে প্রাচীনকালে অরণ্যচারী এক নগ্ন জাতি বাস করত বলে বিশ্বাস। তাদেরই উলঙ্গদেবী অপর্ণাদেবী নামে বিখ্যাত। অপর্ণা নাম হয়েছে, এই করণে যে, পর্ণ দ্বারাও তিনি আচ্ছাদিতা ছিলেন না।

অপর্ণাদেবী এখনো এ অঞ্চলে বর্তমান। নানা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী। মহাশক্তি হিসেবে আজও অত্যন্ত শ্রদ্ধার এবং ভয়েরও। অদ্যাবধি বহু পুণ্যার্থী ভিড় করেন এখানে। দেবী তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। দেবীর অত্যন্ত প্রিয় ভোগ ছানা, মাংস ও তালবড়া। এ-থেকে অনেকের ধারণা তিনি মূলতঃ ছিলেন অনার্য দেবী। কিন্তু বর্তমানে তাঁর ভক্তের ইতিহাস দিয়ে বিচার করে না কেউ তাঁকে। জগজ্জনীকে স্বয়ং মহামায়া বলে বিশ্বাস করে। এবং পীঠনির্ণয় বর্ণিত অপর্ণা নামও দেবীর আর নেই। দেবীর নাম আজ ভবানী। এর পেছনেও ইতিহাস আছে। কিংবদন্তীর ধারা বেয়ে, সেই ইতিহাস এসেছে শেষপর্যন্ত।

স্থানীয় লোকের বিশ্বাস এ মহাপীঠের উৎপত্তি হল সত্যযুগে। আজ দেবীর অবস্থান হিসেবে এ স্থানের নাম ভবানীপুর—কিন্তু সত্য-যুগে এ নাম ছিল না। পীঠনির্ণয় দেবীর তল্পপাত হয়েছে বলে বর্ণনা করলেও ভিন্ন মতে সতীর গুল্‌ফ এখানে পড়েছিল বলে বিশ্বাস। সেই গুল্‌ফ থেকেই এ অঞ্চলের নাম হয়েছিল গুল্‌ফাপুরী। প্রাচীন নাম যে গুল্‌ফাপুরী ছিল তা মিথ্যে নয়। কারণ মহাভারতেও গুল্‌ফাপুরীর উল্লেখ আছে। দ্বাপরযুগের শেষে পৌণ্ড্রপতি বাসুদেব গুল্‌ফাপুরীর খুব শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। পরে করতোয়াতটে কমলপুর নামে এক সমৃদ্ধশালী রাজ্য গড়ে উঠেছিল। বঙ্গদেশের সেন রাজাদের এক জ্ঞাতিবংশ এখানে শাসন করতেন। ভাগ্যবিপাকে সেনরাজ্যের মত কমলপুরও একদিন ধ্বংস হয়ে যায় যবনদের হাতে। তখন কোন এক মহাপুরুষ সতীর সেই দেহাংশকে অপবিত্রতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মাটির গহ্বরে লুকিয়ে রেখেছিলেন। প্রায় ছ'শ বছর আগে গুল্‌ফাপুরীতে বা কমলপুরে যবন আক্রমণ ঘটেছিল। তারপর দীর্ঘদিন দেবী ছিলেন অদৃশ্যে অনাবিষ্কৃতা। দীর্ঘ দেড় বছর অনাবিষ্কৃতা থাকার পর দেবী আবার নিজেই নিজের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেন ভক্তজনের সামনে।

দেবীর অস্তিত্ব ঘোষণা নিয়ে গল্পও আছে। একদিন এক শাঁখারী যাচ্ছিল নদীর ধার ধরে। এক মনোহারিণী কালো রমনী এসে তাঁর কাছে চাইল শাঁখা। দাম চাইলে বিশেষ এক স্থানীয় ব্যক্তির নাম করল। বলল, দাম দেবে সে। শাঁখারী সরল বিশ্বাসে শাঁখা দিয়ে এসে ঢুকল গ্রামে। দাম চাইল সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে। সে তো অবাক। তাঁর কোন মেয়েই নেই। সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমল চারদিকে। শাঁখারীকে সবাই ধরল, কোথায় কে নিয়েছে শাঁখা দেখাবে আমাদের। শাঁখারী প্রতারণা করেনি, মিথ্যে বলেনি, ভয় কি। সবাইকে নিয়ে সে এল নদীর ধারে। কিন্তু মেয়ে কোথায়? শাঁখারীর মুখ শুকিয়ে উঠল লজ্জায় আর চিন্তায়। উপস্থিত সকলেরও জমে উঠল ক্ষোভ। অসহায় শাঁখারী নিরুপায় হয়ে তাকালো নদীর দিকে। অবাক হয়ে দেখল নদী থেকে উঠেছে দুটো কালো হাত। নতুন শাঁখা পরা। সমবেত মানুষও দেখল সেই দৃশ্য। এদৃশ্য অলৌকিক সন্দেহ নেই। ক্রোধ গেল, দুঃখ গেল। সকলের হৃদয় ভরে উঠল অলৌকিক আনন্দে। বহুপুণ্যফল না থাকলে স্বচক্ষে দেখা যায় না এ-দৃশ্য। সেই পুণ্যফলের পথ তৈরি করে দিয়েছে শাঁখারি। সকলে কৃতজ্ঞতা জানাল সেই শাঁখারীকে। দাম দিতে এগিয়ে এলেন সেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিটি। কিন্তু শাঁখারী বলল—দামে তার আর কাজ নেই। অমূল্য মূল্য পেয়েছে সে সামান্য জিনিসের বিনিময়ে। সে চলে গেল হৃদয় পূর্ণ করে।

শাঁখারী চলে গেল কিন্তু স্থানীয় লোকের চিন্তা আরম্ভ হল তখনই—এ মেয়ে তো মেয়ে নয়, ইনিই নিশ্চয়ই স্বয়ং সেই অপর্ণা,—সতীর তল্প বা গুল্‌ফজাত মহাদেবী। লোকচক্ষুতে আবার হয়তো দেখা দিতে চান তিনি। কোথায় পাওয়া যাবে সতীর সেই পবিত্র অঙ্গ? কোথায় পাওয়া যাবে সেই দেবী অপর্ণাকে?

বগুড়া জেলার বর্তমান ভবানীপুরের নৈঋত কোণে মাইল পাঁচেক দূরে আজও আছে সুপ্রাচীন সেই গুল্‌ফাপুরীর ভগ্নাবশেষ। সেখানে সে-সময় ছিল মহারণ্য। সেই অরণ্যে দেবী একদিন নিজেই হদিস

দিলেন ভক্তজনকে নিজের অস্তিত্বের। রোজই দেখা যেত একটি গাভীন গরু অরণ্যের বিশেষ একটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে বর্ষণ করছে দুধ। কথাটা ছড়িয়ে পড়ল ক্রমে ক্রমে। লোকের বুঝতে অসুবিধা হল না যে, একটা অলৌকিক রহস্য রয়েছে এখনো সেখানে। সেই বিশেষ স্থানের মাটি খুঁড়ে খোঁজ করতেই পাওয়া গেল সতীর তল্প বা গুল্‌ফ, অর্থাৎ মহাশক্তি অপর্ণা দেবীর। দেবীকে এনে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা হল করতোয়াতটে।

দেবী অপর্ণা নতুন করে প্রতিষ্ঠিতা হলেন বটে, তবে বর্তমানে তাঁর নাম আর অপর্ণা নেই। তিনি এখন ভবানী। বর্তমানে দেবী ও ভৈরবের অবস্থানও শাস্ত্রবর্ণনার সঙ্গে এক নয়, বিরাট এক ব্যতিক্রম সর্বক্ষেত্রেই। তবে এ ব্যতিক্রমেরও ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসের সঙ্গেও জড়িত আছে অলৌকিক কাহিনী।

ভারতবর্ষে তখন আকবরের শাসনকাল। টোডরমল ও মানসিংহ বাংলা দেশে শান্তি ফিরিয়ে এনেছেন। তখন উত্তরবঙ্গে ভাতুড়িয়া প্রভৃতি বড় বড় আটটি পরগণা নিয়ে গড়ে উঠেছে এক বড় জমিদারী। এ জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেছেন রাজশাহী-জেলার সাঁতৈল গ্রামের রামকৃষ্ণ রায়। দেবী অপর্ণার জন্যে বাদশাহের কাছে তিনি এক সনদ পেলেন। সেই সনদে দেবীর থানের উল্লেখ হল 'ভবানী থান' নামে। সুতরাং ভবানী থানে নতুন করে যখন দেবী অপর্ণা প্রতিষ্ঠিতা হলেন, তখন তাঁর নাম হল ভবানী। রাজা দেবীর জন্য মনোরম এক বাঙ্গালা মন্দির তৈরি করেছিলেন। মন্দির এত মনোরম যে, সেদিকে তাকালে চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না কারো। লোকে যত না দেখে মন্দিরের দেবীকে তার চাইতে বেশী দেখে মন্দির গঠনশৈলী। এতে মায়ের মনে বড় দুঃখ। রাজাকে তিনি স্বপ্ন দিলেন: 'তোর নক্সার বাঙ্গলাতে লোকে আমাকে দেখে না, দেখে তোর নক্সাকে। আমাকে পুরানো জোড়বাঙ্গালায় রেখে আয়।' স্বপ্ন পেয়ে রাজা তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে রেখে এলেন পুরানো জোড়বাঙ্গলায়।

দেবী অপর্ণা বা ভবানীর অলৌকিক ক্ষমতা প্রাচীন কালেও যেমন ছিল তেমনি ছিল ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতেও। ছিল অষ্টাদশ, উনবিংশ এবং আছে বিংশ শতাব্দী পর্যন্তও। সেই মোগল আমল থেকে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধা কুড়িয়েছেন, আজো কুড়চ্ছেন এই ৺মা। সেই পুরানো জোড় বাঙ্গলাতেও দেবী আর নেই। আজ তিনি পাকা এক মন্দিরে অধিষ্ঠিতা। মন্দিরের সামনে আটচালা এক নাটমন্দির। পশ্চিমে ভৈরব বামেশের মন্দির উঠেছে পাকা হয়ে। এই মহাশক্তি পীঠকে কেন্দ্র করে চারদিকে গড়ে উঠেছে আরও নানা মন্দির। এখন অবশ্য তাদের মধ্যে অনেকের অবস্থাই জরাজীর্ণ। কোন কোনটা বা ভগ্নস্তূপ। শুধু মন্দির নয় এই মহাশক্তি পীঠকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কয়েকটা সাধনপীঠও। শক্তি সাধনায় অনেকেই এখানে লাভ করেছেন সিদ্ধি।

বড় জাগ্রত দেবতা এই ভবানী। ভক্তজনের বিশ্বাস ৺মা সর্ব ঐশ্বর্যময়ী জগন্মাতা। ভক্তজনকে দান করেন চতুর্বর্গফল। দেন মোক্ষও। সালোক্য, স্বারূপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য এবং কৈবল্য এই পাঁচ রকমের হল মোক্ষ। দেবীর সঙ্গে একই লোকে বাস করলে হয় সালোক্য। তাঁর তুল্য রূপ হলে হয় স্বারূপ্য। তাঁর মত ঐশ্বর্য হলে হয় সার্ষ্টি। দেবীর দেহে প্রবেশ করে বিষয় ভোগ করার নাম সাযুজ্য। দেবীর আরাধনায় মহামুক্তি লাভ হলে হয় কৈবল্য। যে যেরকম প্রার্থনা করেন দেবীর কাছে, তিনি সেই রকমই লাভ করেন।

বগুড়া রেল স্টেশন থেকে শেরপুরের মধ্য দিয়ে ২৮ কিঃ মিঃ দূরে হল ভবানীপুর। তন্ত্রসাধনায় বহু সাধক সিদ্ধিলাভ করেছেন এই মহাপীঠে। কত অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন সাধক এসে দর্শন করে গেছেন ৺মাকে। মহৎজনের পুণ্যপাদস্পর্শে ভবানীপুর আজ যথার্থই মহাপীঠ। সিদ্ধ সাধকের পীঠস্থানে করেন দেবতা অধিষ্ঠান। এই মহাশক্তি পীঠে তাই বহু সাধকের সাধনাধন্য মৃত্তিকাতে আজও ৺মা বিরাজিতা আছেন অলৌকিক মাহাত্ম্যে। খোঁজ করলে বহু সাধকের সন্ধান পাওয়া যায়

এখানেই। সাধক পরিচয় জানা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ, প্রাক্তন জীবনকে অর্থাৎ গৃহজীবনকে এরা ছুঁড়ে ফেলে দেন সেদিকে কোন রকম আকর্ষণ না রেখে। সুতরাং সাধু-সন্তের জীবনী আলেখ্য রচনা করা বড় কঠিন। তবু কি করে অনেকেরই যেন পেছনের ইতিহাস ধরা পড়ে যায় ভক্তজনের সামনে। ভবানী মন্দিরের আশেপাশে স্থানীয় লোকদের কাছে খোঁজ করলে জানা যায় নানা সাধুসন্তের কথা। প্রবীণদের কাছে জিজ্ঞেস করলে জানা যায় দু-একজনের জীবন-কাহিনীও। তেমনই এক মহাশক্তিধর মহাসাধকের জীবনী এখানে বড় পরিচিত। নাটোরের রাজবংশের উত্তরাধিকারী তিনি। স্বয়ং রাজা। রাজা রামকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণ রাজবংশের উত্তরাধিকারী হলেও রাজবংশের সন্তান নন। রাজশাহীর অন্তর্গত আটগ্রাম নামে এক পল্লীর সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের লোক। রাণী ভবানী তাঁকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। জমিদারী চালাবার মত উপযুক্ত শিক্ষাতেই রাণী তাঁকে গড়ে তুলেছিলেন। শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আচার্যদের অধীনে।

কিন্তু রাজপরিবেশে মানুষ হলেও রাজপুরুষের মন নিয়ে রামকৃষ্ণ বেড়ে উঠতে পারেন নি। ধনজন ঐশ্বর্যের মধ্যেও তিনি কেমন থাকতেন উদাসীন, একা। তাঁর অন্তরের মধ্যে সুপ্ত প্রাক্তন তাঁকে বোধহয় বারবার স্মরণ করিয়ে দিত যে, তাঁর স্থান রাজপুরীতে নয়, অন্য কোথাও।

শুদ্ধোদন যেমন চিন্তা বোধ করেছিলেন সিদ্ধার্থকে দেখে, তেমনই রাণী ভবানীও রীতিমত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে উঠেন রামকৃষ্ণের চালচলন লক্ষ্য করে। ইহলোকের দিকে তত আকর্ষণ নেই রামকৃষ্ণের, দৃষ্টি অতিলোকে। শঙ্কাতুরা রাণী ডেকে আনলেন তাঁর গুরুদেব রঘুনাথ তর্কবাগীশকে—পুত্রের ভবিতব্য যদি তিনি আঁচ করতে পারেন। তর্কবাগীশ ছেলেকে দেখে বললেন, নাটোরের বংশরক্ষার জন্য পুত্রকে

বিয়ে দিয়ে দাও তাড়াতাড়ি। কুমারের ভিতর যে ধর্ম-জীবনের আকাঙ্ক্ষা উঠেছে উদগ্র হয়ে তাকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয় কোন মতেই। সুতরাং সদ্‌গুরু ডেকে দীক্ষা দেওয়া উচিত এখনই।

গুরুর কথামতই চললেন রাণী ভবানী। পুত্রের বিবাহের জন্য চারদিকে পাঠিয়ে দিলেন ঘটকের দল। অল্প দিনের মধ্যেই জুটে গেল সুন্দরী ও সুলক্ষণা পাত্রী। পুত্রের বিবাহ দিলেন রাণী ভবানী। গুরুর নির্দেশে পুত্রকে নিজেই দিলেন দীক্ষামন্ত্র। এর পরই পুত্রের হাতে রাজকার্য ছেড়ে দিয়ে রাণী নিলেন বানপ্রস্থের পথ। কখনও কাটাতে লাগলেন মুর্শিদাবাদের গঙ্গার তীরে, কখনও বড়নগরের প্রাসাদে। অধিকাংশ সময়েই কাশীধামে। রামকৃষ্ণের উপর দায়িত্ব পড়ল জমিদারী পরিচালনার।

রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব, তরুণী ভার্যা, নবজাতক পুত্র, অফুরন্ত ঐশ্বর্য। কিন্তু রামকৃষ্ণের মন তবু কিছুতেই বসল না সংসার জীবনে। কিসের অভাব যেন কুরে কুরে খেতে থাকল তাকে দিনরাত। সাধক জীবনের এ এক বিপন্ন বিস্ময়; কবি যাকে বলেছেন:

> 'অর্থ নয় কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়
> আরো এক বিপন্ন বিস্ময়,
> আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করে,
> আমাদের ক্লান্ত, ক্লান্ত করে।'

সেই বিপন্ন বিস্ময় দিনরাত ক্লান্ত করে তুলতে লাগল রামকৃষ্ণকে। পরাগতির জন্য যে বিহ্বলতা তার চেয়ে বড় বিপন্ন বিস্ময় আর আছে কি! রামকৃষ্ণের সেই পরাগতির জন্য আকুতি।

সেই পরাগতির জন্য রামকৃষ্ণ বার বার ছুটে যান নাটোরের জয়কালী বিগ্রহের কাছে। লোকপ্রবাদ, বড় জাগ্রত এই বিগ্রহ। যে যা প্রার্থনা করে সে তাই পায়। রামকৃষ্ণ সেই বিগ্রহের পদতলে ছুটে যান পরম মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়। জপতপ ধ্যানে প্রহরের পর প্রহর কাটিয়ে দেন সেখানে। তাতেও যদি না পান অন্তরের কোন সান্ত্বনা,

তাহলে ছুটে যান নিকটবর্তী বাগ্‌সরের শ্মশানে। বৈরাগ্যের পরম-ক্ষেত্র শ্মশান। সেই শ্মশান। সেই শ্মশানে বসে হৃদয়ের মধ্যে ডুব দিয়ে যথার্থ সত্যের সন্ধান করতে চেষ্টা করেন।

এই ব্যাকুলতার মধ্যেই একদিন রামকৃষ্ণ শুনতে পেলেন—একান্ন-পীঠের অন্যতম শাক্তপীঠ ভবানীপুরের কথা। নাটোর থেকে খুব একটা দূরে নয়। বিশেষ বিশেষ তিথি এলেই রামকৃষ্ণ ছুটে যান সেই মহাশাক্তপীঠে। ষোড়শোপচারে পুজো দেন। বহু সাধকের সাধনধন্য পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসেন ধ্যানাবিষ্ট হয়ে। সময় পেলে ঘুরে আসেন মহাশ্মশান তারাপীঠেও। মৃগনাভির গন্ধে ব্যাকুল হরিণের মত ছুটে বেড়াচ্ছেন রামকৃষ্ণ। শান্তি নেই, কোথাও শান্তি নেই রামকৃষ্ণের। ঠিক এই সময়…

ব্যাকুলতা যখন তুঙ্গে ঠিক সেই সময় রামকৃষ্ণ সন্ধান পেলেন এক কৌল সাধকের। মহাশাক্তপীঠ ভবানীপুরে আবির্ভাব হয়েছে তাঁর। রামকৃষ্ণ ছুটে গেলেন তাঁর কাছে। অভিলাস—এঁর কাছে অভিষিক্ত হন তিনি তন্ত্রসাধন প্রণালীতে। শব সাধনা ক'রে করেন সিদ্ধিলাভ।

অভিলাস তাঁর পূর্ণ হয়। তন্ত্রসাধনায় অভিষিক্ত হন রামকৃষ্ণ। শব সাধনাতেও সিদ্ধিলাভ করেন এই মহাশাক্তপীঠ ভবানীপুরেই, পূর্বে যার নাম ছিল করতোয়াতট। শব সাধনায় কি পেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ জানিনা। শবের মুখ পিঠের দিকে ঘুরে গিয়ে কি বর দিয়েছিল তাঁকে কে জানে। তার পর থেকেই নাটোর থেকে আড়াই ক্রোশ দূরে ভবানী মন্দিরে, যথার্থ অপর্ণা দেবীর মন্দিরে গিয়ে মাঝে মাঝে নিরত হতে লাগলেন তপস্যায়। রাজকার্যের চেয়ে তপস্যাই তখন বড় রামকৃষ্ণের কাছে। রাজৈশ্বর্য ব্যয় করতে লাগলেন তিনি মহৈশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষায়। মন্দিরের চারদিকে নতুন করে স্থাপন করলেন চার চারটি পঞ্চমুণ্ডির আসন। মন্দিরের পাশে জোড়া-পুষ্করিণীর পাশে বকুলবাগান। সেখানে বসতে লাগল রাজার বৈকালিক ধর্মসভা। হতে লাগল নানা তান্ত্রিক আর কুলাচারের আলোচনা। মহাশাক্তপীঠ

করতোয়াতট জাগ্রত হয়ে উঠল রাজা রামকৃষ্ণের ধর্মালোচনায়। রাজৈশ্বর্য ব্যয় হতে লাগল সমাগত কৌলাচার্য আর ভক্তদের জন্য। বহু টাকা মূল্যের এক তালুক উৎসর্গ করলেন রামকৃষ্ণ দেবীর সেবায়।

দিন যায়। রামকৃষ্ণ পরম ঐশ্বর্যের আকাঙ্ক্ষায় নিমগ্ন। কখনও বা করতোয়াতটের শাক্তপীঠে' কখনও বা নাটোরের জয়কালী বিগ্রহের সামনে রামকৃষ্ণ মগ্ন থাকেন মাতৃ আরাধনায়। এমন একদিন ঘন ঘোর অমানিশার রাতে জয়কালীর মন্দিরে রাজ-সাধক রামকৃষ্ণ ৺মায়ের আরাধনায় রত। কাছে শুধু একমাত্র অনুচর ভোলা এবং মন্দিরের পুরোহিত। কারণবারি পানে অর্ধমুদ্রিত আঁখি। অঞ্জলি ভরে রক্ত জবা আর বিল্বদল দিচ্ছেন ৺মায়ের চরণ কমলে। অন্ধকারের অনু-পরমানু কাঁপিয়ে ডাকছেন ৺মা ৺মা বলে—সেই সময় মন্দির প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন দণ্ড-কমণ্ডুল-ত্রিশূলধারী এক সন্ন্যাসী। যেমন সুঠাম দেহ, তেমনি দীর্ঘকায়। জটাভার নেমে এসেছে কোমর ছাড়িয়ে। বললেন, 'রাজা রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমাকে এক্ষুনি তাঁর কাছে নিয়ে চল।' ভোলা ছিল দুয়ারের প্রহরী। বলল, মহারাজ এখন ধ্যানে বসেছেন। তাঁর কাছে যাবার তো উপায় নেই। আপনি বরং কাল সকালে এসে দেখা করুন।

ক্রোধে যেন আরক্ত হয়ে উঠলেন সন্ন্যাসী। বাঘছাল বিছিয়ে বসতে যাচ্ছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন। চিৎকার করে বলে উঠলেন,—'রাজা রামকৃষ্ণ ধিক্ তোকে। এমন করে আপন বিস্মৃত হয়ে বসে আছিস? তুই কি ছেলেরে, এঁ্যা। তোর আসল পরিচয় মনে কর।' ব্যস। এইটুকু বলেই কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী।

রামকৃষ্ণ ছিলেন ধ্যানমগ্ন। সেই ধ্যানের মধ্যেই প্রচণ্ডভাবে চমকে উঠলেন অত্যন্ত পরিচিত এক কণ্ঠ শুনে। ধ্যান ভেঙে গেল। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ, আর দেখা পাওয়া গেল না তাঁর। সন্ন্যাসীর দেখা পাওয়া গেলনা বটে কিন্তু তাঁর হৃদয়ভেদী সেই কথা কয়টি অনবরত কানে বাজাতে লাগল রামকৃষ্ণের—'আর মায়ার বন্ধন কেন, ঘুচিয়ে

ফেল।' বড় পরিচিত কণ্ঠ। বড় আপনজনের। রজককন্যার কণ্ঠ—'ওঠ বাবা বেলা যায়' যেমন লালাবাবুকে ব্যাকুল করে তুলেছিল, গৃহত্যাগী করেছিল, তেমনই ভাবে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন রাজা রামকৃষ্ণ। সংসারের বন্ধন মায়ার বন্ধন তাঁকে ছিন্ন করতেই হবে।

মুক্তি যে যথার্থই চায়, মুক্তির সুযোগ তার এসেও যায়। রাজা রামকৃষ্ণও সত্যি সত্যি একদিন মুক্তির সুযোগ পেয়ে গেলেন। তখন নবাবী শাসন আর নেই। ইংরেজরা পেয়েছে বঙ্গদেশে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। অনাচার উৎপীড়ন চলেছে পুরোদমে। ওয়রেন হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল। সামান্য অজুহাতে কেড়ে নিচ্ছেন রাজ্য, জমিদারী। তাঁর ষড়যন্ত্র এসে পড়ল নাটোরের উপরেও। নাটোরের প্রধান সম্পত্তি বাহিরবন্দ পরগণা হস্তচ্যুত হয়ে গেল রাজা রামকৃষ্ণের। হেস্টিংস তাঁর কোন বশংবদকে এই পরগণাটি উপহার দিলেন। কিন্তু রাজা রামকৃষ্ণ ভ্রূক্ষেপ করলেন না বৈষয়িক ক্ষতিকে, যেন রাজর্ষী জনকের মতন তিনি বীতরাগ ভয়ক্রোধলোভ ইত্যাদি।

শুধুমাত্র বাহিরবন্দ পরগণাই যে হস্তচ্যুত হল তাই নয়—রাজস্বের দায়ে একের পর এক আরও পরগণা উঠতে লাগল নিলামে। এক আশ্রিত লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় ভূষণার মত বড় পরগণাও হাত ছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু রাজা রামকৃষ্ণের তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। এক একটা পরগণা যায়, আর তিনি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন, যেন বিরাট বন্ধন থেকে মুক্তি পাচ্ছেন তিনি। যত ক্ষতি তত বেশী উল্লাস রামকৃষ্ণের। এক একটি পরগণা যায় আর মহাধূমধামে ষোড়শোপচারে জয়কালীর মন্দিরে পূজা দেন। শেষপর্যন্ত আটগ্রামের জ্ঞাতিরা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে গদিচ্যুত করার চেষ্টা করে। তবে তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। খবর পেয়ে রামকৃষ্ণ হেসে আকুল। তিরস্কার করবেন দূরস্থান—ডেকে এনে বড় একটা জমিদারী মহল বিলিয়ে দেন তাদের মধ্যে। কর্মচারীরা বাঁধা দিতে গেলে বলেন—'বিষয় পেয়ে মনের বিষ ওদের নাশ হোক।'

বিষয়ে যে বিষ নাশ হয় না রামকৃষ্ণ নিজে জানেন সে-কথা। ফলে

ঘরসংসার জমিদারী সব ছেড়ে তিনি বরং বেরিয়ে পড়েন সকল বিষয়ের উপরে যে বিষয়ী তাঁর খোঁজে। মাঝে মাঝেই কারোতোয়াতটে এসে ধ্যানে বসেন মহাশক্তির। করতোয়াতটের ছায়াতেই বাগসরের প্রসিদ্ধ শ্মশান—আপন ভোলা শিবের মত সেই মহাশ্মশানকেই রামকৃষ্ণ করে নেন তাঁর আপন গৃহ। শব হল সমস্ত বাসনা কামনা রহিত। নরকঙ্কাল হল পূর্ণেরই মত নিষ্ক্রিয়। সেইজন্য শব আর নরকঙ্কালের মধ্যে বসে থাকেন রামকৃষ্ণ। শিবাকুল আর সারমেয় দলের সঙ্গে তাঁরও কণ্ঠ যুক্ত হয়—৺মা ৺মা বলে। সাধারণ ঐশ্বর্য ভুলে রামকৃষ্ণ সন্ধান করেন পরম ঐশ্বর্যময়ীর। পাশেই যাঁর মহাশক্তিপীঠ সতীঅঙ্গপাতপুষ্ট, পাশেই যাঁর জাগ্রতা দেবী অপর্ণা, আকুল সন্তানকে তিনি কি করুণা করবেন না? রামকৃষ্ণ পাগল হয়ে থাকেন ৺মায়ের ধ্যানে। শ্মশানে থাকলে খোঁজ করেন পরম ঐশ্বর্য, গৃহে এলে দান করেন পার্থিব ঐশ্বর্য। রামকৃষ্ণের দিন যায়।

কল্পতরু হয়ে একদিন দরবারে বসেছিলেন রামকৃষ্ণ। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে তাঁর হাতে দিলেন একখণ্ড পাথর তুলে। সেই পাথরের গায়ে আঁকা কি সব সাঙ্কেতিক চিহ্ন। পাথর হাতে পেয়ে রাজা বললেন, এ পাথর আপনি পেলেন কোথায়? ব্রাহ্মণ বললেন, 'শ্মশানের কাছে জঙ্গলে। দিয়েছেন এক সন্ন্যাসী। বলেছেন, এ পাথর আপনাকে দিলে আমার দারিদ্র্য ঘুচবে।' রাজা রামকৃষ্ণ পাথরে আঁকা সঙ্কেত বাক্যগুলি পড়ে দেখলেন। লেখা আছে:

যদুপতে: ক্ব গঙ্গা মথুরাপুরী।
রঘুপতে: ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত কুরুষ্ব মনঃস্থিরম
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।'

অর্থাৎ যদুপতি কৃষ্ণের মথুরাপুরী কোথায় বিগত হয়েছে? রঘুপতির উত্তর কোশলই বা আজ কোথায়? এ-কথা চিন্তা করে তোমার মনস্থির কর। এবং জগতের নশ্বরত্ব বুঝে নাও।

রাজা রামকৃষ্ণ ভাবতে লাগলেন। রূপ গোস্বামী এই শ্লোকটি পাঠিয়েছিলেন তাঁর ভাই সনাতনের কাছে। কিন্তু এ লিপি তাঁর কাছে আবার কেন? তিনি তো পরম মুক্তির কথাই চিন্তা করছেন দিনরাত! তবে? ব্রাহ্মণকে প্রচুর অর্থ দিয়ে বিদেয় করে রাজা সভা ভঙ্গ করলেন। তারপর গভীরভাবে ভাবতে লাগলেন এই সঙ্কেত লিপিটির উপর। কে এই সন্ন্যাসী? কেন তাঁকে অনুসরণ করছেন তিনি? যদি অনুসরণ করছেন, দেখা দিচ্ছেন না কেন? রামকৃষ্ণ চতুর্দিকে লোক পাঠালেন সন্ন্যাসীর খোঁজে। কিন্তু তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না।

সংসারের প্রতি বিরাগ আরও বেড়ে গেল রামকৃষ্ণের। বিষয়ভার মনে হতে লাগল দুঃসহ। দান-ধ্যানে ভাণ্ডার হল শূন্যপ্রায়। জমিদারী প্রায় যায় যায়। অবশিষ্ট যা আছে তা রক্ষা না করলে বিপদ। অনন্যোপায় হয়ে ভবানী ছুটে এলেন নাটোরে। কিছুদিন নিজেই নিলেন জমিদারীর ভার। পুত্রকে বোঝালেন ঘর সংসার ও ধর্মকর্ম দুইই তো এক সঙ্গে করা যায়! কিন্তু অতীন্দ্রিয় যাকে ডাক দিয়েছে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় আশয় তাঁকে টানবে কি করে? সুতরাং অতীন্দ্রিয়ের টানে রামকৃষ্ণ ঘুরতে লাগলেন যেমন ঘুরছিলেন তেমনি। মায়ের সঙ্গে তাঁর মতান্তরও ঘটে গেল এনিয়ে। তিনি চান মুক্তি। রাণী ভবানী তাঁকে জড়িয়ে দিতে চান বন্ধনে। সুতরাং রামকৃষ্ণ তা সহ্য করবেন কি করে? তিনি বরং মাকেই এড়িয়ে চলতে লাগলেন। ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তীর্থে তীর্থে, যদি সেই পরমৈশ্বর্যের সন্ধান পান।

এসময় মাঝে মাঝে তিনি বড়নগরের কিরীটেশ্বরী মন্দিরেও যেতেন। একান্ন পীঠের এও একটি পীঠ। কিরীটেশ্বরীকে পুজো দিয়ে নবাব মীরজাফর পেয়েছিলেন কুষ্ঠরোগ থেকে অব্যাহতি। তিনি কি তাঁর বিষয়-রোগ থেকে মুক্তি পাবেন না? চীনাচারের তন্ত্রসাধন ক্ষেত্র তারাপীঠ। সেখানেও যান মাঝে মাঝে। সেখানে মহাশ্মশানে গিয়ে ডুবে থাকেন ৺মায়ের ধ্যানে। অবশেষে দেশ দেশান্তর আর তাঁকে ঘুরতে হল না। ঘরের কাছে করতোয়াতটের মহাপীঠেই তিনি পেয়ে

গেলেন পরমার্থ। সেখানে পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে পেলেন ইষ্ট দেবী আদ্যাশক্তির সাক্ষাৎ। আদ্যাশক্তি হিসেবে দেবী অপর্ণা হয়তো করুণা করলেন তাঁকে।

মহামায়া আদ্যাশক্তির যাঁরা দেখা পান তাঁদের মধ্যে ফুটে উঠে এক স্বর্গীয় দীপ্তি। সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর রাজা রামকৃষ্ণের সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে সেই স্বর্গীয় প্রভা। দেখলে বুঝতে কোন অসুবিধাই হয় না যে, ঈশ্বর-কোটির মানুষ তিনি। মহাতন্ত্রপীঠ করতোয়াতটের শক্তি পীঠে দেশ-বিদেশ থেকে আসেন নানা শক্তিধর শক্তিসাধক। তাঁরা রামকৃষ্ণের দেহে সাধনাসিদ্ধির নানা লক্ষণ দেখে এক বাক্যে স্বীকার করে নিলেন যে, আদ্যাশক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া সিদ্ধপুরুষ রাজা রামকৃষ্ণ।

একদিন দেবী অপর্ণার এক অলৌকিক খেলা দেখা গেল মহশাক্ত পীঠ করতোয়াতটে। মাতৃপীঠে সেদিন উৎসবের বিপুল আয়োজন। রাজা রামকৃষ্ণ পূজা করবেন। ঘোর অমাবস্যায় হবে মহাপূজা অনুষ্ঠিত। রামকৃষ্ণ আনন্দে স্বরচিত শ্যামা সঙ্গীত গাইছেন। বিগ্রহ মহামূল্যবান আভরণে সজ্জিত। রাজপুরীর মহিলারাও ভিড় করেছেন পূজা দেখতে। কুঠির ছাদে বসে রাজা মাতৃচিন্তায় আত্মভোলা। এমন সময় পাশের অরণ্য থেকে উঠল—হা-রে-রে-রে শব্দ। ডাকাতরা এগিয়ে আসছে মন্দির লুট করতে। তারা জানে যে, পূজার দিন রাজার ইচ্ছায় মহামূল্য আভরণে দেবী হয়েছেন সুসজ্জিতা। রাজপুরবাসিনীরাও এসেছেন মহামূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ ও গহনা পরে। লক্ষ লক্ষ টাকার গহনা লুণ্ঠন করা যাবে মুহূর্তের মধ্যেই। লোভে উন্মাদ হয়ে ছুটে এল তারা। কিন্তু?

কিন্তু ঘটে গেল এক অদ্ভুত কাণ্ড, রাজা রামকৃষ্ণ স্বয়ং ছাতে দাঁড়িয়ে তা দেখলেন। ডাকাত দল মশাল নিয়ে বেরিয়ে আসছে, আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। যেন কে তাদের বাঁধা দিচ্ছেন। অথচ কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মন্দিরের রক্ষীদের সংখ্যা সামান্য। তবে তাদের কে বাঁধা দিচ্ছে? কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল ডাকাতেরা পালাতে আরম্ভ করেছে

উর্ধ্বশ্বাসে। ঘটনটা কেউ দেখল না, শুধু দেখতে পেলেন রাজা রামকৃষ্ণ নিজে। কে রক্ষা করলেন, তিনি তাও বুঝলেন। নিজেকে ধন্য মনে করলেন ৺মায়ের অলৌকিক করুণালীলা দেখে। এখানেই ঘটনা শেষ হল না। পরদিন ডাকাতদের সর্দার এসে রামকৃষ্ণের চরণতলে লুটিয়ে পড়ল। সার্থক সাধক রাজা রামকৃষ্ণ, স্বয়ং ৺মা তাঁর রক্ষাকর্ত্রী। লোল জিহ্বা রণরঙ্গিনী মূর্তিতে তিনি কাল ডাকাতদের বিতাড়ন করেছেন। রাজা তাদের ক্ষমা করুন। যে ভয়ঙ্কর ৺মায়ের মূর্তি কাল তারা দেখেছে তা কখনও ভুলবার নয়। যতদিক দিয়ে তারা মন্দির আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে ততদিকেই দেখে অসুরসংহারিণী মূর্তিতে ৺মা দাঁড়িয়ে, এগুবার পথ নেই। সেই জন্যই তারা পিছিয়েছে, পালিয়েছে। উত্তর বঙ্গের সবচেয়ে কুখ্যাত ডাকাত শঙ্করা এসেছিল মন্দির লুঠ করতে। তাকেও হার মানতে হল। আর তার ডাকাতিতে ইচ্ছে নেই। ৺মায়ের কৃপায় দুর্ভেদ্য যে রাজা সেই রাজার আশ্রয় চাইতে এসেছে সে।

রামকৃষ্ণ বুকে জড়িয়ে ধরলেন শঙ্করাকে, বললেন, 'ওরে তোর মত সৌভাগ্যবান কে আছে। জগন্মাতাকে তুই অসি ধরিয়েছিস, এখানে এনেছিস। তোর জন্য স্বচক্ষে দেখেছি সেই রণরঙ্গিনী মূর্তি আমিও। ৺মায়ের মন্দিরে বসে এখন থেকে তুই গান গেয়ে দিন কাটা।

জগন্মাতা অপর্ণার কৃপা হলে আর অভাব কি। জমিদারীর নানা-মহল, পরগণা গেছে, কিন্তু মর্যাদা কমেনি এতটুকু। একদিন খবর এল বাদশাহ রামকৃষ্ণকে দিয়েছেন—'মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর' উপাধি। বাদশাহ ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিরা মহা সমারোহে সেই উপাধি দিতে এসেছেন নাটোরে। রাজধানীতে উৎসবের সমারোহ দেখা দিল।

কিন্তু নিস্পৃহ মুক্ত পুরুষের কাছে রাজছত্র ও কৌপীন দুয়েরই মূল্য সমান। রামকৃষ্ণের হেরফের হল না সে উপাধিতে কিছু। এবং এই সুযোগে আরও কিছু বিষয়সম্পত্তি কমানোর ব্যবস্থা করলেন। ষোড়শোপচারে নিত্য দেবীপূজার ব্যবস্থা করলেন, করলেন ব্রাহ্মণ

ভোজন ও কাঙ্গালী বিদায়ের ব্যবস্থা। অগণিত প্রার্থীর ভিড় জমে উঠল রাজপ্রাসাদের দুয়ারে। দানের জন্য অর্থ চাই। বড় বড় পরগণা গুলি একের পর এক উঠতে লাগল নীলামে। রাজকর্মচারীরা বিপদ গুনলেন। কিন্তু রাজার তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

ঠিক এমন সময় আবার একদিন হল সেই সন্ন্যাসীর আবির্ভাব। উৎসব শেষে হাতীর পিঠে রাজা যাচ্ছেন নাটোরের রাজপথ দিয়ে। হঠাৎ দেখতে পেলেন দিব্যকান্তি তেজপুঞ্জদেহ সেই সন্ন্যাসীকে। সন্ন্যাসী যেন তাঁকে ইশারায় ডাকছেন। হাতীর পিঠ থেকে নেমে এলেন রাজা। অন্তস্তল থেকে কে যেন তাকে বলে দিল—জয় কালীর মন্দিরে সেদিন এই দিব্যদেহী সন্ন্যাসীই এসেছিলেন তাঁকে আহ্বান জানাতে। সেই লিপিঅঙ্কিত প্রস্তরখণ্ডও পাঠিয়েছিলেন তিনিই। কিন্তু কে তিনি? কি চান?

এবার সন্ন্যাসী তাঁর পরিচয় দিলেন। নাম শ্রীজী। উচ্চকোটির সাধক! রাজপুতানার বুঁদি রাজবংশে জন্ম। যৌবনেই সংসার ত্যাগ করে এক মহাযোগীর আশ্রয়ে সাধনা করে লাভ করেছেন সিদ্ধি। কিন্তু এটাই তো বড় কথা নয়। আরও পরিচয় নিশ্চয়ই আছে। শ্রীজী একদৃষ্টিতে রামকৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সেই পরিচয়ের ইতিহাস স্পষ্ট করে তুলতে চাইলেন। তারপর আরও কাছে এসে নিজের হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন রাজার মেরুদণ্ড।

রাজা রামকৃষ্ণের সারাদেহে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। অদ্ভুত এক অনুভব ছেয়ে ফেলল তাঁকে। যেন তাঁর দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। মানস-পটে ভেসে উঠল আর এক জীবনের চিত্র। তিনি দেখলেন, হরিদ্বার পুণ্যক্ষেত্রে এক গিরিগুহায় বসে আছেন। তাঁর সামনে ধ্যানস্থ গুরু আর প্রবীণ গুরুভ্রাতা। সেদিনের সেই গুরুভ্রাতাই আজকের শ্রীজী। গত জীবনে ইনি ছিলেন তাঁর নিত্যসঙ্গী, অধ্যাত্ম-জীবনের অন্যতম পথ-প্রদর্শক। দুয়ের অন্তরে সুপ্ত ছিল কিছু ভোগাকাঙ্ক্ষা। সদ্‌গুরুর তা দৃষ্টি এড়ায়নি। আবার জন্ম হয়েছে সেই আকাঙ্ক্ষারই জন্য। শ্রীজী

এসেছেন আগে। ভোগের শেষে বন্ধনমুক্ত হয়েছেন তিনি। তাই ছুটে এসেছেন গুরুভ্রাতার মুক্তির জন্য।

দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। রামকৃষ্ণ বুঝলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে শ্রীজী আবার অন্তর্হিত হয়েছেন। তা হোক, তাতে ক্ষোভ নেই। শ্রীজীর মত রামকৃষ্ণকেও বেরিয়ে আসতে হবে বন্ধনমুক্ত হয়ে। আর বিলম্ব করলেন না রামকৃষ্ণ। পত্নীর কাছে শেষ বিদায় নিলেন। দুই নাবালক পুত্রকে তুলে দিলেন তাঁর হাতে। তারপর রাজখেতাব, বিত্ত, বিষয়, সুখসম্পদ সব ত্যাগ করে করতোয়াতটের পঞ্চমুণ্ডির আসনে শুরু হল তাঁর চূড়ান্ত সাধনা। ইষ্টদেবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন তিনি আগেই, কিন্তু বড় ক্ষণস্থায়ী সে সাক্ষাৎ। এবার তাঁকে চিরকালের জন্য ধরে রাখতে চান নিজের কাছে। হৃদয়বেদীতে জ্যোতির্ময়ী জননী চিরকাল উদ্ভাসিত থাকুন নিজের রূপের ছটায়। আরম্ভ হল রাজা রামকৃষ্ণের সাধনা। সাধনা নয়, সমরসাধন, কমলাকান্তের সেই গানের মতন :

'আয় মা সাধন সমরে।
দেখি, মা হারে কি পুত্র হারে।'

দিন নেই, রাত্রি নেই, পঞ্চমুণ্ডির আসনে ধ্যানমগ্ন রামকৃষ্ণ। ঘোরতর এক অমাবস্থার রাতে দেবী আর থাকতে পারলেন না ভক্তকে দর্শন না দিয়ে। আদ্যাশক্তি জগজ্জননী অলৌকিক জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়ী হয়ে দেখা দিলেন সন্তানকে। সাধন সমরে তাঁকে হার স্বীকার করতে হল। সন্তানকে ডাকলেন তিনি, রামকৃষ্ণ।

চর্মচক্ষে তাকিয়ে রামকৃষ্ণ দেখলেন তাঁর ইষ্টদেবীকে।

মা বললেন : আমি এসেছি। এসেছি এবার তোমাকে আমার করে নিতে। তোমাকে আত্মসাৎ করতে। কিন্তু তার আগে যে শেষ প্রস্তুতি তোমার চাই ?

কি সে প্রস্তুতি ? রামকৃষ্ণ তাকালেন ৺মায়ের মুখের দিকে।

৺মা বললেন, 'রাণী ভবানী তোমার মা। পালনকর্ত্রী। অধ্যাত্ম

জীবনে তাঁর কাছেই প্রথম তুমি দীক্ষা নিয়েছিলে। মায়ের সঙ্গে তোমার ঘটেছে মতান্তর। এ মতান্তর না মিটলে তো পরমপ্রাপ্তি হবে না।'

রামকৃষ্ণ বললেন, বন্ধনের জন্য মায়ের নির্দেশ, মুক্তির জন্য আমার সংগ্রাম। তুমিই বল এ মতান্তর মিটবে কি করে?

৺মা বললেন, 'হবে। মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও তাহলেই ঘুচবে। লৌকিক জীবনের সব দাবিদাওয়া মিটিয়ে ফিরে এস আমার কাছে। তোমায় আমি কোলে নেব।'

জগজ্জননী আদ্যাশক্তি মহামায়া অন্তর্হিতা হলেন।

রামকৃষ্ণও মাতৃনির্দেশে উঠে দাঁড়ালেন। রাণী ভবানী তখন রাঢ়দেশ মুর্শিদাবাদের বড়নগরে। যোগবলে রামকৃষ্ণ আকাশপথে উঠে ছুটে চললেন বড়নগরের দিকে।'

মাতাপুত্রের দেখা হল শেষপর্যন্ত মর্মস্পর্শীরূপে। জগজ্জননীও তাঁকে কোলে চান, পার্থিব মাও তাঁকে বুকে চান। টানা-পোড়েনের এক আশ্চর্য খেলা চলল অনেকক্ষণ। অবশেষে মায়ের মার্জনা পেলেন রামকৃষ্ণ। সঙ্গে সঙ্গে যেন রূপান্তর। কারণ, শেষলগ্ন তাঁর এসে গেছে। সবসত্তা উঠেছে মাতৃময় হয়ে। রামকৃষ্ণ শেষবারের মত দেখা পেলেন জগজ্জননীর। মাতৃনাম জপতে জপতে মহাসাধক জগজ্জননীর জ্যোতিসমুদ্রে হারিয়ে গেলেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে করতোয়াতটের এই সিদ্ধসাধক জ্যোতিরূপে মিশে গেলেন জ্যোতির্ময়ী ৺মায়ের কোলে।

বক্রেশ্বরের অঘোরী বাবা :

বীরভূমের অন্যতম একটি পীঠস্থান বক্রেশ্বর। বিখ্যাত, উষ্ণ প্রস্রবণের জন্য। মূলতঃ শৈব পীঠস্থান। গল্পে আছে অষ্টাবক্র মুনি কঠোর তপস্যা করে এখানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তপস্যাতে তুষ্ট হয়ে মহাদেব বলেছিলেন—'এই তীর্থে আজ থেকে তোমার পূজার পর ভক্তেরা আমার অর্চনা করবে। তোমার নামেই এখানে আমার স্থিতি হবে। এই জন্যই শিব এখানে বক্রেশ্বর বা বক্রনাথ নামে পরিচিত। বক্রেশ্বর মূলতঃ শৈবপীঠ হিসেবে বিখ্যাত হলেও শাক্তরাও এখানে নিজেদের পীঠ তৈরী করে নিয়েছেন। শাক্তদের বিশ্বাস, সতী-অঙ্গের এক অঙ্গ পড়েছিল এখানে, তাই স্থানটি মহাশাক্তপীঠ। একান্নপীঠের এক পীঠ। একান্নপীঠ সংক্রান্ত গ্রন্থের নানা গ্রন্থ যেমন, পীঠনির্ণয়, শিবচরিত, তন্ত্রচূড়ামণি ইত্যাদিতে বক্রেশ্বর একান্নপীঠের এক পীঠ হিসেবে বর্ণিত। পীঠনির্ণয়ে বলা হয়েছে :

"বক্রেশ্বরে মনঃপাত বক্রনাথস্তু ভৈরবঃ।
নদী পাপহন্না তত্র দেবী মহিষমর্দ্দিনী ॥"

অর্থাৎ বক্রেশ্বরে পড়েছে সতীর মন। দেবীর নাম মহিষমর্দ্দিনী। ভৈরবের নাম বক্রনাথ। তবে ইদানিং অনেকে বলেন যে, সতীর ভ্রূমধ্যস্থ অংশ পড়েছে এখানে। যদি কিছু পড়ে থাকে ভ্রূমধ্যস্থ অংশ পড়াই সম্ভব। মন কোন বস্তু নয় যে পড়বে। সে-যাই হোক, যে অংশই পড়ুক না কেন, বক্রেশ্বর একটি অন্যতম পীঠস্থান। সেখানে শৈবরা যান, শাক্তরাও যান। বক্রেশ্বরের শিবকে ঘিরে শৈবতন্ত্র। দেবী মহিষমর্দ্দিনীকে ঘিরে শাক্ত তন্ত্র। বক্রেশ্বরের শিব মন্দির ওড়িশার স্থাপত্য কৌশলের অনুকরণে তৈরি। মুল মন্দির ছাড়া আরও তিন

চারশ মন্দির আছে। তবে অধিকাংশই ভগ্নপ্রায়। মন্দিরগুলির সবই কুণ্ডগুলির চারদিক ঘিরে। নানারকম গল্পকথাও আছে। মহিষমর্দ্দিনীর মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত আছে কালাপাহাড়ের গল্প। কালাপাহাড় রাজনগর যাবার পথে এদিক দিয়ে এসেছিলেন বলে মহিষমর্দ্দিনী দেবীর পাণ্ডারা আদি অষ্টাদশভূজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্তিটিকে পুকুরে ডুবিয়ে রেখে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কালাপাহাড়ের ঘটনা শেষ হবার পর মন্দিরে নতুন মূর্তি বসে—ধাতুমূর্তি। সেই অষ্টাদশভূজা মহিমর্দ্দিনীমূর্তি এখন আছে ডিহি বক্রেশ্বর গ্রামে, পাণ্ডাদের বাড়িতে।

বক্রেশ্বরে তীর্থ করতে এলে আগে পুণ্যার্থীরা শ্বেতগঙ্গা বা পাপহরা নদীতে স্নান করে দেবদেবীর দর্শন করতেন। সেইজন্য পীঠনির্ণয়ে বলা হয়েছে 'নদী পাপহরা তত্র'।

শৈব এবং শাক্ত উভয় সম্প্রদায়ই তন্ত্রমতে চলার জন্য বিখ্যাত। আগম শাস্ত্রেই আছে তন্ত্রের বর্ণনা। এ আগম শাস্ত্র এসেছে শিবের মুখ থেকেই। পার্বতীও এর সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং বক্রেশ্বর মূলতঃ শৈব পীঠেই হোক আর বৌদ্ধ পীঠেই হোক তন্ত্রক্রিয়ার জন্য প্রাচীন কাল থেকেই বিখ্যাত। এবং এই তন্ত্রাচারের সঙ্গে যে বৌদ্ধ মহাযান তন্ত্ররীতির কিছুও যুক্ত হয়নি তা নয়। সে যাই হোক, তন্ত্রক্ষেত্র হিসেবে বীরভূমের তারাপীঠের মত বক্রেশ্বরও বিখ্যাত॥

তারাপীঠের মত বক্রেশ্বরেও এক ভয়াবহ শ্মশান আছে। তান্ত্রিকদের ভিড় বা জমায়েত সেখানেই। বহু অলৌকিক তন্ত্রসাধকের কথাও এ অঞ্চলের লোকের কাছে শোনা যায়। বক্রেশ্বরের শ্মশানের এক অঘোরী বাবার কথা খুবই বিখ্যাত। তিনি আজও বিস্ময় ছড়িয়ে আছেন লোকের মনে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকেও তাঁকে সেখানে দেখা গেছে।

আমাদের সাধু সন্ন্যাসীদের ইতিহাস সংগ্রহ করা বড় কঠিন। কারণ, তাঁরা সন্ন্যাস নিলে প্রাক্তন জীবনের কথা কিছুই বলেন না। নাম ধাম সবই থেকে যায় অজ্ঞাত। শুধু যে পদ্ধতিতে যে সম্প্রদায়-

ভুক্ত সন্ন্যাসী তাঁরা—সেই নামেই তাঁদের জানা যায়, যেমন, অবধূত, দণ্ডী, পরমহংস, অঘোরী ইত্যাদি। বক্রেশ্বরের এই অঘোরীবাবারও সেই জন্য সম্প্রদায়ভুক্ত নাম ছাড়া অন্য কোন প্রাক্তন পরিচয় নেই। তবে তাঁর চিন্তাধারা, সাধন প্রণালী, অলৌকিক ক্ষমতা এ-সব অনেক কিছুই জানা যায়।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধক বিশেষ বিশেষ কিছু কার্য ও পদ্ধতির জন্যই বিশেষ বিশেষ নামে পরিচিত হন। অঘোরীদেরও কিছু বিশেষত্ব আছে। অঘোরীরা এক ধরনের তত্ত্বজ্ঞানী পরমহংস। সর্বত্রই মনে মনে সমদৃষ্টি অভ্যাস করেছেন। বিষ্ঠা এবং চন্দনকে তাঁরা সমান জ্ঞান করেন। সবই তাঁদের কাছে সমান এটা দেখাবার জন্য শরীরেও মল মূত্র মেখে চলেন। সঙ্গে থাকে করোটি বা কাঠের পাত্র। বিষ্ঠা, মড়ার মাংস, মূত্র কোন কিছু ভক্ষণ করতেই দ্বিধা নেই।

অঘোরী হতে হলে যথানিয়মে প্রথম সন্ন্যাস নিতে হয়। তারপর নিতে হয় অঘোরমন্ত্রে দীক্ষা। লোকের বিশ্বাস অঘোরীরা অত্যন্ত দৈবশক্তি সম্পন্ন। একটি প্রবাদ আছে 'অঘোরান্ন পরো মন্ত্রঃ' অর্থাৎ অঘোর মন্ত্রের পর আর মন্ত্র নেই। প্রাচীন মুনি ঋষিরা যেমন গোবধ করে তাকে পুনর্জীবিত করে দিতে পারতেন তেমনি লোকের বিশ্বাস যে, অঘোরীরাও নরবধ ক'রে, নরমাংস ভক্ষণ ক'রে মন্ত্রবলে আবার তাদের জীবিত করে দিতে পারেন।

অঘোরীদের উপাসনা শিবশক্তি দুইয়েরই। এরাই মদ্য মাংস ভক্ষণ করা থেকে নরবলিদান প্রভৃতি ভয়াবহ ক্রিয়া করতেন। ভবভূতির মালতীমাধবে এমনই এক অঘোরীর উল্লেখ আছে যাকে তিনি বলেছেন অঘোরঘণ্ট। চামুণ্ডার উদ্দেশে তিনি মালতীকে বলিদান করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

অঘোরপন্থী এক ধরনের যোগীও আছেন। এরাও অঘোরীদের মতই ব্যবহার করেন। মদ্যমাংস ভক্ষণ করেন। সর্প কিম্বা অন্যান্য পশুর অস্থি ধারণ করেন। ব্যবহারও অনেকাংশেই ভয়াবহ। এরা

কণ্‌ফট যোগীদের মত দুই কানে এক ধরনের কুণ্ডলও পরেন। এঁদের মধ্যে অনেকে আছে নকল অঘোরী। ধর্মের নামে ভিক্ষা করে। লোককে তারা নানা দৈব ক্ষমতার অধিকারী এই বলে ধোঁকা দেয়। এদের উল্লেখ করেই বোধহয় 'দত্তাত্রেয় সংহিতা'য় বলা হয়েছিল :

মুণ্ডী চ দণ্ডধারী বা কাষায়বসনোঽপীবা।
নারায়ণবদোবাপি জটিলভস্ম লেপনঃ॥
নমঃ শিবায়বাচোবা বহ্বর্চ্চাপূজকোঽপিবা।
ক্রিয়াহীনোঽথবা ক্রূরঃ কথং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥

অর্থাৎ মুণ্ডিত-মস্তক, দণ্ডধারী, কাষায়বর্ণবস্ত্র, 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারণকারী, জটাজুটযুক্ত ভস্মলিপ্ত, 'নমঃ শিবায়' এই শব্দ উচ্চারণকারী, বহুমূর্তিপূজক এই সকল লক্ষণযুক্ত হয়েও কেউ যদি ক্রূরঃ হয়, যথাবিহিত ক্রিয়া অনুষ্ঠান না করে, তবে সে কি ভাবে সিদ্ধি লাভ করবে? নকল অঘোরীরা অত্যন্ত নির্লজ্জও হয়। কোন কোন অঘোরী একটি করে অঘোরিণী সঙ্গে রাখে। সকলের চোখের উপরই অকথ্য ব্যবহার করে, অশ্রাব্য ভাষা বলে। গয়াতে এরকম এক অঘোরী যুগলের গল্প বলেছেন অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে। লেখকের খুব পরিচিত এক ব্যক্তি একবার গয়াধামে গিয়ে এই ধরনের এক অঘোরী যুগলকে দেখতে পান। কৌতূহলে তিনি তাদের কাছে ডাকেন। তারা তখন মদ খাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই কাছে এসে হাজার লোকের-সামনে মৈথুন করতে থাকে। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি ভিক্ষা দিয়ে পালিয়ে বাঁচেন।

বক্রেশ্বরের অঘোরীবাবা উলঙ্গ থাকতেন। পানপত্র হিসেবে করোটি ব্যবহার করতেন। মড়ার মাংস খেতেও দ্বিধা ছিল না। বিষ্ঠা চন্দনকে তিনিও সমান জ্ঞান করতেন। কিন্তু নকল সাধু বলতে যা বোঝায় তিনি তা ছিলেন না। তবে সাধারণ মানুষ 'সেই অঘোরীবাবা অত্যন্ত দৈবী ক্ষমতাসম্পন্ন' এ ছাড়া তাঁর সম্পর্কে আর কিছুই জানতো না। তাঁর কত বয়স কেউ বলতে পারতনা। ভৈরবী আছে কিনা

সেটাও ছিল অজ্ঞাত। তবে অধিকাংশ সময় বক্রেশ্বরের শ্মশানে থাকলেও মাঝে মাঝে থাকতেন না। কোথায় যেতেন তাও কেউ জানতো না। তবে তিনি যে সিদ্ধপুরুষ এ-কথা সবাই বলত।

দেখতে ছিলেন অত্যন্ত উগ্রমূর্তি, ভয়ঙ্কর। ভয়ে সাধারণ লোক কাছে এগুতো না। তাড়া করে আসতেন। তবে যারা কাছে থেকে তাঁকে দেখেছেন তারা বলেন, রাগদ্বেষ ওঁর কিছুই নেই। সাধারণ মানুষ অলৌকিক ক্ষমতার প্রসাদ পাবার জন্য তাঁকে বিরক্ত করলে এই ভাবে তাদের তাড়া করে তিনি বাঁচতেন।

দিনের বেলা সারাদিন শ্মশানের কাছে একটা কুঁড়ে ঘরে থাকতেন অঘোরীবাবা, বেরুতেন না। কোন কোন দিন নদীর জলে সারাদিন পড়ে থাকতেন। কখনও ডুবতেন, কখনও উঠতেন। কখনও ভেসে চলতেন মড়ার মত। তবে প্রচলিত অর্থে উনি তান্ত্রিক কিনা সাধারণ লোকে কেউ তা বলতে পারত না। কারণ তাঁর সঙ্গে সাধারণতঃ কেউ ভৈরবী দেখতে পেত না। একবার নাকি এক ভৈরবী গিয়েছিল কাছে, তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসে।

অঘোরীবাবা যে কি খান, কখন খান তাও কেউ বলতে পারত না। তবে সাধারণতঃ রাতে খেতেন। সাধন ভজনও নাকি কিছুই করতেন না। লোকের বিশ্বাস সিদ্ধপুরুষ হলে সাধন ভজন কিছু করতে হয় না। কখনও কল্‌সী কল্‌সী কারণ পান করেও নির্বিকার বসে থাকতেন, বিন্দুমাত্র নেশা হতনা। লোকের বিশ্বাস অঘোরীবাবা ভূতসিদ্ধ, পিশাচসিদ্ধ। তবে সাধারণ তান্ত্রিকের যে-সব দোষ সে-সব দোষ তাঁর কিছুই ছিল না। অঘোরীবাবা কখনও ঘুমান বলেও মনে হত না। কারণ কেউ কখনও তাঁকে কখনও ঘুমুতে দেখেনি। কখনও চুপ করে বসে থাকতেন, কখনও ঐ শ্মশানের জঙ্গলে আপন মনে ঘুরে বেড়াতেন।

অঘোরীবাবার দেহ স্থূল কিন্তু দীর্ঘকায়। শ্যামবর্ণ। মাথার চুল খুব ছোট ছোট। উদর স্ফীত। সব সময়ই উলঙ্গ থাকতেন। চোখ

দুটি বিশালাকার। দৃষ্টি সব সময় নিচের দিকে। স্থির। যখন বসে থাকতেন শরীরে বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা লক্ষ করা যেত না।

পাপ মনে কেউ গেলে বিন্দুমাত্র তিষ্ঠোতে পারত না। জানার কৌতূহল নিয়ে কেউ যদি যেত তাদেরও সহজে পাত্তা দিতেন না। এমন দুর্বাক্য প্রয়োগ করতেন যে, টেকা মুস্কিল। তবে সাধন পথের পথিক যাঁরা তাঁরাই বুঝতেন যে, ঐ দুর্বাক্যের মধ্যেও আছে অমৃত রসধারা। তন্ত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য কেউ যদি কাছে যেতেন, বলতেন, শালা অমবস্যার রাতে একলা শ্মশানে মড়ার পিঠের উপর বসে জপ করতে পারবি? মদ খেতে পারবি? মাছ মাংস তৃপ্তি করে খেয়ে কোমরে জোর করে ন্যাংটো হয়ে মেয়ে মানুষের সঙ্গে লড়তে পারবি? চন্দ্রামৃত পান করতে পারবি?

চন্দ্রামৃত এক বিবমিষা উদ্রেককারী জিনিষ। তন্ত্র সম্পর্কে যাঁরা খোঁজ রাখেন তাঁরাই জানেন এটা কি। চক্র করে সাধকেরা ভৈরবী নিয়ে বসেন। মধ্যে একজন ভৈরব ভৈরবীর সঙ্গে যৌন ক্রিয়া করেন। যে বীর্যপাত হয় সেই বীর্য উপস্থিত ভৈরব বা সাধকেরা মুখে দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করেন। একেই বলে চন্দ্রামৃত পান। যে-সব তান্ত্রিক এধরনের কাজ করেন, অঘোরীবাবা তাঁদের অশ্লীল মনে করেন না। বরং যাঁরা দেহ নিয়ে যৌনসঙ্গম করেন তাঁদের বলেন যোনিকীট।

শিক্ষিত লোক দেখা করতে গেলে বলতেন, 'ওরে শালা বল্‌তো তোর বিদ্যে কতটুকু? কটা পাশ করেছিস? কটা বই পড়েছিস? বিনয় দেখালে বলতেন, মৌখিক বিনয় আছে দেখছি! ঢং ছাড়। বল্‌তো লেখাপড়ার গোমোর এখনও আছে কিনা। সত্যি বলবিরে শালা, খবরদার, হাঁ!

বিদ্বানেরও তর্ক করার সাহস হতনা। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারত, মনের অন্তস্তল পর্যন্ত এই অঘোরীবাবা দেখতে পান। অহংকার থাকলে তাকে দূর করে দিতেন। হয় কথা বলতেন না, নয় এমন কথা বলতেন, যে-গোপন কথা বললে মুখ নিচু করে তাদের পালিয়ে যেতে হত। ধর্ম

জ্ঞান থাকলেও প্রথম একচোট খুব গালাগালি করতেন। পরীক্ষা করে দেখতেন গালাগালি করলেও ধৈর্যধরে কেউ থাকতে পারে কিনা।

অঘোরীবাবার অপার রহস্য। কঠিনের আবরণে যেমন তাঁর মধ্যে কোমল লুকিয়ে থাকত—তেমনি আবার তাঁর কতকগুলি কাজে থাকত অদ্ভুত রকম বীভৎসতা। অবশ্য সেই বীভৎসতা যে তাঁর সাম্য দৃষ্টি থেকে, তা বোঝার যার ক্ষমতা নেই তার পক্ষেই এ কাজগুলিকে বীভৎস মনে হত। আহারের ক্ষেত্রে শুধু বীভৎসতা নয় বিবমিষা উদ্রেককারী ঘটনাও থাকত। যেমন অনেক সময়ই তাঁকে দেখা যেত শ্মশান থেকে অর্ধদগ্ধ শবের মাংস ভক্ষণ করতে। অঘোরীরা এধরনের খাদ্য গ্রহণ করে তা আগেই বলেছি। বসিরহাটে নদীর ধারে এ-ধরনের এক অঘোরীবাবার দেখা পেয়েছিল বিশ্বজ্ঞান প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী দেব-কুমার বসু। দেখলেন, উলঙ্গ সন্ন্যাসী শুয়ে শুয়ে একটা অর্ধদগ্ধ শবের পা কামড়াচ্ছে। দেবকুমার বাবুকে দেখে হাসতে হাসতে বললেন, বুঝলি অনেকদিন পরে কোমল মাংস পেলাম। সৎবংশ জাত কিশোরী কন্যা। ব্রাহ্মণ। লোভ সামলাতে পারলুম না। তাই ওদের (শ্মশানযাত্রী) তাড়িয়ে দিয়ে পা'টা এনে খাচ্ছি।' সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সাধারণ মানুষ দেখলে যেমন ভয় পাবে তমনই তার ঘৃণারও উদ্রেক হবে। তার পর পাশাপাশি যখন অলৌকিক ক্ষমতা দেখাবেন এঁরা তখন আবার বিস্ময়ের সীমা থাকবেনা। দেবকুমার বাবুকেও সেই ক্ষমতা দেখিয়েছিলেন অঘোরীবাবা। যেমন, তাঁকে বলেছিলেন, 'শ্মশানবাসী মানুষ আমি, তোকে বসতেই বা দেই কোথায়, খাওয়াই বা কি ? তার পর একটুকরো কাঠ এগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, বোস। দেবকুমার বাবু বসলে পরে হাতের তুড়ি দিয়ে একটি মেয়েকে ডেকেছিলেন। আশ্চর্য! যেন মহাশূন্য থেকে অকস্মাৎ একটি মেয়ে খাবার থালা হাতে এসে হাজির। গরম গরম রুটি আর তরকারী। দেবকুমার বাবু খাবারের থালাটি হাতে নিয়ে শুধু তাকিয়ে দেখছিলেন মেয়েটিকে। অল্প বয়স। যথার্থ অর্থেই কিশোরী। কোথা থেকে সে এল এটাই তাঁর জানার

ইচ্ছা। সেই জন্য এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তার দিকে, কোথায় যায় তাই দেখবেন। কিন্তু যেমনি আকাশ ফুঁড়ে এসেছিল, যেমনি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এ অদ্ভুত রহস্যের শেষ নেই।

কথাটা দেবকুমার বাবু কলকাতায় ফিরে এসে জানিয়েছিলেন ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ শশীভূষণ দাসগুপ্তকে। তাঁরা সেই অঘোরীবাবার সঙ্গে দেখা করতেও গিয়েছিলেন। তাঁদেরই একজনের প্রাক্তন সহপাঠী সেই অঘোরীবাবা। কিন্তু এঁদের কোন অলৌকিক ক্ষমতা তিনি দেখাননি। কিছু জানেন, কিছু পেয়েছেন, একথাও স্বীকার করেননি।

বক্রেশ্বরের এই অঘোরীবাবারও অনেক বীভৎস ও বিবমিষা উদ্রেককারী ঘটনা থাকলেও—কাউকে তিনি তেমন অলৌকি ক্ষমতা দেখিয়েছেন বলে শোনা যায়না। বরং যাঁরা জ্ঞানের কথা বলতেন, তাঁদের সঙ্গে দিব্যি জ্ঞানের আলোচনা করতে বসতেন।

বক্রেশ্বরের অঘোরীবাবা ছিলেন অত্যন্ত স্বল্পাহারী। শ্মশানের এক পাশের সেই কুটীরে দিনান্তে কখনও কখনও একমুঠো কিছু ফুটিয়ে নিয়ে খেতেন। কোনদিন বা খেতেনও না, তন্ত্রসন্ধানী প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁকে একবার বীভৎস অবস্থায় দেখেছিলেন।

পাপহরা নদীর ওপারে শ্মশানে কারা একদল চুল্লি জ্বেলে মড়া পুড়াচ্ছে। সৎকারের তখন মধ্য অবস্থা। প্রমোদবাবু দেখলেন, সেই চিতার পাশে একটি লোক উবু হয়ে বসে আছে। অপর একটা লোক লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে। আর যারা সঙ্গে এসেছিল তারা হয়তো দূরে কোথাও আড্ডা দিচ্ছে। চুল্লির শিয়রে স্বয়ং আঘোরী বাবা দাঁড়িয়ে। এক হাতে লাঠি, আর এক হাতে চিম্‌টা। হঠাৎ শবের মাথাটা ফেটে একটা আওয়াজ হল। সঙ্গে সঙ্গে অঘোরাবাবা চিম্‌টা দিয়ে মাটি থেকে একটা নর কপাল তুলে নিয়ে তাতে করে মাথার গলিত ঘিলুর খানিকটা ভরে নিলেন। আধপাত্র সেই গলিত ঘিলু নিয়ে অঘোরীবাবা নিজের কুটীরের দিকে এগিয়ে চললেন। প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়

তাঁকে অনুসরণ করতে করতে সেই কুটীর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। দেখলেন, মানকচু পাতায় বাড়া গরম ভাত। ধোঁয়া উঠছে। সেই ভাতে গলিত ঘিলু ঢেলে নিয়ে তিনি খেতে লাগলেন। এমন সময় একটি লোক এল মাঝারী এক কলসী মদ নিয়ে। এক চুমুকে সেই কলসী উজার করে দিয়ে অঘোরী বাবা ঝিম মেরে বসে রইলেন।

সাধনার ক্ষেত্রে অঘোরী বাবার আশ্চর্য অভিমত বা থিওরি ছিল। তিনি মনে করতেন—দেহের ক্ষুধা, মনের ক্ষুধা, যাই হোক না কেন, ক্ষুধা থাকলে তাকে দমন করার নাম সংযম নয়। এতে লাভ হয় না। পেটে ক্ষুধা থাকবে, অথচ সংযম দেখিয়ে না খেলে যেমন ক্ষুধাও থাকবে, দেহেরও ক্ষতি হবে, তেমনি কামক্ষুধা থাকবে, তাকে পরিতৃপ্ত না করে সংযম করলে—কামের মৃত্যু হবে না। বরং ক্ষতি হবে। জোর করে কাম প্রবৃত্তি দমন করে কোন লাভ নেই।

যদি কেউ বলতেন, প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিলে সংযম হবে কি করে? তিনি বলতেন, প্রবৃত্তির মূল কোথায় তাই আগে দেখতে হবে। প্রবৃত্তির মূল হল মন। মনের সংযম অভ্যাস করতে হবে। শরীরে বেড়া দিয়ে কোন লাভ নেই। জোর করে বেড়া দিলে সুযোগ পেলেই আবার কাম প্রবৃত্তি দেখা দেবে। কামপ্রবৃত্তিকে ল্যাঙট এঁটে জয় করা যায় না।

অঘোরী বাবা বলতেন, শরীরের প্রবৃত্তি একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, প্রকৃতির গুণেই এমন হয়। একই শক্তি শরীরের নানা কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে কাজ করে। মন হল ইচ্ছাশক্তি। শরীরের সঙ্গে যুক্ত থেকে প্রাণ সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করে। কিন্তু মূলে প্রাণ আর মন পৃথক নয়। প্রাণেরই এক ভাগ মন হয়ে যাবতীয় কর্ম করে। আর এ-সব কিছুরই মূল হল চৈতন্য শক্তি। সেই চৈতন্য শক্তি ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্র থেকে লিঙ্গমূলে মূলাধার চক্র পর্যন্ত ক্রিয়াশীল। তন্ত্রমতে একেই বলে কুণ্ডলিনী।

কামবীজই হল আদি। এই শক্তি সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে স্থিতি বা পুষ্টি, লয় বা মুক্তি পর্যন্ত একটি জীবের জীবনে কাজ করে।

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের মূলে হল এই কাম। অত সহজে তাকে জয় করা যায় না।

প্রকৃতি জীবের মধ্যে যে জীবসৃষ্টি করার ব্যবস্থা করে রেখেছেন— সে যদি তার অনুকূল পথ না পায় তাহলে ইষ্ট লাভ হবে কেমন করে? প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেলে নিজের বা জগতের কারোই কল্যাণ হয় না।

যদি কেউ প্রশ্ন তুলতেন, স্থূল সৃষ্টি বাড়াবার দিকে নজর না দিয়ে চৈতন্য শক্তিকে যদি উচ্চমার্গে চালনা করা যায়? অঘোরী বাবা বলতেন, প্রকৃতিগত কর্মজীবনকে না ফুটিয়ে অন্যপথে চৈতন্যশক্তিকে চালনা করা যায় না। স্থূল সৃষ্টিটা পাপের কিছু নয়। আসলে ব্যাপার কি জানিস, তোর মধ্যে প্রকৃতি যেটুকু শক্তি দিয়েছেন তা যাতে সঠিকভাবে ফুটে উঠে, তোর কর্মসংস্কার অনুযায়ী সে সব যাতে ঠিক ঠিক ফুটে উঠতে পারে এমনি ক্ষেত্রে প্রকৃতি তোকে জন্ম ও কর্মক্ষেত্রের সুযোগ করে দিয়েছেন। শিশুকালে মায়ের কোলে লোকে মানুষ হয়, ভাল মন্দের ভার মায়ের উপর. তেমনি বড় হলে নিজ জ্ঞানবুদ্ধি খুলে। চলছিস চলে যা, মনে করবি তা হল অন্য এক মায়ের কোলে। শিশুকালে মাকে জেনেছিস মার উপর নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করেছিস বলে। বড় হয়ে নিজ কর্ম বুদ্ধি ও জ্ঞানের উপর একটা আস্থা এসেছে বলে জানতে পারছিস না যে, প্রকৃতি মা তোর সকল কর্ম ও বুদ্ধির সহায়। কিন্তু আসলে কেউ নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় চলতে পারে না। তা যদি পারত, তাহলে প্রতিপদে এত বাধা কেন? আসলে এই বাধা দেন প্রকৃতি মা। বাধা দিয়ে, ব্যথা দিয়ে তোর যা নির্দিষ্ট পথ সেই পথে তোকে চালনা করেন। আড়ালে থেকে তোর যা আসল স্বরূপ, সেই রূপ জানিয়ে দিয়ে মুক্তি দিতে চান।

খাদ্যাখাদ্যের ব্যাপারেও অঘোরী বাবা তথাকথিত নিয়মকানুনের ধার ধারতেন না। বলতেন, যতটা তোর ক্ষুধা, খাবার প্রবৃত্তিও ততটাই হবে। আর ক্ষুধা অনুযায়ী খেলেই পুষ্টি হবে, উপকার হবে। শরীর নীরোগ থাকবে। রসনার লোভে ক্ষুধা না থাকলেও খাওয়া হবে

প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া। আর এ-ব্যাপারে প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেলেই রোগ হবে। প্রাণাগ্নি যা হজমশক্তি, লোভের সঙ্গে তার উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপালেই তা ব্যর্থ হবে। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হবে।

যৌবনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন অঘোরী বাবা। বলতেন, যৌবন হল মধুমাস, মধুমাতাল। মধু যেমন মিষ্টি, মধু তেমন মদও। প্রকৃতি যৌবনে সর্বশক্তিমত্তার নেশায় জীবকে বিভোর করে রাখে। এই হল নরনারীর মিলনেব সময়, মৈথুনের সময়। আর জীবদেহে সুখের চরম হল মৈথুন। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ এক সঙ্গে ভোগ হয়। এর চেয়ে বড় পার্থিব সুখ প্রকৃতি আর কোথাও দেন নি। দুটি প্রাণীর সকল ইন্দ্রিয় এক হয়ে যেন একটি সত্তা হয়ে যায়।

অন্য যত সুখ তার কোনটাই এত পরিপূর্ণ নয়। কোনটা বা শুধু শব্দের, কোনটা স্পর্শের, কোনটা শুধু রূপ নিয়েই। কোনটা বা গন্ধের। কোনটাতেই ইন্দ্রিয়গুলির পূর্ণ সুখ নেই। কিন্তু মৈথুনে আছে সব সুখ একত্রে। এই জন্য মৈথুন হল আদি রস। সৃষ্টির মূল কারণ। জীব-সৃষ্টির নেশা কাটলে তখন উচ্চভাবের বিকাশ। তখন নানাধরনের রস সৃষ্টি। তখনই চৈতন্যের প্রসার। তবে কেউ যদি ইন্দ্রিয় সুখকে একমাত্র বলে ভেবে তাকে সংস্কারগত করে ফেলে, মনে করে এর জন্যই বেঁচে থাকা—তবেই ক্ষতি।

অঘোরী বাবার এ তত্ত্ব অত্যন্ত সহজ তত্ত্ব। সাধারণ লোকের পক্ষে গ্রহণ করার এর চেয়ে সহজ পথ আর নেই। এই জন্যে এক সময় তন্ত্রে ছেয়ে গিয়েছিল দেশ। স্বাভাবিকভাবে ধর্মকর্ম করার পথ হল তন্ত্রপথ। ঐতিহাসিকদের ধারণা, বৈদিক যুগের শেষভাগে অথচ মহা-কাব্যের বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কয়েক শতাব্দী আগে ধর্মের গ্লানি যখন চরম অবস্থায় উপনীত হয় তখন তিব্বতবাসী নরদেহধারী শিব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন মহা যোগেশ্বর। মহাজ্ঞানী ও মহাবিভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন যোগমার্গের নতুন সহজ কৌশল। পণ্ডিত মুর্খ সকলেই অতি সহজে এই যোগ অভ্যাস করতে

পারতেন। এই জন্য শিবের এই পদ্ধতি সহজমার্গ নামে পরিচিত। অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানী শিব ছিলেন দেহের ব্যাপারে অনাসক্ত। সেই পথে সাধন প্রয়াসী তান্ত্রিকেরা তাই দেহসজ্জার দিকে তেমন যত্ন নেন না। ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকেন বলে চক্ষু অর্ধমুদ্রিত, নেশাগ্রস্ত। দেহের প্রাকৃতিক প্রয়োজনেও অপ্রয়োজনীয় বাধা সৃষ্টির নির্দেশ নেই। এজন্য বৈদিক মতে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা এ সাধনমার্গকে তেমন পছন্দ করতেন না। ইদানিং কালেও শিক্ষিত ব্যক্তিরা এ ধরনের সাধনাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। ফলে অঘোরী বাবাও শিক্ষিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত বিরূপ। বলতেন, ভদ্দোর, ইঞ্জিরি পড়া বিদ্বান বুদ্ধিমান লোকেরাই মৈথুনকে জীবনের শ্রেষ্ঠ বলে ধরে নেয়। প্রাকৃত দেহের যা ক্ষুধা নয়, তার চেয়ে বেশী ক্ষুধা মনে মনে তৈরী করে নেয় বলে দেহের বদহজম হয়। পুরুষত্বহীনতা, অজীর্ণ, হৃদ্‌রোগ, স্নায়ুরোগ, পক্ষাঘাত, বাত, মূত্ররোগ, যক্ষ্মা এই সব রোগে ভোগে। ছোটলোকদের মধ্যে এ রোগ কম। কারণ, তারা প্রকৃতির স্বাভাবিক গুণে দেহের মধ্যে ইন্দ্রিয় চর্চা করে। যতটুকু ক্ষুধা ততটুকু খায়। দেহের উপর মন দিয়ে তৈরী ক'রে বেশী আকাঙ্ক্ষা চাপায় না। অবৈধ ইন্দ্রিয় চালনায় প্রবৃত্তিও হয় না তাদের। ভদ্দোর নোক হল শয়তানের সৃষ্টি। সে ব্যাটাও তো কম শক্তিশালী নয়।

যদি কেউ অঘোরী বাবাকে বলতেন, কামেন্দ্রিয় বাসনাদির সংযমের জন্য কি সংসার থেকে একটু আলাদা হয়ে থাকা দরকার? তিনি জবাব দিতেন, ঘরে থেকে সংযম করলে বাধা কোথায়? ঘরে যদি বাধা থাকে বাইরেই বা বাধাহীন থাকবে কি করে? যেটা যথার্থ বাধা সেটা সঙ্গেই আছে। থাকবে। তাকে ঘরে বসে সাধনা করলেও দমন করতে হবে, বাইরেও।

তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে অঘোরী বাবা বলতেন, মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে এই 'তন্ত্রশাস্ত্রের' সাধনা। এতে কোন অবান্তর আড়ম্বর নেই। যৌবন এলে তবেই এই সাধনার আরম্ভ। মনোবৃত্তির সঙ্গে মিলিয়ে

নিয়ে সাধনার এমন অনুষ্ঠান অন্য কোন ধর্মে নেই। তন্ত্রের সাধনা প্রবৃত্তি মার্গে। এ নিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে কোন বিরোধ নেই। অথচ উদ্দেশ্যের কথা যদি বলতে হয়, তাহলে সব ধর্মের যে উদ্দেশ্য তন্ত্রধর্মেরও সেই একই উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য মুক্তি। মুক্তি মানে জীবের স্বরূপে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতি। জীব যখন পাশবদ্ধ অবস্থায়, তখন জীব। পাশমুক্ত হলেই শিব। জীব যখন পাশবদ্ধ তখন তার নাম পশু। এই পাশ কিসের পাশ? মায়ার পাশ। সৃষ্টির উৎস হল মায়া। স্থূল শরীরের জীব আবদ্ধ মায়াপাশে। এই জন্যই সে পশু। পরম চেতনা যিনি তিনিই শুধু পাশ দ্বারা আবদ্ধ নন, বরং যে মায়াপাশ দ্বারা বাঁধা হয় সেই মায়ারও উৎস তিনি। এইজন্য পশুপতি।

অঘোরীবাবার মতে, পাশমুক্ত হলে পরেই শিবত্ব লাভ। তবে এই পাশ জোর করে মুক্ত হওয়া যায় না। এর একটি ক্রম আছে। সেই ক্রমে, সেই ধারাতে চলতে পারলে পাশমুক্ত হওয়া সহজ হয়।

অঘোরী বাবা বলতেন, যে চৈতন্যশক্তি এই জগৎ প্রপঞ্চ ভেদ করতে পারেন সেটি মানুষের মধ্যে সুপ্ত হয়ে থাকে। ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের যেমন জ্ঞান থাকেনা, জাগ্রত হলে 'আমি'-জ্ঞান, জগৎ বিষয়ে জ্ঞান আসে, সেই রকম মানুষের মধ্যে যতক্ষণ কুণ্ডলিনী শক্তি সুপ্ত থাকে ততক্ষণ জগৎপ্রপঞ্চের স্বরূপ-জ্ঞানও সুপ্ত থাকে, অবিকশিত থাকে। তন্ত্রশাস্ত্র হল যোগশাস্ত্র অনুগত ধর্ম। এর মধ্যে নৈতিক আবর্জনার কচকচি নেই বলেই নীতিধর্মের গোঁড়ারা তন্ত্রসাধনাকে ঘৃণা করেন।

নীতিকে সমর্থন করে কিছু বলতে গেলেই অঘোরী বাবা বলতেন যে,—নীতিশাস্ত্রের শাসনেই সব ধর্ম বিকৃত হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে, বাহুল্য না করে, প্রকৃতির রীতি অনুযায়ী যে ধর্ম, সেখানে আবার নীতির দরকার কি? নীতি চালাতে গেলেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সঙ্গে বাধে দ্বন্দ্ব। এতেই দেখা দেয় ভণ্ডামো আর ভ্রষ্টাচার। তন্ত্রের ধর্ম স্বাভাবিক। স্বাভাবিক ভাবেই চলে। এতে ভণ্ডামীও নেই, ভ্রষ্টাচারও নেই।

যৌবনকে বড় মূল্য দিতেন অঘোরীবাবা। কামনা বাসনাক্লিষ্ট যৌবনকে এতটুকু ঘৃণা করতেন না, সাধন পথের পরিপন্থী বলে ভাবতেন না। বলতেন, যৌবনের যে প্রকৃতি, তাই নিয়ে তান্ত্রিক সাধনার আরম্ভ। যৌবনে প্রথম আকাঙ্ক্ষার বস্তু হল পুষ্টিকর খাদ্য। সেই জন্য মদ মাংস মৎস্যের ব্যবস্থা। শরীরে তো শক্তি চাই। শক্তি না হলে সাধনা হবে কি করে?

তিনি বলতেন, যে যে-পথেই চলুক না কেন, মূলত সবাই শাক্ত। জীবনের প্রথম প্রবণতাই শক্তিমুখী। যে এটা অস্বীকার করতে চাইবে সে ভণ্ড, মিথ্যাচারী।

আগেই বলেছি, অঘোরী বাবার ব্যবহার বড় কড়া। রেখে ঢেকে কথা জানেন না। সাধারণের কাছে পরিচিত অনেক উচ্চশ্রেণীর সাধুকে তিনি কোন মূল্যই দিতেন না। উচ্চাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন, এ-সব যাঁরা করতেন, সেই সব তান্ত্রিকের প্রতিও তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। বলতেন, এ হল প্রকৃতির নিয়মের উপর জোরজবরদস্তি: সৃষ্টির নিয়ম অলঙ্ঘ্যনীয়, তা ভাঙতে গেলে শাস্তি অনিবার্য। এ-সব কাজ যারা করে এজন্য তাদের শাস্তি পেতে হয়।

ভৈরবী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে অঘোরী বাবা বলতেন,—পুরুষ-ভিমানী প্রকৃতি যাদের, নারী প্রকৃতির সংযোগের ফলে তাদের মধ্যে আত্মচৈতন্যের উদ্বোধন হয়। দুটি আত্মার মিলনে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাতে দুটি জীবনই সার্থক হয়। যথার্থ যে সাধক, ভৈরবী সঙ্গে রাখলেও তাঁর লাম্পট্যদোষ থাকে না। নরক ঘাঁটা তো উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য কামময় জীবনের মধ্য দিয়ে মুক্ত হওয়া। বিষে বিষক্ষয়। কাম দিয়ে কামজয়। আপ্তকাম হওয়া। তবে তন্ত্রে এমন ব্যবস্থাও আছে যে, ভৈরবী না রাখলেও চলে। ঊর্ধ্বরেতা হয়ে স্ত্রীসঙ্গ বা ভৈরবী সঙ্গ না করেও সিদ্ধকাম হওয়া যায়।

ইচ্ছে থাকলেই কেউ ঊর্ধ্বরেতা হতে পারেন কিনা এরকম প্রশ্ন করা হলে বলতেন—কর্মক্ষেত্রে যাদের জীবসৃষ্টির সামান্য যোগাযোগ

আছে তাদের পক্ষে উর্ধ্বরেতা হবার সুযোগ পাওয়া প্রায় অসম্ভব। জন্ম জন্মান্তরের কর্মপ্রবণতা শেষ না হলে উর্ধ্বরেতা হওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে অঘোরী বাবা আরও বলতেন যে, উর্ধ্বরেতা হওয়াটাই তো উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হল আনন্দময় জীবন, দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি। যৌবনে যখন নারীর প্রতি আকর্ষণ আসে তখন জোর করে মন ফিরিয়ে প্রবৃত্তিকে সংযত করা তন্ত্রশাস্ত্রে অনুমোদিত নয়। তন্ত্রে কোথাও অস্বাভাবিক রাস্তায় যেতে বলা হয় নি। যদি পরিমিত নারীসঙ্গ করা যায় তাহলে অধ্যাত্মমার্গে সাধনার তা অন্তরায় হয় না। বাড়াবাড়ি করলেই খারাপ। ইন্দ্রিয়সুখ যদি মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় তবেই তা অধঃপতনের কারণ। ছোব্‌ড়া আর খোসার মধ্যেও ফলের স্বাদ কিছুটা আছে, কিন্তু তাই বলে তা খাদ্য নয়। যতটুকু খাদ্য ততটুকুই নিতে হয়। নারীসঙ্গের যতটুকু নেওয়া প্রয়োজন ততটুকুই নিতে হবে। সংসারের যতটুকু নেবার ততটুকুই নিতে হয়। খোসা আর ছোব্‌ড়া খেতে নেই। তবে এমন ফল আছে যা খোসা বাদ না দিয়েও খাওয়া চলে। খোসাসুদ্ধ খেলেও আসলটাই শরীরের কাজে লাগে অসারটা আপনিই বেরিয়ে যায়। কামফলও সেই রকম, খোসাসুদ্ধ খেলেও, সময়ে তা আলাদা হয়ে যায়। যাদের জীবনে যৌবনের ক্ষুধা ভোজন ও ইন্দ্রিয়সুখে আবদ্ধ নয়, যারা আরও কিছু উচ্চজ্ঞান লোভের আকাঙ্ক্ষা রাখে তাদের পক্ষে উর্দ্ধরেতা হওয়া অসম্ভব নয়। পরিমিত যৌন সম্পর্ক থাকলেও তাঁরা যত বেশী উচ্চ আদর্শের সন্ধান পান ততই উর্দ্ধরেতা হতে থাকেন। এর ফলে তাঁদের নানা তত্ত্ব উপলব্ধি হয়। তাঁরা আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ পান। জগৎবাসীর সঙ্গে তাঁদের প্রেমের সম্বন্ধ হয়। তখন তাঁরা বুঝতে পারেন যে, স্থূল শরীরের যে মৈথুনসুখ সেটা নতুন অভিজ্ঞতার কাছে কিছুই নয়। উর্দ্ধরেতা হয়ে গেলে নারী সঙ্গে থাকলেও কসরৎ করার প্রয়োজন হয় না। জগৎসমাজে তাঁরা শ্রেষ্ঠ মানুষ হন। অনেকেই তখন তাঁদের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করে। তাঁদের মধ্যে পৌরুষ তখন প্রবল হয়।

অঘোরীবাবা বলতেন যে, তন্ত্রশাস্ত্রমতেও বিবাহের ব্যবস্থা আছে। তবে এ বিবাহে জাতিবংশ গাঁইগোত্র এ-সবের কোন বালাই নেই। শৈববিবাহই যথার্থ বিবাহ। এর ফল আর্য বর্ণাশ্রমী বিবাহের মত বিষময় হয় না। আর্য বিবাহের ব্যবস্থাটাই হল ভণ্ড ব্যবস্থা।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে তান্ত্রিকতা সম্পর্কে অঘোরী বাবা বলতেন যে, বাঙ্গলা দেশে এসে তান্ত্রিকদের সঙ্গে পরিচয় হবার পরই ব্রাহ্মণদের মধ্যে তান্ত্রিকতা দেখা দিয়েছিল। এর ফলেই সংস্কৃতে তন্ত্রগ্রন্থ লেখা হতে থাকে। সংস্কৃতে যখনই তন্ত্র গ্রন্থ লেখা হতে থাকে তখন শিব আর্যদেবতাদের মধ্যে নিজের ঠাঁই করে নিয়েছেন।

অঘোরীবাবার তন্ত্রের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা সবার হয়তো মনোমত নাও হতে পারে। কারণ, বঙ্গদেশের আগেই উত্তর পশ্চিম ভারতে এর যথেষ্ট ব্যাপকতা ছিল। সেই তন্ত্রাচারের কথা সংস্কৃত সাহিত্যেও উল্লেখিত আছে। তবে তন্ত্র যে আর্যদের সাধনকৌশল নয় এটা ইতিহাসও বলে। তন্ত্র অনার্য-ধর্ম হলেও এর মধ্যে একটা বিশেষ রকমের মূল্য আছে নিশ্চয়ই। সেই মূল্যের একটি মূল্য এই যে, এর সাধনপদ্ধতি অত্যন্ত সহজ। লোভনীয়ও বটে। সেইজন্য ব্রাহ্মণ্যধর্মও একে যেমন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল, তেমনই হয়েছিল বৌদ্ধধর্মও। বৌদ্ধরা শেষ পর্যন্ত তন্ত্রমার্গকেই তাদের প্রধান অবলম্বন করেছিল।

অঘোরীবাবা ব্রাহ্মণ আর ভদ্রলোক এই দুয়ের সম্বন্ধেই খুব খারাপ ধারণা পোষণ করতেন। তন্ত্রের মধ্যে গুহ্যমন্ত্রের সূচনা ব্রাহ্মণেরাই করেছেন বলে তাঁর বিশ্বাস। ধর্মীয় উপজীবিকা নিজেদের মধ্যে এক-চেটিয়া করে রাখার জন্যই তাঁরা এটা করেছিলেন।

তবে ব্রাহ্মণেরা তন্ত্রের মধ্যে গুহ্যমন্ত্রের অবতারণা করলেও তন্ত্রে কৃচ্ছ্রসাধনার বালাই নেই। তন্ত্র প্রমাণ করেছে যে, ভোগ এবং যোগ একত্র মিলেই ধর্ম। জীবনলীলার ক্রমবিকাশ এই তন্ত্রের মধ্যেই ধরা আছে। তন্ত্রের প্রতিপাদ্য সকল বিষয়ই নির্মল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

তন্ত্রের অবনতির কারণ হিসেবে অঘোরী বাবা ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদেরই

দায়ী করতেন। তৎকালীন সমাজকেও তিনি এ-জন্য দায়ী করেছেন। এতে ব্রাহ্মণেরাও হীনবল হয়ে পড়েছিল, এবং বৌদ্ধরা এর উন্নতি করলেও অবনতিও যথেষ্ট করেছিল। এদের জন্য তন্ত্রের অভিচারক্রিয়া এত বেড়ে গিয়েছিল যে, প্রায়শঃই তার ব্যবহার হত। ঈর্ষা, বিদ্বেষ, রাগ, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয় সম্ভোগ, নারীকে অবলম্বন করে সমাজের মধ্যে যথেচ্ছাচার, অভিচারক্রিয়াকে সহায় করে এ-সব একেবারে চরমে উঠেছিল। তখন নারী সমাজে সতীত্ব বলে কোন আদরণীয় বস্তু ছিলনা। তখন ভ্রষ্টাচারই ছিল বড়। এই ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে প্রথম ধাক্কা দিয়েছিলেন শঙ্করাচার্য, তারপর শেষদিকে শ্রীচৈতন্য। এর পর থেকেই তন্ত্রের প্রভাব হীনবল হয়ে পড়তে থাকে। তন্ত্রের অনেক কিছুই বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে চলে যায়—যেমন গুহ্য একাঙ্গ মৈথুনতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, ইত্যাদি। সহজিয়া, আউল, বাউল এরা হল তন্ত্রের উচ্ছিষ্ট নিয়ে তৈরি।

তন্ত্রের ব্যাপার গুহ্য কেন, প্রশ্ন করা হলে অঘোরী বাবা বলতেন—প্রথমে তো গুহ্য ছিল না। পরে হয়েছে। প্রথমে তন্ত্রের সাধনা ছিল সহজ ও সাধারণের উপযোগী। মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা মৈথুনাদি প্রকরণ যুক্ত হওয়াতে একে আড়াল করতে হল সাধারণ মানুষের কাছ থেকে, পাছে কেউ একে মনে করে ঘৃণার বস্তু। কারণ, এই সব প্রকরণ থেকে অল্প লোকেই সারবস্তু পেয়েছে। জল থেকে দুধ তুলে নেওয়া সহজ কথা নয়। হাঁস হতে হয়। বেশীর ভাগ লোকই এই সব প্রকরণ চর্চা করতে গিয়ে গেছে বিপথে, ব্যাভিচার করেছে। তবে গুহ্য রাখাতে এই দোষ হয়েছে যে, গোটা কয়েক সঙ্কেত ছাড়া কামরাজ্যের বিচিত্র রহস্য সাধারণ মানুষের কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে। স্ত্রীপুরুষের মিলনে রমণ—এর মধ্যে শারীর ধর্মেই সাধারণের প্রবৃত্তি। কিন্তু শারীর ধর্ম বর্জিত প্রেম বলে যে একটা স্বর্গীয় সুখ আছে তা সাধারণের কাছে গুপ্ত, অপ্রকাশিত, অজ্ঞাত। একে আরও নষ্ট করে দিয়েছে সহজিয়াদের তন্ত্র-সাধনা। যে ধর্মে দু'একটি লোক সিদ্ধ হয় তারপর ক্রমে সেই ধর্ম অনেকটা বিকৃত হয়ে আসে। শেষে তন্ত্রের মতই শোচনীয় পরিণাম হয়।

অঘোরীবাবা মনে করতেন, তন্ত্রসাধনা একটা অনুভবের ব্যাপার, সাধনার ব্যাপার, লিখে একে বোঝানো যায়না। বস্তুতঃ অনুভবকে কোনদিনই ভাষা দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। বিশেষ করে তন্ত্র সাধনার ব্যাপার অত্যন্ত জটিল। লিঙ্গ থেকে মস্তিষ্ক অবধি প্রাণমার্গে তার ক্রিয়া। রেত বা ধাতু ক্ষরণের নানারকম প্রকারভেদ আছে, যেমন, অন্তক্ষরণ ও বহিঃক্ষরণ। কেমন ভাবে কোন্ ক্রিয়ার সাহায্যে রেতের বহিঃক্ষরণ বন্ধ করে তাকে আন্তরমার্গে গতিমান করা যায় প্রকৃতি নিজেই তা গুহ্য করে রেখে দিয়েছেন। কামকলা নিয়ে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের ব্যাপার চলেছে। মানুষের শরীরের ভিতরে স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসা থেকে শুরু করে কামের উদ্দীপনা যে ভাবে দু'জনের উপর দু'জনের চৈতন্য থেকে আরম্ভ করে মনের ভিতর দিয়ে শরীরের উপর টান, তারপর মৈথুনে দুটি এক হয়ে যাওয়া, তারপর প্রাণশক্তির ঘন স্পন্দনের উদ্দামলীলা—শেষে উভয়ের স্খলন—এটা একটা রহস্যময় ব্যাপার। শরীরের নানা সূক্ষ্ম নাড়িগুলির মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে যে ভাবের ক্রিয়া, তাকে ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা প্রায় দুঃসাধ্য। এসবই হল অনুভবের ব্যাপার, বিজ্ঞানের ব্যাপার। কামের প্রথম প্রেরণা থেকে আরম্ভ করে পূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত যে সমস্ত ব্যাপার, তাই হল তন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

অঘোরীবাবা নারী পুরুষকে শুধুমাত্র নারী বা পুরুষ বলতেন না, বলতেন, নারীপ্রকৃতি আর পুরুষপ্রকৃতি। যথার্থই বলতেন, কারণ বস্তু জগতের সব কিছুই প্রকৃতিজাত। সরাসরি পুরুষজাত কেউ নেই। পুরুষজাত হলেই তা হয়ে যায় প্রকৃতি। সুতরাং সরাসরি পুরুষ থেকে সৃষ্টি হলেও নর আর নারী উভয়েই প্রকৃতিজাত। প্রকৃতির সংজ্ঞা এড়াবার সাধ্য কারো নেই!

রামকৃষ্ণের মত অঘোরীবাবাও জানতেন যে, সব ধর্মেরই লক্ষ্য এক কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, সব দর্শনের মোদ্দা কথা একরে শালা! তত্ত্বে পৌঁছুলে সবই একরকম! পথের প্রকরণ বা পদ্ধতিই যা আলাদা

তন্ত্রে শরীরতত্ত্ব একটা বড় ব্যাপার। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে অঘোরীবাবা বলতেন, সাধন তো শরীর নিয়েই। কাজেই সুস্থ শরীর সুস্থ মন না হলে সাধনের মানে হয়না। বিকৃত শরীরে সাধনা মানে শরীরের চিকিৎসা, কোবরেজী অষুধের বদলে শরীরের ভিতরকার নিয়মে বায়ুর গতি স্থির করে তাকে স্বাস্থ্যের তালে চালানো। সাধন বস্তুটি এমনই কল্যাণকর যে, তাতে আর কিছু না হোক শরীরে স্বাস্থ্য পূর্ণমাত্রায় আসবেই আসবে। সাধন করছে অথচ শরীর খারাপ, বুঝতে হবে সে সাধনা হচ্ছে মরণের সাধনা, জীবনের সাধনা নয়। সাধনার প্রথম ফলই হল স্বাস্থ্য। আনন্দময় মানবিক অবস্থা। সকল বিষয়েরই তখন আনন্দে পরিসমাপ্তি। মহাদুঃখের ব্যাপার হলেও সাধকের প্রাণে সেই দুঃখের কারণ-জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়,—তার ফলও আনন্দ।

অঘোরীবাবা সাধারণতঃ খুব গম্ভীর থাকতেন। সহজে তাঁর সঙ্গে কেউ কথা বলতে সাহস করত না। সাধারণতঃ চোখ দুটি থাকত অর্ধ নিমিলিত। ফলে তাঁর অক্ষিগোলক যে কত বড়, সহজে কেউ অনুমান করতে পারত না। রাগ করে কারো দিকে তাকালেই সে চোখের আয়তন ধরা পড়ত। অত্যন্ত বিশাল চক্ষু। পূর্ণ দৃষ্টিতে কারো দিকে তাকালে অনেকের পক্ষেই সে দৃষ্টি সহ্যকরা ছিল কঠিন ব্যাপার। চোখ দুটি সব সময়ই আরক্ত, কিন্তু স্থির ও প্রশান্ত। চোখে প্রায় পলকই পড়ত না। সেই চোখের গভীর দৃষ্টি যারা ধরতে পেত তারা ভয় পেতনা। বুঝতে পারত যে, ভেতরে রয়েছে প্রেমের উৎস। যারা কোন নিচু আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আসত তারা সেই চোখ দেখে ভয় পেত। আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হত না। যারা আসত মহৎ প্রাপ্তির আশায়, তারা বুঝতো। তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন।

আশ্চর্য এই অঘোরীবাবা। অধিকাংশ সময়ই মহাশ্মশানে পড়ে থাকতেন। কোন্ ধরনের তান্ত্রিক তিনি কেউ জানত না। তবে বীরাচারী তান্ত্রিকদের প্রকৃষ্ট স্থান হল শ্মশান। বীরভূমের শ্মশানে এইজন্য নানা ধরনের তান্ত্রিকের সন্ধান মেলে। তান্ত্রিকরা শুধুমাত্র বাংলাদেশে

বীরভূমের শ্মশানকেই এত পছন্দ করেন কেন কে জানে। তবে বীরভূমের শ্মশানগুলি যথার্থই শ্মশানের মত। এমন ভয়াবহ শ্মশান বুঝি বাংলাদেশের অন্যত্র কোথাও নেই। শ্মশানগুলি প্রায়শঃই নদীতীরে। আশেপাশে জঙ্গল। অস্থি, নরকঙ্কাল, দগ্ধ অঙ্গার, আধপোড়া কাঠ, চারদিকে এই সবের ছড়াছড়ি। কাক, চিল, শকুন শৃগাল আর কুকুরের অবাধ যাতায়াতের কারণ এই যে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শবকে কেউ এখানে দাহ করেনা, মাটিতে গর্ত করে পুতে রেখে যায়। শেয়াল কুকুরেরা সেই জন্যই এখানে ঘোরাফেরা করে। শ্মশান জনশূন্য হলেই মাটি আঁচড়ে মৃতদেহগুলি বের করে ভাগাভাগি করে খায়। শুধু হাড়গুলো চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। কোথাও বা চিতার পোড়া কাঠ, কোথাও ছেঁড়া কাঁথা ছেঁড়া কাপড়, কোথাও বা কাণাভাঙ্গা কল্সী। যে ছবিটা এর মধ্যে ফুটে উঠে তা যথার্থই ভয়াবহ। এই ধরনের ভয়াবহ স্থানই তান্ত্রিকদের পছন্দ। এই জন্যই বীরভূমের এইসব শ্মশানে তান্ত্রিকদের আস্তানা। তন্ত্রের উদ্‌গাতা স্বয়ং মহাযোগী শিব এই শ্মশানকেই তাঁর আশ্রয় করেছিলেন। তান্ত্রিকদের কাছে শ্মশান বড় কেন কে জানে! সাধারণ মানুষের কথা এই যে, শ্মশানে এলে বৈরাগ্য দেখা দেয়। তন্ত্রপথের সাধনপন্থী যাঁরা তাঁরা তো পরম বৈরাগ্যকেই তাঁদের উদ্দেশ্য করেছেন, সুতরাং শ্মশান তাঁদের প্রিয় বাসস্থান হতে পারে। কিন্তু এ-ব্যাখ্যা আমাদের সাধারণ মানুষের ব্যাখ্যা। এ সম্পর্কে তান্ত্রিকদের অভিমত জানা নেই। যাই হোক, বীরভূমে বক্রেশ্বরের মহাশ্মশানও অন্যান্য শ্মশানেরই মত ভয়াবহ। আর অঘোরীবাবার খুব প্রিয়স্থান ছিল এই শ্মশান। এখানে শিবেরই মত একটি হাতকে উপাধানের মত করে মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে থাকতেন তিনি। ঊর্ধ্বে অনন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে বিভোর হয়ে যেতেন। কেউ যদি সেখানে গিয়ে বিরক্ত করত তাঁকে, ধম্‌কে উঠতেন: বেরো শালা! এখানে কেনে তুই, যা, চলে যা এখান থেকে। আমি এদের সঙ্গে ভাল থাকব। এরা মনে মনে অতশত হিসেব করে না। যা, যা, যা।'

'এরা' বলতে তিনি কাদের বোঝাতে চাইতেন কে জানে। তবে ভাবসাবে মনে হত, শবদাহ করে যে-সব হাড়ি, ডোম, তাদের বোঝাতেন।

সচরাচর অঘোরী বাবার কাছে ভৈরবী দেখত না কেউ। আপনাতে আপনি পূর্ণ যেন অঘোরীবাবা। যদিও দেহচর্চার নিন্দা করতেন না তিনি, কামচর্চারও নিন্দা করতেন না, বরং পরিমিত কামচর্চার প্রশংসাই করতেন, তবু নিজে তিনি কামচর্চা করতেন বলে মনে হয় না। যাঁরা অঘোরীবাবার কিছু কিছু খবর রাখতেন তারা বলতেন, 'ভৈরবীর দরকার কি। মৈথুন তো দিবারাত্র হচ্ছে বাবার। কুলকুণ্ডলিনীকে সহস্রারে তুলে দিয়ে দিবারাত্র মৈথুন করছেন বাবা।'

কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্বের যাঁরা খবর রাখেন তারাই এ ধরনের মৈথুনতত্ত্ব বোঝেন। অন্যের কাছে তা হেঁয়ালী বলে মনে হয়। তারা বোঝে না। তবে এ-জন্য যথার্থই যে অঘোরীবাবার উপযুক্ত কোন ভৈরবী ছিল না, তাও নয়। পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর থেকে এক ভৈরবী আসতেন। নাম মহেশ্বরী মাতা। যদিও মাথায় তাঁর জটাজুট, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কিন্তু সাধারণ ভৈরবীর মত তিনি দেখতে নন। ভয়ঙ্করিতা কিছু নেই। করুণাময়ীর মূর্তি। চোখে যেন অনন্ত করুণার ঝর্ণা। দেখলে মনের মধ্যে শুধু একটি ভাবেরই উদ্রেক হয়, তার নাম শ্রদ্ধা।

মহেশ্বরী মাতা বক্রেশ্বরের শ্মশানে আসতেন অঘোরীবাবার সঙ্গে চক্র করতে। সে-এক অদ্ভুত দৃশ্য। এর যে অর্থ কি, সাধারণ মানুষের কাছে তা দুর্বোধ্য। এই চক্র যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বলেন, এর মধ্যে অনেক অলৌকিক ব্যাপার ঘটে। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে ধর্মসাধনার পক্ষে এ এক অদ্ভুত আচার।

মহেশ্বরী মাতাকে বক্রেশ্বরের শ্মশানে দেখা গেলেই শ্মশানবাসীদের মধ্যে কানাকানি উঠত: 'অঘোরীবাবার দরবারে আজ চক্র বসছে।' সেদিন যথার্থই শ্মশানটা নীরব থাকত। কোথা থেকে আরো কিছু

তান্ত্রিক আসত ভৈরবী নিয়ে। গভীর রাত্রিতে অঘোরীবাবাকে কেন্দ্র করে এদের নিয়ে সেই চক্র বসত।

নিশীথ রাত্রির মহাশ্মশানে। চতুর্দিকে মহা-আশঙ্কার মত নিরন্ধ্র অন্ধকার। তান্ত্রিকেরা তাঁদের ভৈরবী নিয়ে কিছুটা জমি জুড়ে সারি সারি বসে থাকতেন। বসতেন চক্রাকারে। মাঝখানে একটি কলসী বা কারণপাত্র রাখা হত। তান্ত্রিকরা নিজে নিজ আসনে স্থির হয়ে বসে মন্ত্র জপ করতেন। প্রত্যেকের সামনে থাকত একটি করে কপালপাত্র ও একটি করে তাম্রকুণ্ড। কি প্রক্রিয়া হত এতে কে বলবে! কিছুক্ষণ পরে আসতেন অঘোরীবাবা। নিজ নিজ আসন থেকে ভৈরব-ভৈরবীরা তাঁকে দেখে মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানাতেন।

অঘোরীবাবা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে আসতেন। অবশ্য সাধারণতঃ তিনি উলঙ্গই থাকতেন। তাঁর মুখমণ্ডলে থাকতো অদ্ভুত প্রশান্তি। চোখের দৃষ্টিতে যেন পলক পড়ত না। চক্রের মাঝখানে গুলবাঘের ছালে তৈরী এক শূন্য আসন থাকত। একজন ভৈরব উঠে গিয়ে অঘোরীবাবাকে সেই আসনের কাছে দাঁড় করিয়ে দিতেন। অঘোরী সেই আসনে দাঁড়ালে মহেশ্বরী মাতা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে একখানি উপকরণপূর্ণ পাত্র নিয়ে অঘোরীর সামনে এসে দাঁড়াতেন। তারপর পাত্রটি নিচে রেখে তাঁকে প্রণাম করতেন এবং শেষে পাদপূজা করতেন। অঘোরীবাবা স্থির হয়ে নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকতেন। ভৈরব বরণ ও পূজা শেষ হলে মহেশ্বরী মাতা অঘোরীবাবাকে ‘পিতা’ বলে সম্বোধন করে কোন গুহ্য বাক্য বলতেন। তারপর তিনি নিজে উঠে দাঁড়াতেন অঘোরীর সামনে। এবার অঘোরী পাত্র থেকে উপকরণ নিয়ে ভৈরবীর চরণ পূজা করতেন। তারপর একটি পাত্র থেকে চন্দন নিয়ে মহেশ্বরীর সারা গায়ে লেপে দিতেন। এরপর স্থির হয়ে নিজের আসনে অনেকক্ষণ ধ্যান করতেন। চক্রের চতুর্দিক পরিবেষ্টন করে অন্যান্য ভৈরব-ভৈরবী পাথরের মূর্তির মত বসে থাকতেন। কিছুকাল পূজা আদি হবার পর অঘোরীবাবা কলসী থেকে কারণবারি নিয়ে নিজে পান করতেন এবং

ভৈরবী মহেশ্বরী মাতার মুখের কাছে সেই পানপাত্র তুলে ধরতেন। এই প্রক্রিয়া শেষ হলে মহেশ্বরী মাতা অঘোরীবাবার কোলে বসতেন। এবার অনান্য উলঙ্গ ভৈরব ভৈরবী অনুরূপ ভাবে একে অপরের পূজা করতেন। তারপর ভৈরবরা উলঙ্গ ভৈরবীদের কোলে নিয়ে বসতেন। এরপর আসত আরও নানা পাত্র এবং মৎস্য মাংস ইত্যাদি। প্রত্যেক ভৈরব ভৈরবীর মুখে প্রথম আহুণর তুলে দিতেন। তারপর ভৈরবী দিতেন ভৈরবদের মুখে। একটা অদ্ভুত অতিলৌকিক আনন্দের দৃশ্য ফুটে উঠত।

তবে একটু বাড়াবাড়ি হলেই অন্যান্য ভৈরব ভৈরবীদের উল্লাস বিপথের দিকে এগিয়ে যেত। ঠিক তখনই অঘোরীবাবা ভৈরবীর দেহ থেকে নিজের হাতটি সরিয়ে প্রথমে মাটিতে, তারপরে নিজের জানুতে রাখতেন। এর কি জাদুমন্ত্র ছিল কে জানে—অন্যান্য ভৈরব ভৈরবীরা তখনই শান্ত হয়ে যেতেন। যেন তাঁদের বাহ্যজ্ঞান নেই এমন মনে হত। যেন অঘোরীর একটা নিঃশব্দ ইচ্ছায় চক্রের মধ্যে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুনের অভিনয় হয়ে যেত। বিশেষ করে নানা ধরনের মুদ্রা হত।

এর যে অর্থ কি, নানাধরনের মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা কি, সাধারণ লোকের পক্ষে তা বোঝা দুষ্কর। তবে তন্ত্রবিষয়ে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা বলেন, সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন যেমন পুর্ণ যৌবনের স্বাভাবিক পরিণতি, চক্রের মধ্যে মুদ্রাপ্রকরণও তেমনই যৌনক্রিয়ার সহজাত পূর্ব সংস্কার। মদ্য মাংস মৎস্য ইত্যাদি পঞ্চ-মকার সাধনের পূর্ণ পরিণত অবস্থাই মুদ্রা সাধনের অবস্থা। স্ত্রীপুরুষের সান্নিধ্যের জন্য উভয়েরই শরীর মন যখন উৎফুল্ল হয়ে উঠে তখনই মুদ্রার ব্যবস্থা। মুদ্রার মধ্যে আছে অশেষ সংযমের মধ্য দিয়ে মৈথুনের সঙ্কেত। মদ্য মাংসের প্রভাবে ফুর্তি হলেই যে মৈথুনের ইচ্ছায় কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে তা নয়। মুদ্রা করে সংযম এনে তবেই মৈথুন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার নির্দেশ।'

যথার্থ তান্ত্রিকেরা যখন এই চক্র সাধনা করেন তখন কিন্তু পঞ্চ-মকারের চর্চা করলেও তা অশ্লীল বোধ হয় না। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন,

ভৈরব ভৈরবীদের তখন উজ্জ্বল শরীরবিশিষ্ট দেবদেবী বলে বোধ হয়। চক্রমধ্যে যে ভৈরব ভৈরবী প্রধান স্থান লাভ করেন তাঁদের মনে হয় হরগৌরীর মত।

তন্ত্রাভিলাষী অথচ যাঁরা ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পঞ্চ-মকারের সাধনাকে বিচার বিশ্লেষণ করতে চান তাঁরা মনে করেন যে, সমাজের অত্যন্ত অধঃপতনের দিনে মদ্যমাংস প্রিয় মানুষকে সহজ ধর্মমার্গে আকৃষ্ট করার জন্যই এই মদ্য মাংসের রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। এর সঙ্গে এই কারণেই স্ত্রী সম্ভোগের ব্যবস্থা হয়েছিল। পঞ্চ-মকারের সাধনায় কারো মতে ব্রাহ্মণ প্রভাবিত বৈদিক সমাজ ও ধর্মব্যবস্থা চ্যালেঞ্জ জানাবার জন্যই দৃষ্টিকটু অনেক কিছু তন্ত্রে জোর করে আমদানী করা হয়েছিল—উনবিংশ শতাব্দীতে ইয়ং বেঙ্গল যেমন গরুর মাংস খেয়ে রক্ষণহীণ হিন্দু সমাজকে দেখাতে চেয়েছিল যে, এতে জাত যায়না। তন্ত্রের পঞ্চ মকারও সেই ভাবে দেখাতে চেয়েছিল যে—নারী সঙ্গ, মদ্য পান, মাংস ভক্ষণ ইত্যাদি করলে জাত যাবার বা ধর্ম জীবন নষ্ট হবার কিছু নেই।

তন্ত্র যে নরনারী সমান এ-কথা প্রমাণ করার জন্যই ধর্মচর্চায় স্ত্রী-সঙ্গের ব্যবস্থা করেছিল তা নয়। তন্ত্র বিশ্বাস করত যে, নারীর কর্তৃত্ব দৈবানুকুল। তন্ত্র এখনও মনে করে যে, নারী হল শক্তির প্রতীক। নারী ছাড়া লোক এবং সমাজের প্রগতি অচল। নারীই হল মানুষের জীবনে অগ্রগতির প্রথম ধাপ। তন্ত্রমতে উভয়ের যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে যে-কোন নারী-পুরুষের মিলনে বাধা নেই, বিবাহে বাধা নেই। জাতি বিজাতি, গোত্র, গাঁই-মেল, কুলিন, বংশজ, দান, পণ, মনুষ্যসৃষ্ট কোন কৃত্রিমতাই তন্ত্র মানে না। তন্ত্র মনে করে, সদাশিবই একমাত্র পুরুষ। আদ্যাশক্তি ভগবতী পার্বতী বা কালীই তাঁর একমাত্র শক্তি বা আধার। সৃষ্টির মূলে সমষ্টিরূপে 'পূর্ণ' একাই এই দুই দেবতা—উপাস্য, গুরু, সব। উপাসক জীব শিব ও শক্তির ব্যষ্টিরূপ। প্রথম অবস্থায় জীব যখন বিষয়মুখী তখন পশু। শিব সেই জন্যই পশুপতি।

উপাসনার আসল কথা পাশযুক্ত অবস্থায় জীব কর্তৃক আত্মার মধ্যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় শিবরূপ সত্তার উপলব্ধি। শরীরের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে জগৎসৃষ্টি বর্তমান। সেই জন্যই জীব সৃষ্টিবৃদ্ধি ও সৃষ্টি রক্ষার সহায়তা করতে পারে।

অঘোরী বাবা বলতেন,—জীবরূপী সামাজিক পুরুষের সঙ্গে যে-নারীর প্রণয় হবে তিনি তাঁর স্ত্রী, সহধর্মিণী, উত্তরসাধিকা, ভৈরবী, সব কিছু। পরস্পর আকৃষ্ট হয়ে উভয়কে উভয়ের গ্রহণ করবার তাৎপর্য এই যে, এতে উভয়েরই গতি এক হয়ে যায়। পুরুষ শক্তিমান হয়। নারী শক্তিস্বরূপা হয়। জীবনের লক্ষ্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া, চরম গতিমার্গের উপযুক্ত হওয়া, কর্মজগতে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া ইত্যাদি। নর-নারীর মিলনে সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার যে ইচ্ছা আছে তা পূরণ হয়। সেই জন্যই বিবাহের পর এখনও হিন্দু সমাজে গার্হস্থ্য জীবনে তান্ত্রিক দীক্ষার রীতি প্রচলিত আছে। দৈনন্দিন জীবনের সব নিয়েই তন্ত্রমতের ধর্মজীবন। ধর্ম বা অধ্যাত্ম ধর্ম পার্থিব জীবনকে অস্বীকার ক'রে পৃথক কিছু নয়। ধর্ম জীবনময়, তন্ত্রমতের এই হল প্রকৃষ্ট সত্য কথা। এই জন্যই কুমার কুমারী অবস্থায় মানুষ অপূর্ণ। সমাজে তাদের পূর্ণ কর্মাধিকার নেই। বিবাহ হলে তবে মানুষের পূর্ণতা।

ব্রাহ্মণ সমাজ তন্ত্রের এই সত্য অস্বীকার করতে পারেনি বলে বিবাহিত জীবনে তন্ত্রদীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। এবং এ জন্যই অবিবাহিত কুমার জীবনে বৈদিক দীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তন্ত্রমতে দৈনন্দিন জীবনে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সব কাজ কর্মই উপাসনাভুক্ত।

নরনারীর জীবন নিয়ে, বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে অঘোরী বাবার অভিমত ছিল একালের ইউরোপের মতই। তিনি বলতেন, নরনারীর মধ্যে যতদিন প্রীতি ততদিন সম্পর্ক, বিবাহের সার্থকতা। পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের অভাব হলেই বৈবাহিক সম্পর্ক শেষ। তখন উভয়েরই উচিত মনের মত পাত্র বা পাত্রী খুঁজে নেওয়া। এই কারণেই ভৈরব বা

ভৈরবী সাধন-জীবনে একাধিক সঙ্গী নিয়েও সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছেন এমন উদাহরণ প্রচুর।

অঘোরী বাবা বলতেন, ব্রাহ্মণেরা তন্ত্রের প্রভাব অস্বীকার করতে পারেনি বলেই তাকে গ্রহণ করেছিল। তবে সবটা গ্রহণ করেনি। ব্রাহ্মণের প্রাধান্য বজায় রেখে যতটুকু গ্রহণ করা যায় ততটুকুই গ্রহণ করেছে। এই জন্যই বর্তমানে যে তন্ত্র দেখা যায়, সে তন্ত্র তন্ত্রের যথার্থ রূপ নয়। বৌদ্ধযুগের পর তন্ত্রের নির্ভেজাল রূপ আর নেই। বৌদ্ধেরা তন্ত্রের নির্ভেজাল রূপ গ্রহণ করেছিল এই কারণে যে, তারাও ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিরোধী। বৈদিক আতিশয্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থেকেই বৌদ্ধধর্ম। সেইজন্য বৌদ্ধধর্ম তন্ত্রকে যতটা আত্মসাৎ করেছে অপর কেউ তত পারেনি।

অঘোরী বাবা বলতেন, ব্রাহ্মণেরা তন্ত্রের সুন্দর স্বাভাবিক রীতির পরিবর্তন করে সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি কর্ম-বিভাগ করেছেন। শিবের মুখ দিয়ে ব্রাহ্মণদের গুণকীর্তন করিয়েছেন। এ হল অত্যন্ত রকমের মিথ্যাভাষণ। ব্রাহ্মণেরা তন্ত্রকে গ্রহণ করে তন্ত্রেরও সর্বনাশ করেছে, নিজেদের ধর্মেরও বারোটা বাজিয়েছে। এই জন্যই বর্তমান সমাজের শক্তি নেই, ভিত্তিও নেই।

অঘোরী বাবার মতে, তন্ত্রের ভাব, ভাষা বা উদ্দেশ্য বুঝতে হলে পূর্ণপ্রাণে পক্ষপাতশূন্য অনুসন্ধিৎসা থাকা দরকার। ঘৃণা, সঙ্কোচ, উপেক্ষা, বিদ্বেষ, সব ত্যাগ করে উদারচিত্তে যদি তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করা না যায় তবে এর মর্মোদ্ধার হয় না। তিনি আরও মনে করতেন যে, তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে ছাপানো পুঁথি পুস্তকে আসলে সত্য স্থান পায়নি। মানুষের মনে প্রকৃতি থেকে যে-সব কর্মের উদ্ভব সে-সব কর্ম অবলম্বন করেই তন্ত্রের সাধনা শুরু। শেষে প্রকৃতির নিয়মেই নিবৃত্তিমূলক সাধনা ও সিদ্ধি। এই নিবৃত্তি কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে নয়, সহজ জীবনের মধ্য দিয়ে।

অধিকাংশ মানুষই সংস্কারে আবদ্ধ। সংসারে আবদ্ধ হলে বুদ্ধির

তীব্রতা থাকে না। বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায় বলেই তন্ত্রের প্রত্যেকটি ক্রিয়া যে বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত তা বুঝতে পারে না। তা ছাড়া তান্ত্রর ব্যাপার গুহ্য বলেই স্পষ্ট করে কিছু লেখা হয়নি; আছে শুধুমাত্র সঙ্কেত। তথাকথিত বিদ্যা দিয়ে সে সঙ্কেত ধরা যায় না। সেই জন্যই কোনারকের মূর্তির ব্যাখ্যা সাধারণ বুদ্ধিতে আসে না। অশ্লীল বলে বোধ হয়। মহেন-জো-দড়োর লিপিও উদ্ধার হয় না। এ-সবই হোল তন্ত্রের সঙ্কেত লিপি; এ-সব বুঝতে হলে গুরু বা আচার্য কৌল চাই। অনুগত শিষ্যও চাই; দীক্ষা না হলে তন্ত্রের গুহ্যতত্ত্ব বোঝা সম্ভব নয়। আজকালকার অধিকাংশ তান্ত্রিকই হল মদের বোতলের জন্য তান্ত্রিক।

অঘোরী বাবা খুব জোর দিয়ে বলতেন—'তন্ত্রের জগতে বা অধিকারের মধ্যে ঘৃণার বস্তু কিছু নেই; অস্পৃশ্যও কেউ নেই। পুরুষ, নারী ছাড়া আর কোন জাত নেই। তবে এ-জাতিভেদও বাইরের। ভেতরে তাকালে সব সমান;

অঘোরী বাবার যে ইতিহাসের সূত্র কোথায়, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানত না। কিন্তু মাঝে মাঝেই ইতিহাস নিয়ে কথা বলতেন, ঐতিহাসিকের মত কথা বলতেন। তিনি বলতেন যে, আর্যরা বাংলাদেশে আসার আগে এ দেশে তন্ত্রধর্মই ছিল একমাত্র ধর্ম। এইজন্যই বাংলাদেশ চিরকালই পশ্চিম দেশীয় বৈদিক ব্রাহ্মণদের কাছে হেয় ও ঘৃণ্য হয়ে ছিল। সেইজন্যই এই বাংলায় এসে ব্রাহ্মণেরাও স্থায়ীভাবে বসবাস ক'রে পশ্চিমদেশীয় জ্ঞাতি-ভাইদের কাছে একঘরে হয়েছিল। তন্ত্রের ধর্ম গ্রহণ করে শেষপর্যন্ত তারা অনার্যই হয়ে যায়। বাইরের সকল কাজে আর দশবিধ সংস্কারের মধ্যে থাকে বৈদিক ব্রাহ্মণত্ব, আবার বিয়ের পর তান্ত্রিক কুলগুরুর কান-ফুঁকের মধ্যে থাকে তান্ত্রিকত্ব। ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকে আবার তন্ত্রধর্ম গ্রহণ করে তান্ত্রিক হয়ে যায়। তন্ত্রের মধ্যে ব্যাভিচার এনেছেন এই ব্রাহ্মণেরাই।

ব্রাহ্মণেরা কি ভাবে তন্ত্রধর্মে ব্যাভিচার এনেছেন এ-কথা জিজ্ঞাসা

করা হলে অঘোরী বাবা বলতেন যে, তন্ত্রের মধ্যে বৈদিক আচার এবং সংস্কার চাপিয়ে ব্রাহ্মণেরা এর সর্বনাশ করেছেন। তাঁর ধারণা, বৌদ্ধধর্মের পতনের পর ব্রাহ্মণেরা তন্ত্রধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় আগম নিগম তন্ত্রসার সবই ব্রাহ্মণদের রচনা। এ থেকে আসল তন্ত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব। এ-সবই হল তন্ত্রের নকল ছাঁচ, তন্ত্রধর্মবিরোধী।

যদি জিজ্ঞাসা করা হত যে, সংস্কৃতে লেখা তন্ত্রগ্রন্থ যদি নকল তাহলে আসল তন্ত্রগ্রন্থের ভাষা ছিল কি? তাহলে অঘোরী বাবা বলতেন যে, অনার্য-ভাষাই হল তন্ত্রের আসল ভাষা। এর কোন পুঁথি পুস্তক ছিল না। লোক পরম্পরায় মুখে মুখে তন্ত্রকথা প্রচলিত ছিল। তন্ত্রের মন্ত্র ছিল চলিত ভাষায়। আসলে মন্ত্র নয় তন্ত্রের মধ্যে ক্রিয়াই হল বড়। তন্ত্র হল ক্রিয়ামূলক। সাধারণ মানুষের ধর্ম হল এই তন্ত্র।

বর্তমান কাল আর তন্ত্রধর্মের কাল নয় বলে অঘোরী বাবার বিশ্বাস। ব্রাহ্মণেরা যাকে তন্ত্র বলেন তার বাইরেই রয়েছে তন্ত্রধর্ম। চীনে এবং তিব্বতের ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে তন্ত্রধর্ম মিশে ছিল। কেউ যদি সাধনা করে আবার তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে ভিন্ন কথা। নইলে তন্ত্র একটা কিংবদন্তী হয়েই থাকবে।

তিব্বত থেকেই তন্ত্রধর্মের প্রচার হয়েছিল বলে অঘোরীবাবার বিশ্বাস। এর প্রচারক হলেন শিব। শিব এবং তাঁর দলবল আর্যদের কাছে ব্রাত্য বলেই বিবেচিত ছিলেন। শিবাচারকে ব্রাহ্মণেরা মনে করতেন ভ্রষ্টাচার, কারণ শিবের থাকা খাওয়ার বাছবিচার নেই, বসন ভূষণের কোন বালাই নেই। উঁচু নীচু ভেদাভেদও নেই। অনার্যদের কাছে তিনিই ছিলেন ভগবান। আর্যকন্যা সতী শিবের গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করেছিলেন নিজের ইচ্ছায়। তাই দক্ষযজ্ঞ করে শিবকে অপমান করার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত শিবকে অপমান করা সম্ভব হয়নি। শিবের প্রাধান্য স্বীকার করে নিতে হল সকলকেই। শিবের পত্নী সতীর দেহের নানা অংশ স্মৃতি হিসেবে দেশের বিভিন্নপ্রান্তে

সংরক্ষিত করে তাঁকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিলেন সাধারণ মানুষ। দেশের একান্নটি বিভিন্ন অংশে সেই সব অংশ সংরক্ষিত হয়েছিল বলে সে-সব স্থান হল তন্ত্রের বিশেষ বিশেষ পীঠ। শাক্তদের মতে একান্নপীঠ।

অঘোরী বাবাকে যদি জিজ্ঞেস করা হত যে, শিবকে প্রধান হিসেবে মেনে নিয়ে আর্যরা তাঁর কাছ থেকে কি পেয়েছিলেন? তাহলে তিনি বলতেন যে, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ আর যোগ। আর্যধর্মে এই তিনই হল শিবের সবচেয়ে বড় দান। মৃতসঞ্জীবনীর আবিষ্কারকও শিব। তিনি রসায়ণ শাস্ত্রেরও প্রবর্তক। শিবের যোগপন্থার অপর নামই হল তন্ত্র। শিবের যৌগিক ক্রিয়ার অলৌকিক শক্তি লক্ষ্য করেই ব্রাহ্মণেরা তাঁকে দেবতা বলে গ্রহণ করেছিলেন। শিবকে অঘোরী বাবা সঙ্গীত শাস্ত্রেরও প্রবর্তক বলে মনে করতেন।

একজন তন্ত্রাভিলাষী একবার খুব লেগেছিলেন অঘোরী বাবার পেছনে তন্ত্র সম্পর্কে কিছু জানার জন্য। কিন্তু অঘোরী বাবা তাঁকে কোন অলৌকিক কিছু কখনও দেখাননি। একদিন শুধু তাকে সকলে যে 'আমি' 'আমি' করে সেই 'আমিটা' কি তাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ নিজের যোগ বলে তাকে অভিভূত করে জিজ্ঞাসা করলেন— কি দেখছিস? বক্রেশ্বরের মহাশ্মশানে তাঁর কিছুই নজরে পড়ল না। তন্ত্রাভিলাষী দেখলেন শুধু একটি পুরুষ মূর্তি দেখতে পাচ্ছেন তিনি। বললেন, একটি পুরুষ মূর্তি।

অঘোরীবাবা জিজ্ঞেস করলেন, মূর্তিটি ভেতরে দেখছিস না বাইরে? তন্ত্রাভিলাষী তখন ভেতর এবং বাহির বিচার করে দেখলেন। মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহংকার নিয়ে যে 'আমি'-বোধ সেই আমিই হল ভিতরে। এছাড়া আর সবই বাইরে। ভেতরের আমির মধ্যে দ্রষ্টা ও দৃশ্য এক। কিন্তু তিনি দেখলেন যে, তিনি যে পুরুষ মূর্তি দেখতে পাচ্ছেন তা হল যথার্থই বাইরে, অর্থাৎ স্বয়ং অঘোরী বাবাকে। সেইজন্য বললেন,— আমি পুরুষ মূর্তি দেখতে পাচ্ছি বাইরে।

অঘোরীবাবা বললেন, বাইরেরটা কিছু না, তুই ভেতরে ঢুকে যা।

অর্থাৎ যে ভেতরে দ্রষ্টা ও দৃশ্য এক, সেই ভেতরে তাকা।

তন্ত্রাভিলাষী নিজের ভিতর মনঃনিবেশ করলেন।

অঘোরীবাবা বললেন, তোর 'আমি'টা কোথায় দেখতে পাচ্ছিস ?

তন্ত্রাভিলাষী বললেন, ঠিক বুঝতে পারছি না।

অঘোরীবাবা বললেন, ঐ ভাবেই বসে থাক।

তন্ত্রাভিলাষী মনের ভিতর তাকিয়ে বসে রইলেন। ধীরে ধীরে তাঁর বোধ হল যে, পুরুষ মূর্তিটি বাইরে নয় তার ভেতরেই রয়েছে। মনে হল যা দেখা যাচ্ছে তা সেই ভেতরের মূর্তিটাই দেখছে। 'আমি' বোধটা ক্রমশঃ সেই মূর্তির মধ্যে মিশে গেল।

তন্ত্রাভিলাষীর মনে হল, তিনি আর স্বতন্ত্র কোন তন্ত্রাভিলাষী নন।

জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যেন সেই পুরুষ মূর্তির সঙ্গে এক হয়ে গেছে।

তিনি যা দেখছেন, যা শুনছেন, যা স্পর্শ করছেন—তা সবই রসময় এবং দিব্য গন্ধময়। ধীরে ধীরে প্রথমে গন্ধ গেল, তারপর রসবোধ গেল। শেষে রূপও গেল। কিন্তু এ-সত্ত্বেও অন্ধকার বোধ হল না। নিজের স্পর্শেন্দ্রিয় যেন বহুব্যাপ্ত হয়ে উঠল। মনে হল, সর্বত্রই 'আপন' স্পর্শেই তন্ত্রাভিলাষী ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। 'আমি' এই একটা শব্দও ধ্বনিত হতে লাগল। কিছুকাল পরে স্পর্শময় আমিত্ববোধটুকুও গেল। শেষে 'আমি' এই বোধ ছাড়া আর কিছুই থাকল না। সর্বব্যাপ্ত বিশাল এক 'আমি' বোধ ছাড়া আর যেন কোথাও কিছু নেই। তন্ত্রাভিলাষী জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

অনেকক্ষণ পরে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলে অঘোরীবাবা জিজ্ঞাস করলেন, কি রে শালা এতক্ষণ কি দেখলি ?

তন্ত্রাভিলাষী বললেন, শুধু আমি আছি এইটুকু বুঝলাম।

তিনি বললেন, দেহ, নাম, রূপ এসব মনে ছিল ?

—না। এ-সব কিছুই মনে ছিল না।

অঘোরীবাবা বললেন, তোর 'আমি'টুকুকে—এবার তাহলে বুঝে নে।

এই জগৎ প্রপঞ্চের সঙ্গে তোর আসল সম্পর্কটা কি বোঝ।

তন্ত্রাভিলাষী জিজ্ঞেস করলেন, দেহত্যাগের পর কি ঐ 'আমি' টুকুই অবশিষ্ট থাকে ?

অঘোরীবাবা বললেন, সকলেরই কি আর থাকে! যার সাধনা আছে, 'আমি' সত্তার তীব্র অনুভূতি আছে—তারই মাত্র এই বোধ থাকে। সকলের থাকে না। সংস্কার খণ্ডন না হলে সূক্ষ্ম দেহে পঞ্চভূতের দেহের বোধটুকুই থেকে যায়। অসলে ব্যাপার কি জানিস —বাইরের যে রূপটুপ দেখিস ওসব কিছুই নয়।

তন্ত্রাভিলাষীটি তৎক্ষণাৎ সংসার ত্যাগ করে তন্ত্র সাধনায় নিজেকে নিয়োগ করতে চাইলে তিনি তাতে রাজী হননি। বলেছিলেন, সংসারে এখনও অনেক কিছু দেনা-পাওনা আছে তোর। হিসেব নিকেশ না হলে যাবি কোথা ?

তন্ত্রাভিলাষী বললেন—কারো সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলেই তো চলে যায়!

অঘোরীবাবা বললেন, এখন বলছিস বটে, তবে তোর সাধ্য কি যে সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়ে বেরিয়ে আসবি! দেখবি এই বোধ কেটে গেলেই প্রকৃতির খপ্পরে পড়ে আরও কত নতুন সম্পর্ক পাতাবি। এ-বোধ আর কতক্ষণ থাকবে রে!

তন্ত্রাভিলাষী বললেন, তাহলে এর মধ্যে কি অপরের কোন ইচ্ছা কাজ করে ? আমাদের ইচ্ছামত আমরা চলতে পারি না ?

অঘোরীবাবা বললেন, আছে তো বটেই। আসলে কারো উদ্দেশ্য সফল করতেই আমাদের এই কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে।

—তিনি কে ? তার তো দেখা পাওয়া যায় না ?

—এটাই তো রহস্য। সাধককে এ-সব বুঝে নিয়েই এগুতে হবে।

সাধনা আছে দুরকম বুঝলি, যেমন, শিবই যে শক্তির মধ্য দিয়ে জগতের মূলে এই বোধের জন্য সাধনা! এতে পাঁচ জনের সঙ্গে মিলে-মিশে সুখে সংসার জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। আর একরকম সাধনা

হল মুক্তির সাধনা। এতে কর্ম বা সংসার থেকে নিজেকে আলাদা করে দেখতে হয়। কোটি মানুষের মধ্যে এই মুক্তির সাধনা হয় দু'একজনের।

তন্ত্রাভিলাষী বললেন, এখন তো দেখতে পাই ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ না রেখেও কত কি নিয়ে কর্মজগতে সাধনা হচ্ছে। তাতেই কল্যাণ হচ্ছে।

অঘোরীবাবা বললেন—যারা কথায় কথায় ভগবানের দোহাই দেয়, ভান করে যে ভগবানের সঙ্গে তাদের কত পরিচয়, মনে রাখবি তাদের মাথা খারাপ। তাদের সঙ্গ ত্যাগ করাই ভাল। এরাই হল ভণ্ড। বরং শক্তি ও জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে যারা সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে তাঁরা ভগবানের কথা মনে না করলেও শ্রেষ্ঠ মানুষ। অন্তরে যারা আনন্দ ভোগ করে তাঁরাই তাঁর প্রিয় সন্তান। শক্তিমান যাঁরা তাঁরাই ভগবানের স্পর্শ পেয়ে আছেন। আর শক্তিহীনেরা ভগবান ভগবান করলেও ঈশ্বরের সঙ্গে তার যোগ নেই। আসলে যারা দুর্বল, যাদের শক্তির অভাব, তারাই শক্তি লাভ করার জন্য ভগবানের স্মরণাপন্ন হয়। আমাদের দেশে একটা বিশ্বাস আছে যে, ভগবানকে ডাকলেই শক্তি পাওয়া যায়, দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এ হল স্বার্থের জন্য ডাকা, অধর্ম। এতে লাভও হয়না, ধর্মও হয় না। এরকম করলে এর ফল কি হবে জানিস?

---বলুন।

---এ-দেশ থেকে ভগবানের নামই উঠে যাবে।

অঘোরীবাবার এই ধরনের অভিমতের জন্য তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর লোকেরা তাঁকে পছন্দ করতেন না। বলতেন, ব্যাটার জাতকুলের বিচার নেই, থাকবার জায়গা নেই, শাস্ত্রজ্ঞান নেই, অকাট মুখ্যু। মান অপমান জ্ঞান পর্যন্ত নেই। ব্যাটা হাড়ি, মুচি, মুদ্দফরাসেরও অধম।

বস্তুতঃ অঘোরীবাবা শ্মশানে মশানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে, নিচু জাতের সঙ্গে থাকতেই ভালবাসতেন। তাদের দেওয়া অখাদ্য কুখাদ্য খেতেন। বিশেষ করে তাদের দেওয়া পচাই আর তাড়ি ছিল খুব প্রিয়।

যদি কেউ বলতেন, এদের সঙ্গে আপনার এত ভাব কেন?

অঘোরীবাবা বলতেন, কেন জানিস, উঁচু বংশের লোকের মত কোন স্বার্থ বা মতলব নিয়ে এরা আমার কাছে আসে না। আমাকে একটু মদ খাইয়ে খুশি করতে আসে।

—আপনাকে মদ খাইয়ে এদের কি কল্যাণ হয়, লাভ হয়?

অঘোরীবাবা বলতেন, কার জীবনের কি উদ্দেশ্য স্বার্থপর লোকেরা তার কি বুঝবে। তারা তো মতলবের গণ্ডীর মধ্যে বাধা। ভালমন্দের তারা বুঝবে কি?

—কিন্তু আপনাকে মদ খাইয়ে ওদেরই বা কি উন্নতি হচ্ছে?

অঘোরীবাবা হেসে বলতেন, তোরা শুধু উন্নতি উন্নতি করছিস, উন্নতি কি সকলেরই একভাবে হয়? অনেকেই আছে যারা এ পৃথিবীতে এসেছে কর্মক্ষয় করতে। আত্মার ক্ষুধা যার যে-রকম সেই ভাবেই তার কর্ম ও ভোগ চলবে এখানে। এমন কতকগুলি জীব এ সংসারে আছে, যারা তাদের কর্ম মোটেই বাড়াতে আসেনি। বরং কমাতেই এসেছে। এই সব অজ্ঞ, অশিক্ষিত লোকেরা হল সেই পর্যায়ের। নকল শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের চোখে তাদের খারাপ ঠেকলেও ওদের হিসেবে ওরা ঠিকই আছেন। জীবন শেষ হয়ে গেলে ওদের আত্মা তার নির্দিষ্ট গতি পেয়ে যাবে।

সকল জীবই একটা নির্দিষ্ট ধারা বেয়ে চলে। জ্ঞানী যে-রকম মুর্খও সেরকম। সকলেরই একটা আলাদা পথ আছে যার মধ্য দিয়ে সে খেলা করছে, নিজেকে প্রকাশ করছে। জগদম্বা আদ্যাপ্রকৃতিই এমন করে জীব সৃষ্টি ক'রে জগতে ছেড়ে দিচ্ছেন। যে যে যার ভিন্ন পথে চলছে বলেই ঠোকাঠুকি হচ্ছে না। কারো সঙ্গে কারো যখন মিলন হয় উভয়ের কর্মের একত্ব থেকেই তা হয়। তবে উভয়েরই কিছুটা বিস্মৃত জীবনের ব্যাপার থাকে, সেটা অজ্ঞাত।

'মদ খান কেন' একথা জিজ্ঞেস করলে অঘোরীবাবা ভয়ানক ক্ষেপে যেতেন। বলতেন, 'তোর কিরে শালা তাতে? মদ খেয়ে কারো কোন

অনিষ্ট করেছি? আমার যত খুশি খাব। কুকুর তুই শালা, কুকুরের জাত। ছুঁচো কোথাকার, তুই আমার বিচার কর্তা! বেরো শালা আমার কাছ থেকে।

পাপী তাপী একথা বললে তাকে তিনি কাছে থাকতে দিতেন না। কিন্তু যদি বুঝতেন ভক্তিভরে, শ্রদ্ধাভরে তাঁর কাছে কেউ এসেছে, তাহলে তিনি অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার প্রশান্ত হয়ে যেতেন। তার পরেই কোন ছোটলোক ভক্ত যদি তাড়ি বা পচাই নিয়ে আসতো সঙ্গে সঙ্গে ঢক্ ঢক্ করে গলায় ঢেলে দিয়ে বলতেন, মদ খেলে কি হয় বল দিকিন? তারপর মদের ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করতেন: অপরিমিত খেয়ে কেউ যদি বেহুশ হয়, সেকি মদের দোষ! শরীরে ফূর্তি মনে আনন্দ যাতে হয় সেকি খারাপ জিনিষ! সংসারে মানুষ আসে কেন? কাজ করতে আসে, ভোগ করতে আসে। যারা মদ খেয়ে আনন্দ পায়, কর্মশক্তি পায় তারা কেন মদ খাবেনা। পাপ কিসে হয়? নিজের সুখ সুবিধার জন্য যারা অপরের অনিষ্ট করে, যার মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, ঈর্ষার বিষ রয়েছে, সে মদ খেলেও অপরের ক্ষতি করবে, না খেলেও করবে। মদের উপর ঘৃণা করে হবে কি? কোন্টা কার পক্ষে ভাল, কোন্টা মন্দ, তোরা জানিস? যার যা প্রকৃতি মদের প্রভাব কি তার উপরে যেতে পারে?

শিক্ষিত ব্যক্তি যদি এবিষয়ে প্রশ্ন করতেন তবে তাঁকে বলতেন 'শিক্ষিত সভ্য সমাজে নিত্য নিত্য যেসব পাপকর্ম হচ্ছে, সে-সব কি মদ খেয়ে হচ্ছে? পাপের কাজতো লেখাপড়া জানা লোকেরাই বেশী করে। মুর্খ অশিক্ষিতরা করেনা। তোদের শিক্ষিত ধনবানেরাই গরীব লোকদের ঠকায়, খাদ্যে ভেজাল মেশায়, চুরি জোচ্চুরি করে, মুর্খ গরীবরা করে না। কেউ যদি বা করে, পেটের দায়ে করে। শিক্ষিত বড়লোকেরা করে স্বভাবে। মদ খায়না এমন লোক ব্যাভিচার করে না? নিজের স্ত্রী ছাড়া পরের স্ত্রীর কাছে যায় না? কুমারী বিধবার সর্বনাশ করেনা! মদখেলেই খারাপ মানুষ হবে একথা তোকে কে

বললে? সাধু অসাধু ঠিক করার মাপকাঠি কি মদ? আসলে মানুষের স্বভাবটাই হল বড় কথা। মদের দোষ দিয়ে কি হবে?

মদের কথা বললে আরও বেশী করে মদ খেতেন অঘোরীবাবা। তখন তাঁর বিশালায়তন চোখদুটি জবা ফুলের মত লাল হয়ে যেত। মধ্যেখানে স্বচ্ছ নীলাভ দুটি নক্ষত্রের মত চোখের মণি থেকে যেন একটা জ্যোতি বেরুত। তাঁর দুই চোখের মধ্যে এক অমানুষিক তেজ উৎপন্ন হত। এত তীব্র জ্যোতি ঠিকরে বেরুত যে, সে দিকে কেউ তাকাতে পারত না। কোন বীভৎস কিছু নয়। অদ্ভুত স্থির চোখ। সেখান থেকে অসীম শক্তি বিচ্ছুরিত হত। সে চোখের দিকে তাকালে সাধারণ মানুষ আত্মবিস্মৃত হত। তবে একমাত্র সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছাড়া সেই পুণ্যচোখ দুটি দেখার সুযোগ সকলের হত না।

অঘোরীবাবা মদবিদ্বেষীদের গল্প বলে বলে শিক্ষা দিতেন। বলতেন, একটা তেজী ঘোড়াকে বাগ মানানো গেলে তাকে দিয়ে কত কাজ করানো যায়, বল? যদি কেউ বাগ না মানাতে শিখে পিঠে চাপে, তবে ঘোড়া তাকে ফেলে দেবে। প্রাণ নিয়ে টানাটানি হতে পারে। ঘোড়া দেখলে ব্যবহার করা দূরে থাক সে তখন শত যোজন দূরে পালাবে। চড়তে না জেনে ঘোড়ায় চাপলে ঘোড়া ফেলে দেবে বলে ঘোড়ায় চাপা হবেনা? মদের পরিমিত ব্যবহার করে যে শক্তি পায়, সে মদ খাবে না? দুর্বলেরা মাতলামি করে বলে সে মদ ছেড়ে দেবে! দুর্ভিক্ষ, মড়ক মহামারীর দেশে মদ মহাশক্তি। ওষুধের কাজ করে। আফিং গাজা চড়স খেয়ে জড়ভরত হয়ে থাকতে পারবি, মদ খেলেই যত দোষ। যতো সব! যার স্বভাব ভাল মদ খেলে তার মন অপকর্মের দিকে যায়না বরং ভাল কাজের শক্তি সঞ্চয় করে। মানুষকে সরল ও অকপট করাই মদের ধর্ম। মদ খেলে মানুষের আসল রূপ ধরা পড়ে। খারাপ মানুষের খারাপটাও প্রকাশ পায়, ভাল মানুষের ভালটাও অপ্রকাশিত থাকেনা। এই জন্যই তন্ত্রের মধ্যে মদের হল প্রধান স্থান। সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জিনিষ নিয়ে সাধারণ মানুষই এতে বেশি

আকৃষ্ট হয়। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কেউ যদি মদ খায়, শরীরের যন্ত্র তার বিগড়ে যাবে। সব জিনিষই অতিরিক্ত করলে যা হয়, তাই হবে। সময়কালে পরিমিত যৌন চর্চা চাই, তাহলে দেহের শান্তি, মনেরও শান্তি। তন্ত্রে মদের ব্যবহার এই কারণে যে, এতে নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার হয়। শরীর সুস্থ সবল ও পরিশ্রমী হয়ে উঠে। সাহস জন্মে। সাহস, শক্তি ও স্বাস্থ্য না থাকলে তন্ত্র সাধনা অসম্ভব। অবশ্য তাই বলে অতিরিক্ত মদ খেয়ে বেহুশ হবার নিয়ম নেই। অধিকারীভেদে মদ্য পানের পরিমানভেদ আছে। কেউ যদি নিজের অধিকারের সীমা কতটুকু না বুঝে বেশী মদ খায়, সেকি মদের দোষ?

অঘোরীবাবার কথাশুনে ধারণা হতে পারে যে, মদ হল তন্ত্র সাধনের অপরিহার্য সঙ্গ। কিন্তু তা নয়। তিনিই আবার বলতেন, যার শরীর সুস্থ এবং সবল, পশ্বাচার আর বীরাচারের পর তাঁর আর মদের প্রয়োজন থাকেনা। পশ্বাচার আর বীরাচারের পর তখন দিব্যাচার। দিব্যাচারের পর্যায়ে এলে সাধকের অনেক পরিবর্তন এসে যায়।

যদি কেউ জিজ্ঞেস করতেন, শরীর সুস্থ ও সবল থাকলে বীরাচারের সময়ই বা কেন মদের প্রয়োজন?

অঘোরী বাবা এর জবাবে বলতেন, বীরাচারে মদের প্রয়োজন এই কারণে যে, এতে সাহসের প্রয়োজন। মদে সাহস আসে। কতটা সাহসের দরকার বোঝ! শবের পিঠে চক্র এঁকে সাধনা করছিস, চতুর্দিকে ভূতপ্রেতের আরম্ভ হল নৃত্যতাণ্ডব। নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রিতে কাছে কেউ নেই। সাহস না থাকলে কেউ শবের পিঠে বসে থাকতে পারবে? ছোটখাটো ঝড় বাদল এড়িয়ে যেতে পারবে মদ না খেলে?

অঘোরী বাবার কথাগুলো সবই প্রায় শাস্ত্রবিরুদ্ধ! সবই যেন প্রায় ধর্মাচারের বিপরীত আচার। এ কেমন সাধনার কথা আমাদের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে যা স্পষ্ট নয়! এমন নির্বিচারে মদ্য খাওয়া, নিজের মল নিজে ভক্ষণ করা, মদের গুণগান করা, যৌন সম্পর্ককে ঘৃণা না করা, প্রচলিত ধর্মসাধকদের কাছে অবিশ্বাস্য। সেই

জন্য বক্রেশ্বরের অঘোরী বাবা সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষেরই ধারণা ছিল ভুল। তারা মনে করত, সে কোন পলাতক ডাকাত, পিশাচসিদ্ধ। অপদেবতা ভর করেছে তাঁর উপর। সাধক বলতে যা বোঝায়, তা নয়। কিন্তু যাঁরা তার সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁকে ভালভাবে জানতে পেরেছেন, তাঁরা তাঁর বীভৎসতার অন্তরালে নরম করুণাঘন মূর্তি দেখতে পেয়েছেন। তাঁর সঙ্গ পাবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরাই দেখেছেন যে তাঁর চোখের মধ্য দিয়ে অনন্ত অতীন্দ্রিয় লোকের আলো এসে বাইরে পড়ে। তিনি যে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এবিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ থাকেনি। তবে তাঁর বিশেষত্ব এই যে, অলৌকিক ক্ষমতা প্রকাশ করে তিনি আর পাঁচজন সাধুর মত চমক সৃষ্টি করেন নি। যে কথাগুলো বলতেন, তা প্রচলিত বিশ্বাসে আঘাত করলেও রীতিমত চিন্তা করবার ব্যাপার। তন্ত্র সাধনায় যাঁরা প্রকৃতির স্বরূপ ভাল করে জানেন, তাঁরাই শুধু তাঁর কথার যাথার্থ অনুধাবন করতে পারতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের মত তাঁর অলিখিত কথামৃতই তাঁর অখ্যাত সাধনার সার্থকতার প্রমাণ। শ্রীম-এর মত তাঁর কোন কথামৃত সংকলন থাকলে অঘোরী বাবা বর্তমান সমাজে বিস্ময় ছড়াতে পারতেন।

জ্বালামুখীর ভৈরবী

একান্নপীঠের একটি বিখ্যাত পীঠ হল জ্বালামুখী। তন্ত্রেরও বিখ্যাত পীঠ। সতীর জিহ্বা এখানে পড়েছিল বলে বিশ্বাস। পীঠনির্ণয়ে লেখা আছে :

'জ্বালামুখ্যাং তথা জিহ্বা দেব উন্মত্ত ভৈরব।
অম্বিকা সিদ্ধিতা নাম্নী···॥'

অর্থাৎ জ্বালামুখীতে পড়েছে সতীর জিহ্বা। দেবীর নাম সিদ্ধিদা। ভৈরবের নাম উন্মত্ত। এই জ্বালামুখী হল পাঞ্জাবে। পাঠানকোট থেকে কাঙড়া উপত্যকার দিকে ছোট লাইনের গাড়ীতে যেতে হত। নামতে হয় জ্বালামুখী রোডে। সেখান থেকে প্রায় তের মাইল দূরে জ্বালামুখী। যাতায়াতের বাস আছে। তবে প্রচণ্ড ভিড় হয়। রাস্তাও উঁচু নীচু। জ্বালামুখীতে ধর্মশালা আছে। পোষ্ট অফিস ও টেলিগ্রাফের অফিসও আছে। দুটো হোটেল ও আছে। তবে একান্নপীঠের এক পীঠ ও বড় তন্ত্রপীঠ বলে পাণ্ডার খুব উৎপাৎ।

পাণ্ডাদের মুখে ভিন্ন রকম বর্ণনা শোনা যায় জ্বালামুখীর দেবী ও ভৈরব সম্পর্কে। কেউ বলেন অম্বিকা। ভৈরবের নাম উন্মত্ত। কেউ বলেন দেবীর নাম অম্বিকা ভৈরবের নাম বটুকেশ্বর। পীঠনির্ণয়ের মতে দেবীর নাম সিদ্ধিদা।

এরকম বর্ণনাপার্থক্য নানা পীঠেই আছে, সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। পাণ্ডাদের মুখে ধর্ম ব্যাখ্যা ও ইতিহাস বর্ণনাকে বিশ্বাস করা যায় না। ইউরোপীয় পটিকদের কাছে কালীঘাটের এক পাণ্ডাকে ভাঙা ইংরাজীতে ৺মায়ের স্বরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি। ৺কালী সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই। সাহেবরা যা বুঝতে এসেছিলেন, তা না বুঝেই চলে গেলেন। পাণ্ডরা যা ধর্মস্থানের এবং ধর্ম মাহাত্ম্যের বর্ণনা করে তা থেকে

ধর্ম কতদূর বোঝা যায় কে জানে। বোঝা যায় না বলেই বিশ্বাস। সুতরাং ওদের কথা থাক।

জ্বালামুখীর মন্দিরের কাছে একটা কুণ্ড আছে। স্নান করে সেখানেই সকলে পূজো দেয়। তবে কাউকে কুণ্ডের জলে নামতে দেওয়া হয় না, কারণ, ঐ কুণ্ডের জলেই পূজো হয়। কুণ্ডের ধারে পূজো সেরে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে হয়। মন্দিরের উপরে দুটি তপ্ত কুণ্ড আছে। একটির নাম—ব্রহ্মকুণ্ড ও আর একটির নাম গোমুখী। এখানেও জলস্পর্শ করতে হয়। পূর্ব দিকে প্রবেশ দ্বার। প্রবেশ দ্বারের দুই দিকে দুটি বাঘের মূর্তি। সামনে একটা ছোট আঙিনা আর নাট মন্দির। ৺মায়ের মন্দির খুব বড় নয়।

ভৈরবের মন্দির হল পাহাড়ের উপর জঙ্গলের মধ্যে। ৺মায়ের মন্দিরে কোন মূর্তি নেই। পাথরের ফাটল দিয়ে অগ্নিশিখা বের হয়। অগ্নিশিখার মধ্যেই জ্যোতিরূপে মায়ের মূর্তি রয়েছে। শিখা সাতটি। তবে একটি শিখারই পূজা হয়। কয়েক বছর ভূমিকম্পে বন্ধ ছিল। এখন আবার জ্বলছে। তবে অগ্নিশিখায় আগের মত তেজ নেই। মন্দিরের মধ্যখানে হোমকুণ্ডের দু-একটা শিখা আছে। এই শিখাতেই যাত্রীরা হোম করে, আহুতি দেয়। তারপরে মূল শিখার পূজো করে। হোমকুণ্ডের ধারেই একটি পাথরের বুকে ৺মায়ের দুটি পদচিহ্ন আছে।

তন্ত্রপীঠ হিসাবে এক সময় জ্বালামুখীর প্রচণ্ড খ্যাতি ছিল। এখনও আছে। চতুর্দশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে মুসলমান লেখক সামস-ই-সিরাজ আফিফ-এর লেখা থেকে জানা যায় জ্বালামুখীর খ্যাতির কথা। এই খ্যাতিতে হিন্দু মুসলমান সবাই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আফিফের বর্ণনা মতে কাফেররা অর্থাৎ হিন্দুরা এখানে প্রচুর ভিড় করত। হিন্দু-বিদ্বেষী সুলতান স্বয়ং ফিরুজ তুঘলকও নাকি জ্বালামুখীর দেবীকে দেখতে গিয়েছিলেন। দেবীর মাথায় স্বহস্তে তিনি স্বর্ণছত্র ধরেছিলেন। আবুল ফজলের আইন-ই আকবরীতেও জ্বালামুখীর বর্ণনা আছে। এ-প্রসঙ্গে তিনি তৎকালে প্রচলিত একটি গল্পও বলেছেন। গল্পটা এই

রকম ঃ—মহাদেবের পত্নী মহামায়া। একবার অপমানে আহত হয়ে তিনি নিজেকে নিজেই টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটেছিলেন। তাঁর সেই কর্তিত দেহের অংশ দেশের চারটি স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেমন মাথা এবং কিছু অংশ পড়েছিল কাশ্মীরে, কামরাজের কাছে। দেবীর নাম এখানে শারদা। কিছু অংশ পড়েছিল দক্ষিণ ভারতে বিজাপুরের কাছে। দেবীর নাম তুলজা বা তুরঙ্গা ভবানী। কিছু অংশ পড়েছিল পূর্ব ভারতে, কামরূপের কাছে। দেবীর নাম কামাখ্যা। বাকী অংশ পড়েছি কাঙড়ার কাছে অর্থাৎ জ্বালামুখীতে। এখানে মাটি থেকে অগ্নিশিখা উঠে। তীর্থযাত্রীরা দেবী জ্ঞানে সেই অগ্নিশিখায় নানা জিনিস ছুঁড়ে দেয়। অনেকে জিব্‌ কেটে জ্বালামুখীকে দান করেন। অবিশ্বাস্যরূপে সেই কাটা-জিব্‌ নাকি অল্পদিনের মধ্যেই আবার গজিয়ে উঠে। এই অলৌকিক কাণ্ডের জন্য এখানে অজস্র তীর্থযাত্রী ও নানা তন্ত্রসাধকের ভিড় হয়। এই জন্য জ্বালামুখীতে বহু অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন তন্ত্রসাধক দেখা যেত। এখনও দেখা যায়। তবে তন্ত্রসাধকদের কোন একটি বিশেষ তন্ত্রক্ষেত্রের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া কঠিন। কারণ তাঁরা প্রায়শঃই কোন এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকেন না। বামাক্ষ্যাপা যেমন তারাপীঠে স্থির হয়ে বসেছিলেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল। শেষ জীবনে মহাযোগী তৈলঙ্গস্বামীও কাশীতেই দিনাতিপাত করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশই তীর্থে তীর্থে নানা সাধনক্ষেত্রে ঘুরে বেড়ান। এই ঘুরে বেড়ানোর পেছনে কি যে দর্শন আছে কে জানে। তীর্থপুণ্য প্রয়াসীরা যেমন ঘুরে বেড়ান তেমনি সাধকরাও ঘুরেন। শাক্ত সাধকদের কাছে শুনেছি, দেশের একান্নটি মহাশাক্তপীঠ পরিক্রমাকে তাঁরা পরম কর্তব্য বলে মনে করেন। শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন সকলেরই প্রায় এই একই ধারণা। এতে আর কিছু হোক না হোক, ঐক্যবদ্ধ এক ভারতবর্ষের ধারণা বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই।

জ্বালামুখীতে অসংখ্য তন্ত্রসাধক এসেছেন, গেছেন। তাঁদের সবার কথা বলতে গেলে মহাভারত হয়। তাছাড়া এটা বলাও সম্ভব নয়।

তন্ত্রসাধকদের কোন অতীত নেই। নিজের অতীত জীবনের কাহিনী তাঁরা কিছু বলেন না। ফলে তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলাও কষ্টসাধ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও দু-একজনের কথা যে কিছু জানা যায় না তা নয়। এধরনের এক ভৈরবীর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানা গেছে। ভৈরবীর নাম মাতঙ্গী মায়ী।

জ্বালামুখীতে এক বিখ্যাত সাধক থাকতেন। মহাযোগী তিনি। তাঁর নাম মার্তণ্ডজী। মতান্তরে জ্বালামুখীর ভৈরবকে অনেকেই বটুকেশ্বর বলেন। সেই বটুকেশ্বর মন্দিরেই মহাসাধক মার্তণ্ডজী থাকতেন। তাঁর অলৌকিক প্রতিভার কথা শুনে তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন একজন বাঙ্গালী সরকারী কর্মচারী: এঁর নাম নিশানাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

মহাসাধকের কাছে দীক্ষা নেবার সৌভাগ্য অর্জন করলেও সংসার ধর্ম ছেড়ে মার্তণ্ডজী তাঁকে পূর্ণ সন্ন্যাস অবলম্বন করতে দেননি। নিশানাথ-বাবু সেই কারণে স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যাকে নিয়ে সংসার যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অবসর গ্রহণের বছরখানিক আগে নিশানাথবাবুর স্ত্রী পরলোক গমন করেন। সুতরাং একমাত্র কিশোরী কন্যা তাঁকে সংসারের বন্ধনে যেন আরো বেশী করে বেঁধে রাখল। অবসর গ্রহণ করে নিশানাথবাবু সেই কন্যাকে নিয়ে প্রয়াগে একান্নপীঠের এক পীঠ ললিতা দেবীর মন্দিরের কাছে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করতে লাগলেন। সেখানেই তিনি ৺মায়ের আরাধনা করতেন জগজ্জননীর পায়ে নিজেকে সমর্পণ করে।

নিশানাথবাবুর কিশোরী কন্যার নাম ভবানী। ছোট বেলা থেকে তারও শক্তি-আরাধনার প্রতি আকর্ষণ। সেই জন্য দেবী আরাধনা ও নিত্য চণ্ডীপাঠ করতেন একান্ত মনে। ভোর বেলা ত্রিবেণীতে স্নান করে রোজই ললিতাদেবীর মন্দির প্রদক্ষিণ করতেন। ভক্তি আপ্লুত চিত্তে ফিরে এসে পিতার ইষ্ট পূজার উপাচার সংগ্রহ করে দিতেন প্রত্যেক দিন।

ভবানী ছিলেন অসামান্যা রূপসী। এবং সেই সঙ্গে ধর্মশীলা।

অথচ সংসারের কাজকর্মের দিকেও কোন শৈথিল্য ছিল না তাঁর। পিতার সেবা ও শুশ্রূষায় সামান্য ত্রুটি দেখাতেন না কখনও। এজন্য নিশানাথবাবুও পরম তৃপ্তি পেতেন। দেবীপুরাণ ও চণ্ডী ছিল মেয়ের কণ্ঠস্থ। এতে আরও আনন্দ লাভ করতেন তিনি। জগজ্জননীর প্রতি অবিচল শ্রদ্ধার জন্য মেয়ের মধ্যে এসেছিল একটা অবিশ্বাস্য তেজস্বীতা। মেয়ে হিসেবে ভবানী ছিলেন যথার্থই অনন্যা। নিশানাথবাবু অব্যক্ত এক পুলক অনুভব করতেন মনে মনে।

মেয়েকে নিয়ে যতই পরিতৃপ্তি থাকনা কেন নিশানাথবাবুর, চিন্তাও কম ছিল না। কারণ পরপারের ডাক আসছে এটা তিনি বুঝতে পারছিলেন। তাই মেয়ের একটা গতি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মেয়েকে সুপাত্রস্থ করার কথা চিন্তা করতে লাগলেন তিনি। কিন্তু যা নিয়ে পিতার চিন্তার কারণ, মেয়ে তা নিয়ে কোন চিন্তাই করতেন না। পিতার মনের চিন্তার কথা জানতে পেরে একদিন তাই স্পষ্টই বলে দিলেন—'বাবা, আমার জন্য পাত্র খোঁজার দরকার নেই। বিয়ে আমি করব না।' বাবা বললেন, 'সেকি! মেয়েদের স্বামী ছাড়া গতি কি? আমি তো আর চিরকাল থাকব না। তখন তুই কি করবি? বয়সের মেয়েদের যে বিপদ রয়েছে পদে পদে।'

মেয়ে বললেন 'আমি মনে মনে মহামায়ার কৃপা উপলব্ধি করেছি বাবা। সুতরাং বিয়ে আমার হবে না। মহামায়াই রক্ষা করবেন আমাকে। আমার জীবন সন্ন্যাসিনীর জীবন, সে আমি বুঝতে পেরেছি। আমার জন্য ভেবো না।

সাধক-পিতার সাধিকা কন্যা। পিতা বুঝলেন, এ মেয়ের বিয়ে আর হবে না। মহামায়া যথার্থই টেনেছেন তাঁকে। কিন্তু তবু পার্থিব জীবের একটা পার্থিব চিন্তা থাকবেই। জীবন প্রদীপের তেল ফুরিয়ে আসছিল নিশানাথবাবুর। তাই চিন্তা তাঁর সম্পূর্ণ ঘুচল না। তিনি ভাবতে লাগলেন গুরু মহারাজ মার্তণ্ডজীর কথা। তাঁর হাতে মেয়েকে সমর্পণ করে যেতে পারলে তিনি নিশ্চিত হন।

অলৌকিক শক্তিতে যাঁদের বিশ্বাস অলৌকিক শক্তিই ছায়ার মত রক্ষাকর্ত্রী হয়ে ঘুরে বেড়ায় তাঁদের পেছনে। মেয়ে একদিন বাবাকে বললেন, জানো বাবা, 'তোমার গুরুদেবকে আমি দেখেছি।' পিতার চোখে অবিশ্বাস: সে কি করে সম্ভব! মেয়েকে তো কখনও তিনি নিয়ে যাননি জ্বালামুখীতে বটুকেশ্বরের মন্দিরে! তাহলে মেয়ে তাঁকে দেখবে কি করে! কিন্তু মেয়ে বললেন, একবার নয় বাবা, পর পর কয়েকবার তাকে আমি দেখেছি। শুধু দেখেছি না, তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, আমাকে বরাভয় দিয়েছেন।

পিতা বললেন, কোথায় দেখেছিস তাঁকে ?

মেয়ে বললেন, ধ্যানে বসলে আসনে এসে দেখা দিয়েছেন। জান, তিনি এলে ঝুম ঝুম একটা শব্দ হয়। তারপর জ্যোতির্ময় দেহ নিয়ে সামনে ভেসে উঠেন। বলেন, ভয় কি তোর! আমি তো সব সময় তোর কাছেই আছি!

পিতার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। মেয়ের বর্ণনা হুবহু মিলে যায় গুরুদেবের সঙ্গে। তন্ত্রসিদ্ধ মহাসাধক তাঁর গুরু মার্তণ্ড মহারাজ। দেহ দীর্ঘ এবং বিশাল। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। রক্তবর্ণ বৃহদায়তন দুটি চোখ। প্রশস্ত ললাট চন্দন চর্চিত। হাতে ত্রিশূল। সেই ত্রিশূলে রেশমী সুতো দিয়ে বাঁধা এক গুচ্ছ রূপালী ঘুঙুর। পথ চলতে সেই ঘুঙুর থেকেই শব্দ হয় ঝুম ঝুম। সুতরাং নিশানাথবাবু বুঝলেন যে, মেয়ে যথার্থই দেখেছে তাঁর গুরুদেবকে। গুরুদেবের অসীম কৃপা তাঁর কন্যার প্রতি। সুতরাং তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

মেয়ের এই অভিজ্ঞতার আরও মাসখানেক পরে গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে নিশানাথবাবু পড়লেন শয্যায়, শুধু দিনরাত ভাবতে লাগলেন গুরুদেবের কথা। তিনি কথা দিয়েছিলেন, সময় হলেই দেখা হবে। কিন্তু দীক্ষা গ্রহণের পরে আর দেখা হয়নি তাঁর সঙ্গে। দিন ফুরিয়ে আসছে। এখনও যদি দেখা না হয় তবে আর দেখা হবে কবে! তা ছাড়া, গুরুর দেখা পেয়ে তাঁর হাতে মেয়েকে সমর্পণ করে দেওয়া

ছাড়া কিছুতেই যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না নিশানাথবাবু। একমনে পরমারাধ্য গুরুদেব মহারাজকে ভাবতে লাগলেন তিনি। গুরুর মত গুরু হলে তাঁর কথা কখনও ব্যর্থ হয়না। শিষ্যকেও কখনও ভুলেন না তিনি। মার্তণ্ড মহারাজও ভুলেন নি। রোগক্লান্ত দেহের প্রাণশক্তি যখন ফুরিয়ে আসছে নিশানাথবাবুর ঠিক তখনি একদিন গুরুদেব দেখা দিলেন। জ্যোতিরূপে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, কথা দিয়েছিলাম সময় মত আসব, এই ভ্যাখ, এসেছি।

গুরুর দেখা পেয়ে শিষ্য সমস্ত যন্ত্রনা ভুলে গেলেন।

গুরু বললেন, 'এবার তোর দেহের বাঁধন ছাড়তে হবে। মুক্তি দেবার জন্যই আমি এসেছি। দেহের বন্ধন কাটিয়ে এবার পরম আত্মার সন্ধান পাও। জীবন ভরে যে সাধনা করেছ, তপস্যা করেছ, তা সঠিক হোক। কন্যার জন্য চিন্তা নেই, তার ভার আমার উপর। স্বয়ং মহামায়া তাকে কৃপা করেছেন, তার জন্য ভয় কি? মেয়েকে বলবে, জ্বালামুখী মন্দির প্রাঙ্গনে এসে সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।' গুরুদেবের জ্যোতি মিলিয়ে গেল। নিশানাথবাবু আর তাঁকে দেখতে পেলেন না।

মার্তণ্ড মহারাজকে দেখতে পাননি কন্যা ভবানী। শুধু তাঁর মিলিয়ে যাবার সময় অলৌকিক জ্যোতির রেশটুকু দেখতে পেয়েছিলেন। সেই অপসৃয়মান জ্যোতি দেখে কন্যা ছুটে এলেন পিতার ঘরে, বললেন, এত আলো কিসের বাবা? কোথায় গেল? বাবা বললেন, মাগো আমার গুরু মহারাজ এইমাত্র এসেছিলেন। বলে গেলেন, আমার মোক্ষের সময় হয়েছে। এবার আমি বিদায় নেব। তবে তোর চিন্তা নেই। তোর সব দায়িত্ব তিনি নিজে নিয়েছেন। আমার শেষ কৃত্য হবার সঙ্গে সঙ্গেই তোকে যেতে হবে জ্বালামুখী শাক্তপীঠে। সেখানেই দেখা পাবি গুরুজী মহারাজের। তাঁর চরণে শরণ নিবি।

ভবানী খুব শোক করলেন না পিতার জন্য। জগজ্জনীর খেলা এমনতরই হয়। সে তা জানে। এবার তাঁকে নিয়ে যে খেলা সেই

খেলা আরম্ভ হবে। ৺মায়ের ইচ্ছা পূর্ণ করতে হবে তাঁকে ক্ষুদ্র জীবনের এই পরিধির মধ্যে। সুতরাং পিতার মৃত্যুর পনের দিন পরেই ভবানী রওনা হয়ে গেলেন জ্বালামুখী শাক্তপীঠের দিকে।

সুন্দরী রমণী, ভরা যৌবন। একাকী পথ চলার বিপদ কি ভবানী তা জানেন। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য বেশ পাল্টে নিলেন ভবানী। পরনের শাড়ি আর কাঁধের ঝুলি রাঙিয়ে নিলেন গৈরিক রঙে। সন্ন্যাস নেবার আগেই সন্ন্যাসিনীর বেশ ধরে ভবানী পথে বেরুলেন।

আজ জ্বালামুখী যাওয়া সহজ বটে, তবে বছর পঞ্চাশেক আগেও জ্বালামুখী তীর্থ দুর্গম বলেই গণ্য ছিল। হোসিয়ারপুর থেকে দুর্গম রাস্তায় চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে তবে সেখানে পৌঁছুতে হত। কেউ কেউ যেতেন পাঠানকোট হয়ে কাংড়ার পথে। এখন যাওয়া যায় রেল গাড়িতে ও বাসে। ভবানী গিয়েছিলেন পায় হেঁটে। কাংড়ার দেবী ত্রিপুরমালিনীকে দর্শন করে একদিন সেখানে ভবানী বিশ্রাম করলেন। অনেকের মতে কাংড়ার এই শাক্ততীর্থও একান্নপীঠের অন্যতম একটি পীঠ।

কাংড়া থেকে জ্বালামুখীর দূরত্ব বিশ মাইলের মত। কাংড়ায় একদিন বিশ্রামের পর ভবানী রওনা হলেন জ্বালামুখীর দিকে। সারাদিন অক্লান্তভাবে চলবার পর অবশেষে তিনি জ্বালামুখীতে ৺মায়ের মন্দিরের স্বর্ণচূড়া দেখতে পান। দিব্য চক্ষে দেখা গুরুর সেই জ্যোতির্ময় দেহ স্মরণ করতে থাকেন তিনি।

ভবানী যখন জ্বালামুখীতে এসে পৌঁছান তখন সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকার নেমেছে। মা অম্বিকার মন্দিরে সন্ধ্যারতি শুরু হয়েছে। মন্দিরের দুয়ারে এসে প্রথম মাকে দর্শন করলেন ভবানী। তারপর পুরোহিতদের কাছে গুরুজী মার্তণ্ড মহারাজের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

জ্বালামুখীতে মার্তণ্ড মহারাজ 'বাবা মহারাজ' নামে পরিচিত। প্রধান পুরোহিত ভবানীর ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে অন্তরে এক পরম স্নেহ অনুভব করলেন। তাঁর নবযৌবনোদ্ভত সুন্দর মুখশ্রী পথশ্রমে

অত্যন্ত ম্লান। অথচ মনের মধ্যে তাঁর অলৌকিকের স্বপ্ন। সুদূর অতীন্দ্রিয়ের আহ্বান সেই ক্লান্তিকে বড় মনমুগ্ধকর করে তুলেছে। সারা মুখে এক অব্যক্ত সৌন্দর্য। তিনি বললেন, মায়ী, বাবা মহারাজকে তুমি খুঁজছ কেন?

ভবানী বললেন, তিনি যে আমার গুরু।

—তুমি কোথা থেকে আসছ মায়ী?

ভবানী বললেন, এলাহাবাদ থেকে।

—একা! পায় হেঁটে!

—হ্যাঁ মহারাজ।

—'আহা! না জানি কত কষ্ট হয়েছে তোমার। প্রধান পুরোহিত তৎক্ষণাৎ এক পাণ্ডাকে ডেকে ভবানীকে বাবা মহারাজের কাছে নিয়ে যেতে বললেন।

ভবানীর বুক আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। যাঁকে দিব্য দেহে জ্যোতির্ময় মূর্তিতে দেখেছেন তিনি, এবার তাঁকে নিজের চর্মচক্ষে রক্ত মাংসের দেহে দেখবেন। তিনিই যে তাঁর পরমসুখ, পরম গতি। ভবানীর বুক কাঁপতে লাগল।

পাণ্ডা ভবানীকে বটুকেশ্বরের মন্দিরে মার্তণ্ড মহারাজের আশ্রমে নিয়ে গেল। ভবানী স্বচক্ষে এবার তাঁকে দেখলেন। যথার্থই সেই মূর্তি। মাথার ঝাঁকড়া চুল। দীর্ঘদেহ। সুপুরুষ মার্তণ্ড মহারাজ। সারা দেহে দিব্য জ্যোতি। চোখে অপূর্ব করুণাঘন দৃষ্টি। তাঁকে দেখে দুই চোখে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু ঝরতে লাগল ভবানীর।

মার্তণ্ড মহারাজ স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললেন, কি রে, শেষপর্যন্ত এত দূরে এসেই আমাকে ধরে ফেললি!

ভবানী বললেন, বাবা, তুমিই তো আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে এলে। তোমার কৃপাতেই তো তোমার দেখা পেলাম। তুমি ছাড়া আমার তো আর কেউ নেই বাবা!

বাবা মহারাজ হেসে বললেন, ঐ পাশের কুঠিয়ায় এখন তুই

বিশ্রাম নে মা। তোর জন্য প্রসাদ রাখা আছে, খেয়ে নে। তারপর ঘুমো। সকাল বেলায় তোর সঙ্গে দেখা হবে।

পরদিন ভোরে উঠেই ভবানী দেখলেন, বাবা মহারাজ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। বাবার চেলাদের কাছে তিনি শুনলেন যে, বাবা মহারাজ আজ রাত থাকতেই উঠেছেন। রাত্রিতেই স্নান সেরে জপ ধ্যান ও হোম করেছেন। ভবানী তড়িঘড়ি বাবাজী মহারাজের কাছে ছুটে গেলেন।

ভবানী কাছে আসতেই বাবা মহারাজ তাঁকে সস্নেহে কাছে বসালেন। বললেন, জ্বালামুখী পীঠের কথা শুনেছিস তো মা?

ভবানী বললেন, হ্যাঁ। মহামায়ার জিহ্বা পড়েছে এখানে। এটি একান্নপীঠের এক পীঠ।

—জিহ্বা দিয়ে কি হয় জানিস তো মা?

ভবানী গুরুর মুখের দিকে তাকালেন।

গুরু বললেন, জিহ্বা দিয়েই উচ্চারিত হয় বেদের মন্ত্র, তন্ত্রের মন্ত্র। জিহ্বা শুধু আহারের জন্যই নয়, মুক্তিমন্ত্র উচ্চারণের জন্যও এই জিহ্বা। জগজ্জননীর এই মহাপীঠ তাই মুক্তির মহাপীঠ। এই জিহ্বাকে সংযত করে মুক্তিমন্ত্র উচ্চারণ করলেই জীবের পাপমুক্তি ঘটে। স্বয়ং মহাকালী নিজের জিহ্বা দন্তপাটি দিয়ে শাসন করে সে-কথাই বুঝিয়ে দিচ্ছেন। জ্বালামুখীর জ্বালাজী মোক্ষদায়িনী ৺মায়ের জ্যোতির্ময়ী সত্তা। এই মহাতীর্থে আমি তোকে শাক্তমন্ত্রে দীক্ষা দেব। তোকে তন্ত্রমতে সন্ন্যাস নেওয়াবো।

ভবানী জোড় হস্তে সাশ্রু নয়নে বাবাজী মহারাজের দিকে তাকিয়ে বললেন, বাবা, অসহায়া কন্যার প্রতি তোমার এই অহেতুকী কৃপার তুলনা নেই। তোমার চরণাশ্রিতা এই অধম কন্যাকে তুমি করুণা কর।

বাবাজী মহারাজ বললেন, 'আমার করুণা কিরে বেটি! ৺মায়ের করুণা। তিনিই যে ছায়ার মত সদা সর্বদা তোর পেছনে আছেন। তুই দেখতে পাচ্ছিস না। তিনিই তাঁর ইচ্ছা পূরণ করছেন। আমি

উপলক্ষ্য মাত্র।' বাবা মহারাজ ভবানীকে জ্বালাজীর মন্দিরে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন।

মন্দিরের কাছে দুটি তপ্তকুণ্ড আছে, ব্রহ্মকুণ্ড ও গোমুখী। ভবানী দুই কুণ্ডে স্নান সেরে নিলেন। তারপর বাবা-মহারাজের দেওয়া রক্ত-বস্ত্র পরিধান করলেন।

গুরু প্রদত্ত বস্ত্রের কি অপরিসীম প্রভাব। ভবানীর মনে হল, তিনি যেন ভিন্ন লোকে উপস্থিত হয়েছেন। ভেতরে অব্যক্ত এক ভাব অনুভব করতে লাগলেন। সব কিছুই তাঁর কাছে নতুন বলে বোধ হতে লাগল। জ্বালাজীর সমগ্র মন্দির প্রাঙ্গণ যেন তাঁর কাছে স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত বলে বোধ হল। ভবানী রক্তবস্ত্র পরে দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করলেন। মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত আছে শিলা প্রতীক। সেই শিলা প্রতীককে প্রণাম করলেন। দেয়ালের পাশ দিয়ে মাঝে মাঝেই উঠছে নীলাভ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের জ্যোতি লক্ষ্য করলেন ভবানী। মধ্যস্থলে রয়েছে হোমকুণ্ড। সেই হোমকুণ্ডের ধারে একমনে ভবানী দেবীস্তোত্র পাঠ করলেন। বাবা মহারাজের সেই রকমই নির্দেশ।

এখানে দীর্ঘসময় দেবীস্তোত্র পাঠ করলেন ভবানী। মনের মধ্যে আজ এই স্তোত্রপাঠের পর অদ্ভুত এক শক্তি অনুভব করলেন। মনে হল তাঁর ভেতরে অঙ্কুরিত কোন বীজ যেন তাঁকে ফুঁড়ে বেরুতে চাচ্ছে। স্তোত্র শেষ করে পুলকিত চিত্তে তিনি গুরু মহারাজের কাছে ফিরে এলেন।

বাবা মহারাজ মার্তণ্ডজী তাঁকে প্রথম দীক্ষা দিলেন। একটি বীজ মন্ত্র উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়লে যা হয়—তাই হল। একটি বীজমন্ত্রে সমস্ত দেহমন যেন শিহরিত হয়ে উঠল ভবানীর। তবে দীক্ষা দানের আগে তন্ত্রদীক্ষার অনুষ্ঠানগুলিও একে একে সেরে নিয়েছিলেন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ মঞ্জুরিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য পুলকের আবেগে ভবানী সংবিৎহারা হয়ে গেলেন।

জ্ঞান ফিরে এলে মার্তণ্ড মহারাজ ভবানীকে বললেন, 'বেটি, সন্ন্যাস নিয়েছিস। সংসারের সঙ্গে এখন আর তোর কোন পারিবারিক সংযোগ নেই। পূর্বের নামও তোকে পরিত্যাগ করতে হবে। এবার থেকে তোর নতুন নাম হল মাতঙ্গী মায়ী। পূর্বাশ্রমের সব কিছুই এবার থেকে তোকে ভুলবার চেষ্টা করতে হবে। সংসারবিস্মৃত হয়ে তোর ভেতরে করতে হবে অতি-সংসারের অলৌকিক শক্তির উদ্বোধন। তুই পরম ভাগ্যবতী মা। আজ তন্ত্রদীক্ষার মহা শুভলগ্ন। সেই শুভলগ্নের সুযোগ পেয়েছিস। মহাশাক্তপীঠ জ্বালাজীর মন্দিরে খুব কম তন্ত্রসাধকই মন্ত্রলাভের সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু তুই পেয়েছিস। এটা তোর জন্মান্তরের সুকৃতির ফল।

মাতঙ্গী মায়ীর নতুন জীবন আরম্ভ হল। আর তিনি ভবানী নন। মার্তণ্ড মহারাজ একে একে তাঁকে তন্ত্রসাধনার গূঢ় তত্ত্বগুলি শিক্ষা দিতে লাগলেন। এই গূঢ় তত্ত্বশিক্ষা লাভের পর একবৎসর কাল তপশ্চর্যায় ব্রতী হলেন মাতঙ্গী মায়ী। এ-সময় তিনি অধিকাংশ সময় দেবীর নাটমন্দিরের পাশে এক নির্জন কুঠিতে বসে গুরু প্রদর্শিত পথে তন্ত্রক্রিয়া করতেন। তবে রাত্রিবেলা এখানে তন্ত্রক্রিয়া করতে গুরু নিষেধ করেছিলেন। তখন গুরুর কাছে ফিরে যেতে হত বটুকেশ্বর মন্দিরে। সেখানে নিজের কুঠিতে তিন চার ঘণ্টা নিদ্রা যাবার পর আবার শেষরাতে উঠে জপ ও ধ্যান করতে হত।

এসময় মাতঙ্গী মায়ের আহারও ছিল অত্যন্ত কম। দিনের বেলা জ্বালাজী মায়ের প্রসাদ পেতেন। প্রসাদ সামান্য দু'খানা করে পুরী ও ছোলার ঘুগ্‌নি। রাতের আহারের জন্যও সময়ের অপচয় করতেন না। পাণ্ডা বা স্থানীয় গৃহস্থদের বাড়ি থেকে দু'একটি ফলমূল ভিক্ষা করে এনে তাই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন।

তাঁর এই কৃচ্ছ্রসাধনা স্থানীয় সাধকদের মধ্যেও চাঞ্চল্য এসেছিল। সাধনার গুণে দিনে দিনে তাঁর দেহে ফুটে উঠেছিল দিব্য জ্যোতি। এতে জ্বালামুখী, কাংড়া, জালন্ধর প্রত্যেক অঞ্চলেই একটা চাঞ্চল্য পড়ে

গিয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যেই সাধু সমাজ ও সাধকদের মধ্যে তিনি তন্ত্রসাধিকা রূপে বিশেষরূপে চিহ্নিত হয়ে গেলেন।

মার্তণ্ড মহারাজ প্রচলিত অর্থে গুরুগিরি করতেন না। সেজন্য কোন আশ্রমও খুলেন নি। বিশেষ কোন সম্প্রদায়ও সৃষ্টি করেননি। তাই বলে যে তাঁর শিষ্য ও ভক্তের সংখ্যা কম ছিল, তা নয়। বহু তন্ত্রপিপাসু সাধক সেখানে আনাগোনা করতেন। জ্বালাজীর মন্দিরে যাঁরা একান্নপীঠের অন্যতম এই পীঠের পুণ্য অর্জন করতে আসতেন, তাঁরা সবাই বাবা মহারাজকে একবার দর্শন না করে যেতেন না। অনেকেই তাঁর কাছ থেকে তন্ত্রসাধনার গুহ্য রহস্যের কথা জেনে নিতেন। এ নিয়ে অনেকে আলোচনাও করতেন। জ্ঞানপিপাসু অধ্যাপকেরাও এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে আসতেন। এধরনের একজন ছিলেন জালন্ধর কলেজের এক বাঙ্গালী অধ্যাপক।

সেদিন শিষ্য ও ভক্তদের নিয়ে বাবাজী মহারাজ ধুনি জ্বেলে বসে আছেন। বসে আছেন মাতঙ্গী মায়ীও। সামান্য আলোচনা চলছে নিজেদের মধ্যে দর্শন ও তন্ত্র নিয়ে। সেই অধ্যাপকও এসে আলোচনাতে অংশ নিলেন। অধ্যাপক বাবাজী মহারাজকে বললেন, একদল গবেষকের ধারনা বেদ-এর অনেক পরে এসেছে তন্ত্র। হিন্দু সাধনায় তন্ত্রের স্থান তেমন উঁচুতে নয়। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

মার্তণ্ড মহারাজ বললেন, ইতিহাসের দৃষ্টি নিয়ে যদি তন্ত্রের গবেষণা করিস, তাতে তো হবে না। এতে কাজের কথা না হয়ে বাজে কথাই হবে। তন্ত্র পড়াশুনার ব্যাপার তত নয়, যতটা ক্রিয়ার ব্যাপার। যে নিজে তন্ত্র সাধনা না করেছে, সে তন্ত্র সম্পর্কে বুঝবে কি? তন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই। তৃতীয় নয়ন থাকা চাই। অবিদ্যা নিয়ে কি বিদ্যাকে জানা যায়? তন্ত্র বহু আগের। বেদেরও আগের।

অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন, কি রকম?

হেসে মার্তণ্ড মহারাজ বললেন, তার আগে তোকে জিজ্ঞেস করি, তন্ত্র কথার অর্থ জানিস?

অধ্যাপক হেটমুণ্ড হয়ে বললেন, না।

বাবাজী মহারাজ বললেন, 'তন্' অর্থাৎ যা সাধারণতঃ জীবনীশক্তি হেতু হয় বিস্তারিত ও প্রবর্ধিত তাকে নিয়ন্ত্রিত (ত্) করে তার অন্তর্নিহিত প্রাণাগ্নি শক্তিকে (র) কার্যকর করার নামই হল তন্ত্র।

অধ্যাপক বললেন, আপনার কাছে তন্ত্রের নতুন ব্যাখ্যা শুনলুম।

বাবাজী মহারাজ বললেন, তন্ত্র এই সনাতন ধর্মের দেশ ভারতবর্ষের নিজের অবদান, সেই অবণাতীত কাল থেকে। তন্ত্র বেঁচে ছিল আমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর ক্রিয়াকলাপে। সেই গুহ্য ক্রিয়াকলাপকে প্রাচীনকালেই অনেকে ইঙ্গিতে ধরে রাখতে চেষ্টা করেছে। সিন্ধু উপত্যকায় যে চিত্রবর্ণী লেখার সন্ধান পেয়েছিস সবই তন্ত্রের গুহ্য ইঙ্গিত।

অধ্যাপক বললেন, সে লিপির তো কোন অর্থই উদ্ধার করা যায়নি। আপনি জানলেন কি করে?

বাবাজী মহারাজ বললেন, এই যে বলেছি অন্তর্দৃষ্টি, তাই দিয়ে। অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে তাকালে কোন কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। মহেন-জো-দড়ো বা সিন্ধু উপত্যকা যে কত বড় তন্ত্রের অঞ্চল ছিল, তোকে সহজ একটা উদাহরণ দিয়ে তা বুঝিয়ে দিচ্ছি।

—বলুন।

—মহেন-জো-দড়ো হরাপ্পাতে পশু পরিবৃত এক ধ্যানাসনে বসা দেবমূর্তির সন্ধান পেয়েছিস?

অধ্যাপক বললেন, হ্যাঁ, আমরা তাঁকে পশুপতি বলছি।

—পশুপতি বলছিস কেন?

—পশুদ্বারা পরিবৃত বলে।

—এই পশু অর্থ কি তা জানিস?

—পশু মানে beast।

বাবাজী মহারাজ হেসে বললেন, এতো ইংরেজী ব্যাখ্যা হল। পশু শব্দের ব্যাখ্যা হলনা। পশু বলে তাকেই, পাশ দ্বারা যে আবদ্ধ। কি পাশ? মায়াপাশ। যে পাশ দ্বারা আবদ্ধ বলেই নিজের অভ্যন্তরস্থ সত্যের সন্ধান সে পায় না। এই জন্য পাশে আবদ্ধ সব জীবকেই পশু বলে। অজ্ঞান মানুষও পশু। তার ইন্দ্রিয়গুলি পাশের দ্বারা আবদ্ধ বলে ইন্দ্রিয়গুলিও পশু। এই ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই থাকেন পরম চৈতন্যরূপী পরমাত্মা, যিনি এর পরিচালক। সেই পরমাত্মাই হলেন পশুপতি। একমাত্র পুরুষ। মহেন-জো-দড়োর পশুপতি মূর্তির এই হল ব্যাখ্যা। মূর্তিটির যদি ভালভাবে ব্যাখ্যা করিস, তাহলেও এই একই উত্তর পাবি। যেমন দেখ: পরমচৈতন্য বা শিব, মায়াপাশে আবদ্ধ পশু দ্বারা আছেন পরিবৃত হয়ে। তিনি উর্ধ্বমেঢ্র অর্থাৎ উত্থিত লিঙ্গ। অর্থাৎ প্রকৃতিতে লিঙ্গদ্বারা বীজ প্রদানকারী পরমাত্মা। পুরুষ ও প্রকৃতির সমন্বয়ে রয়েছে যে পাশবদ্ধ জীব তারই মধ্যে রয়েছেন এই পুরুষ উপবিষ্ট। এত বড় একটা ভাব রয়েছে এই মূর্তিটির মধ্যে। এই ভাবই হল তন্ত্রের মূল কথা। আর মহেন-জো-দড়ো হরাপ্পাতে যদি এই ভাবের চিত্রকল্প পাওয়া যায় তাহলে তন্ত্রকে আমরা বেদের আগে বলব না পরে বলব? বেদ আগে লেখা হয়েছে, না মহেন-জো-দড়ো হরাপ্পার সভ্যতা আগে দেখা দিয়েছে?

অধ্যাপক বললেন, ইতিহাস বিশ্বাস করলে মহেন-জো-দড়ো হরাপ্পার সভ্যতা আগের।

—তাহলে তন্ত্রও বেদের আগের এ-কথা জানবি।...

অধ্যাপক বললেন, কিন্তু......

বাবাজী মহারাজ বললেন, এর মধ্যে কিন্তু নেই। তোরা আর কতটুকু বুঝিস বল। প্রাগৈতিহাসিক কালের ঘটনার বিচার করবি কোথা থেকে, ঐতিহাসিক কালের ঘটনারই বিচার করতে পারিস?

—কি রকম? অধ্যাপক মার্তণ্ড মহারাজের মুখের দিকে তাকালেন।

বাবাজী মহারাজ বললেন, উড়িষ্যাতে কোণারকের সূর্যমন্দির দেখেছিস ?

—হ্যাঁ।

—মূর্তিগুলিকে কি মনে হয় ?

—অশ্লীল।

—কেন ?

—অশ্লীলভঙ্গীতে মৈথুন কার্যে লিপ্ত আছে বলে।

মার্তণ্ড মহারাজ বললেন, ঐ মূর্তিগুলির প্রতীক অর্থ ভেদ করতে পারিস নি বলেই এরকম মনে হয়। আসলে এ মৈথুন হল তন্ত্রের মৈথুন। এ কথা বুঝিস নি বলেই মূর্তিগুলোকে অশ্লীল মনে হচ্ছে।

অধ্যাপক বললেন, এ-কথা তো আগে কোথাও শুনি নি!

বাবাজী মহারাজ বললেন, শুনবি কোথা থেকে। তোদের ঐতিহাসিকদের বাহ্যদৃষ্টি আছে, অন্তর্দৃষ্টি তো নেই। আরো ভাল করে বোঝাচ্ছি তোকে। খাজুরাহো গিয়েছিস ?

—হ্যাঁ।

—কাণ্ডারিয় মহাদেবের মন্দির দেখেছিস ?

—হ্যাঁ।

—সেখানে বিপরীত মৈথুন রত শিবের মূর্তি দেখেছিস ?

—হ্যাঁ।

—কি মনে হয় তোর ?

—বিকৃত যৌন রুচির পরিচয়।

মার্তণ্ড মহারাজ হেসে বললেন, ওটা আসলে একটা প্রতীক, বুঝলি ?

—কিসের প্রতীক ?

—এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির প্রতীক।

—কি রকম ?

—এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিই হয়েছে বিপরীত মৈথুন থেকে।

অধ্যাপক বললেন, বুঝিয়ে বলুন।

মার্তণ্ড মহারাজ বললেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে বা কেন্দ্রে রয়েছেন নিষ্ক্রিয় পুরুষ পরমচৈতন্য। তাঁকে আবৃত করে রয়েছে তারই গুণ বা শক্তি। এই শক্তিই হল পুরুষের শক্তি। এই দুয়ের এক অব্যক্ত সঙ্গমেই হল সৃষ্টি। প্রকৃতি পুরুষের উপরে থেকে তাঁকে আবৃত করে আছে বলে প্রকৃতি পুরুষের এই সঙ্গম তন্ত্রশাস্ত্রে বিপরীত মৈথুন নামে পরিচিত। বুঝেছিস ?

অধ্যাপক বললেন, হ্যাঁ। এতক্ষণে আমার ধারণা স্পষ্ট হল।

—তাহলে ?

—তাহলে এবার বিশ্বাস হচ্ছে যে, তন্ত্র বেদের আগের।

মার্তণ্ড মহারাজ বললেন, যথার্থই তাই। তন্ত্র বেদের অনেক আগের। আবার বেদ থেকেও তন্ত্র বহু মন্ত্র নিয়েছে। অপর পক্ষে বেদের বহু মন্ত্রই তন্ত্রের মন্ত্র। রাত্রি সূক্ত, হৈমবতীর কথা, এ-সব তো তন্ত্রেরই কথা।

অধ্যাপক বললেন, অথচ আশ্চর্য ব্যাপার ঐ যে, প্রধান প্রধান ঋষিদের অধিকাংশই বেদজ্ঞ। তন্ত্রজ্ঞের কথা জানতে হলে খোঁজ করতে হয়।

মার্তণ্ড মহারাজ বললেন, মুর্খের মত কথা বললে তুমি।

—কেন ?

—সব কিছু বিচার করে দেখ নি বলেই এমন কথা বলছ। বিচার করে দেখলে দেখতে, যাজ্ঞবল্ক্যের বৃহদারণ্যকে বেদজ্ঞান এবং তন্ত্রতত্ত্ব দুইই আছে। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য, এঁরা বেদ এবং তন্ত্র দুয়েতেই পারঙ্গম ছিলেন। এঁদের জ্ঞানের কথা কোন ব্রহ্মবিদ যোগী তান্ত্রিকের কাছ থেকে জানবার চেষ্টা কর, তাহলেই বুঝবে।

মার্তণ্ড মহারাজ যখন অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন তখন মাতঙ্গী মায়ী খুব অভিনিবেশ সহকারে তা শ্রবণ করছিলেন। হঠাৎ মার্তণ্ড মহারাজ তাঁর এই নবীনা শিষ্যার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই

তো জ্বালাজীর কৃপায় অনেক কিছু তত্ত্ব ও সিদ্ধি অর্জন করেছিস। জ্বালাজীর এই পীঠকে কি তুই শুধু মহাশক্তির পীঠ বলবি? মহাজ্ঞানের পীঠ বলবি নে?

মাতঙ্গী মায়ী বললেন, বাবা, আপনার কাছ থেকেই আমার সামান্য জ্ঞান। জ্বালাজীর তত্ত্ব কৃপা করে আপনিই আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করুন।

মার্তণ্ড মহারাজ হেসে অধ্যাপকের দিকে তাকালেন, তারপর জ্বালাজী তত্ত্বের কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, জ্বালাজীর মন্দিরে যে লেলিহান শিখা, তা হল একটা প্রতীক মাত্র। এই প্রতীকের মাধ্যমে মহাকালীর তত্ত্ব, মহাশক্তির তত্ত্ব প্রকটিত।

একজন ভক্ত বললেন, আর একটু স্পষ্ট করে বলুন বাবা।

বাবাজী মহারাজ বললেন, কালীতত্ত্ব বুঝতে গেলে মহাদেব তত্ত্ব আগে বুঝতে হবে। মহাদেব হলেন পরম পুরুষ। তাঁরই গুণ শক্তিরূপে প্রকাশিত। পুরুষকে কেন্দ্র করে এই শক্তি বা প্রকৃতি নৃত্যচঞ্চলা। তিনি জন্ম দিচ্ছেন, পালন করছেন, আবার নিজেই ধ্বংস করছেন। এ-সব হল গভীর তত্ত্ব। এর স্বরূপ বোঝার জন্য চাই যোগসাধনা। পরম চেতনা বলেই মহাদেবের বর্ণ শ্বেত। কণ্ঠে রয়েছে বলয়ীকৃত সর্প-ভূষণ। তাঁর কণ্ঠ নীল। মহাদেবের কণ্ঠ দ্যু-লোকের নিচে। এই দ্যু-লোক বা দ্যৌ-হল আকাশের নীলিমা দ্বারা প্রকাশিত। এই জন্য মহাদেবের কণ্ঠ নীল। অহি বা সর্প হচ্ছে মেঘের প্রতীক। মেঘ বাচক। বেদের নানাস্থানে এর উল্লেখ আছে। এই সর্পের আর একটা গভীর তাৎপর্য আছে। সর্প হল বিশ্ব জীবনের জীবনী শক্তি, সত্তা শক্তি। বিদ্যুৎরূপে এর অবস্থান। সূর্যের মধ্যে লুকানো এই বিদ্যুৎ শক্তিকে বলা হয় সাপ, সসর্পরীবাক। অথর্ব বেদে এই জন্যই বলা হয়েছে: এই সর্পগুলির দ্বারাই সৃষ্টির ঐশ্বর্য বহুধা বিকশিত—বহুধা মহান্তি,'। প্রকৃতি এই সাপরূপেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধরে রেখেছে। সেই জন্য একদিকে এই সাপই হল কালী—কুণ্ডলিনী। এই কালীর

গলায় একান্নটি মুণ্ডমালা হল—অজ্ঞাতকেন্দ্র পরমচেতনা শিব থেকে অব্যক্ত কারণে আলোড়নের ফলে যে বস্তুজগতের সৃষ্টি, সেই বস্তুজগতের প্রতীক। পরম চেতনা প্রকৃতি সংযোগে একান্নটি বিভিন্ন ধরনের আলোড়নের সাহায্যে এসে বস্তুজগতে পরিণত হয়েছে। এই যে কালীর জিহ্বা, তারও অর্থ আছে। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণে অগ্নিকে বলা হয়েছে সপ্তজিহ্বা। বেদের ঋষিরা বলেছেন—'সেই লেলিহ জিহ্বাতে আহুতি না দিলে হোতার আহুতি ফলপ্রসূ হয় না। কালীর রক্তবর্ণ লোল রসনা বলতে আসলে ঐ অগ্নিকেই বোঝায়। ঘন বস্তুরূপ প্রকৃতির এ আর এক বিশেষ অবস্থা।

মাতঙ্গী মায়ী জিজ্ঞাসা করলেন, জ্বালাজী মন্দিরের ঐ অগ্নিশিখা তাহলে কী ?

মার্তণ্ড মহারাজ বললেন, বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান দিয়ে যদি দেখো, এ তাহলে নৈসর্গিক ঘটনা। কিন্তু যদি ধ্যানের দৃষ্টিতে দেখ, তাহলে এইই হল মহাকালের শক্তি, মহাকালীর লেলিহান জিহ্বা। প্রকৃতির অগ্নিতত্ত্ব যাঁরা জানেন তাঁরা এতে সেই ভাবে ধ্যাননিবিষ্ট হয়ে আহুতি প্রদান করে সাধনায় সিদ্ধি অর্জন করেছেন।

কালীতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব বোঝালে পরেও সবাই বোঝে না। এ বোঝার জন্য চাই একটা দিব্যানুভূতি। সুতরাং মার্তণ্ড মহারাজ যখন কালীতত্ত্ব ও পুরুষতত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন, সবাই তা সমানভাবে বুঝতে পারল না। এমন কি সেই অধ্যাপকও নয়। কিন্তু মাতঙ্গী মায়ীর মধ্যে যে দিব্যানুভূতি মঞ্জুরিত হয়ে উঠছিল সে-জন্য তিনি অতি সহজেই এই রহস্যময় তত্ত্ব অনুসরণ করে অন্তরের মধ্যে এক দিব্য সাড়া অনুভব করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, গুরুজী তৃতীয় নয়ন বলতে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন। জগজ্জননীর অনেক করুণা, যে, এমন সদগুরু তিনি তাঁকে দিয়েছেন। অসংখ্য বার সেই বিশ্বজননীর পায়ে তিনি প্রণাম জানাতে লাগলেন।

মাতঙ্গী মায়ীর সাধনার প্রথম পর্ব সমাপ্ত করতে সময় লাগল তিন

বছর। তাঁর দেহের মধ্যেও অধ্যাত্মসাধনার দিব্যভাবগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগল। গুরুজী তা লক্ষ্য করে একদিন তাঁকে ডেকে বললেন, বেটি, সাধনার ভিত্ তোমার শক্ত হয়েছে। তোমার কৃচ্ছ্রসাধনা ও ক্রিয়াকলাপ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। সাধনার প্রথম পর্যায় তোমার শেষ। এবার তোমাকে বেরুতে হবে তীর্থে তীর্থে পরিব্রাজনে। শক্তিসাধনায় সিদ্ধির জন্য একান্নটি মহাশাক্তপীঠ পরিভ্রমণ করা শক্তি-সাধকদের পরম কর্তব্য। এবার তন্ত্রসাধনায় চূড়ান্ত সিদ্ধির জন্য সেই একান্ন মহাপীঠ তোমাকে পরিভ্রমণ করতে হবে। সেই সব স্থানে আমার নির্দেশ অনুযায়ী তপজপ ও হোম করতে হবে। সাধনা শেষে তারপর আবার ফিরে আসবে আমার কাছে। তবে দীর্ঘদিন তোমাকে একা একা চলতে হবে। তুমি সুন্দরী, তরুণী ভৈরবী। দুর্গম পথে চলায় প্রতিপদে বিপদ আছে। এ-জন্য ভয় করছে কি?

মাতঙ্গী মায়ী বললেন, মহামায়ার কৃপায় এবং আপনার আশীর্বাদে বিপদ আমি অতিক্রম করতে পারব এ-বিশ্বাস আমার আছে। তাছাড়া আমি তো কখনও একা নই। আমি ধ্যানে বসলেই যে আপনাকে প্রত্যক্ষ করতে পারি।

মার্তণ্ড মহারাজ হেসে বললেন, কুলকুণ্ডলিনী শক্তি তোমার মধ্যে ঊর্ধ্বগতি হয়েছে বলেই তোমার পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছে। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হলে সাধক সাধিকার কোন ভয় থাকে না। তোমারও তাই কোন ভয় নেই। তবুও এই পরিব্রাজনের জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে।

মাতঙ্গী বললেন, আপনি কি আমার সঙ্গে কাউকে দেবার কথা চিন্তা করছেন গুরুজী?

—না।

—তবে?

—'কোন মানুষ সঙ্গী নয়। তোকে আমি একটা জিনিষ দেব

বিপদে আপদে যা তোকে রক্ষা করবে।' মার্তণ্ড মহারাজ একটা মাঝারী গোছের অষ্টধাতুর ত্রিশূল বের করলেন। হাতে তুলে দেবার আগে কমণ্ডুলের জলে ধুয়ে ধুনির কিছুটা ভস্ম তাতে মেখে দিলেন। তারপর মন্ত্রপুত করে সেই ত্রিশূলটা মাতঙ্গী মায়ীর হাতে তুলে দিয়ে বললেন: বিভূতি চর্চিত এই ত্রিশূলে আমি শক্তি সঞ্চারিত করে দিলাম। এ ত্রিশূল কখনও হাতছাড়া করবি নে। দুষ্ট লোক তোর পেছনে লাগলে এই ত্রিশূলই তোকে রক্ষা করবে। বিপদের সময় এ ত্রিশূল স্পর্শ করলে এর শীর্ষদেশ থেকে তিনটি অগ্নিশিখা নির্গত হয়ে শত্রুকে ভস্মমাৎ করে দেবে।

মাতঙ্গী মায়ী বললেন, আপনার অপরিসীম করুণার তুলনা নেই; কিন্তু একান্ন মহাপীঠের নির্দেশ আমি কোথা পাব?

মার্তণ্ডজী হেসে বললেন, যেমন করে মুনি ঋষিরা পেয়েছিলেন তুইও তেমনি ভাবেই পাবি। ধ্যাননির্মিতম। ধ্যানেই তোর কাছে একান্নমহাপীঠ উদ্ভাসিত হবে।

গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে মহামায়ার ইচ্ছাক্রমে মাতঙ্গী মায়ী জ্বালাজীর মন্দির ছেড়ে মহাতীর্থ একান্নপীঠের পরিক্রমায় বেরুলেন। যথার্থই তাঁর ধ্যাননেত্রে একে একে একান্ন মহাপীঠ উদ্ভাসিত হতে লাগল। তিনি বালুচিস্তানের হিংলাজ থেকে পূর্বভারতের কামাখ্যা কামরূপ এবং উত্তরে কাশ্মীর থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ ভারতের শ্রীশৈলম পর্যন্ত একে একে প্রায় চল্লিশটি পীঠ পরিভ্রমণ করে অবশেষে এলেন কলিতীর্থ কালীঘাটের পরম তীর্থে। নয়ন ভরে দেখলেন মহাবিশ্বরূপিনী কালিকা দেবীকে এবং পরম পুরুষ ভৈরব নকুলাশকে। পীঠনির্ণয়ের স্তোত্র মনে মনে আওড়ালেন:

'নকুলীশঃ কালীপীঠে দক্ষপাদাঙ্গুলী চ মে।
সর্বসিদ্ধিকরী দেবী কালিকা তত্র দেবতা॥

এই কালিকার অপরিসীম মূল্য তন্ত্র সাধনার ক্ষেত্রে। স্মরণাতীত কাল থেকে এই জগজ্জননী এখানে বিরাজিতা। বহ্মযামলে তাই বলা

হয়েছে 'কালিকা বঙ্গদেশে চ'। এই কালিকাকে ভজনা করলে তন্ত্র সাধনায় চূড়ান্ত সিদ্ধি। বামদেব ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত এই কালিকা বিগ্রহকে বার বার প্রণিপাত করলেন মাতঙ্গী মায়ী। তারপর নিগম-কল্পের পীঠমালায় কালীঘাটের যে সীমানা নির্দিষ্ট আছে তাই বলতে লাগলেন :

'দক্ষিণেশ্বরমারভ্য যাবচ্চ বহুলাপুরী।
ধনুরাকারক্ষেত্রঞ্চ যোজনদ্বয় সংখ্যকম ॥
ত্রিকোণে ত্রিগুণাকারং ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবাত্মকম।
মধ্যে চ কালিকাদেবী মহাকালী প্রকীর্ত্তিতা ॥
নকুলিশ ভৈরব তত্র যত্র গঙ্গা বিরাজিতা।
কাশী ক্ষেত্রং কালী ক্ষেত্রমভেদোঽস্তি মহেশ্বর ॥'

ইত্যাদি।

তারপর দেবী আরাধনা ও শিবারাধনা সেরে গঙ্গা স্নান সমাপন করলেন। স্নানের পর নাটমন্দিরে বসে পরমশ্রদ্ধাভরে মহাকালীর হোম শুরু করলেন।

দেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকাকালীন দেহের নিয়ম তো মানতেই হবে। দীর্ঘ পথশ্রমে মাতঙ্গী মায়ী ক্লান্ত বোধ করছিলেন। সেইজন্য নির্জন কোন গৃহে সামান্য একটু বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করলেন তিনি। অবশ্য বিশ্রাম নামমাত্র, নির্জন গৃহে তিনি গুরুর নির্দেশে তন্ত্র সাধনা ও তপ-জপ-ধ্যান করতে চান। সেইজন্য একজন পাণ্ডাকে বললেন, বাবা, আজ মহানিশায়, রাতদুপুরে নির্জনে আমাকে একটি হোমক্রিয়া করতে হবে। ধ্যান মন্ত্র জপের জন্যও কয়েকদিন নির্জনতা প্রয়োজন। তুমি কালীক্ষেত্রের এই পবিত্র পরিমণ্ডলের কাছাকাছি আমাকে কোথাও একটা ঘর দিতে পারো? যথার্থই জনবিরল হওয়া চাই।

পাণ্ডাটি ছিল প্রকৃতই ধর্মভীরু। সে বলল, সেজন্য ভাবনা নেই মা তোমার। কেওড়াতলা শ্মশানের দক্ষিণ দিকে মহীশূর সরকারের

প্রকাণ্ড এক বাগান বাড়ি আছে। কয়েকটা ছোট ছোট শিবমন্দির ও ছোট ছোট কয়েকটি ঘরও আছে সেখানে। গঙ্গার দিকের একটি কামরা তুমি অনায়াসে নিতে পার। সেখানে কোন লোকজন নেই। তবে বহুদিন অব্যবহৃত থাকার জন্য নোংরা হয়ে আছে। গঙ্গাজলে ধুয়ে নিয়ে সেখানেই তুমি তোমার সাধনায় বসতে পার।

মাতঙ্গী মায়ী পাণ্ডার কল্যাণ কামনা করে সেই বাগান বাড়িতে চলে গেলেন। স্থানটি নির্জন ও নোংরা বটে, তবে তন্ত্র সাধনার ক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থান। মাতঙ্গী মায়ীর খুব পছন্দ হল। তিনি গঙ্গাজলে একটি ঘর ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিলেন। তারপর মন্দির সংলগ্ন বাজার থেকে হোমের প্রয়োজনীয় নানা উপাচার সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন। রাত্রির নিরন্ধ্র অন্ধকারে সেই কামরায় একটি প্রদীপ ধরিয়ে নিয়ে তিনি তাঁর হোমের প্রস্তুতি আরম্ভ করলেন।

কিন্তু বাগান বাড়িটি দিনের বেলায় নির্জন হলেও রাত্রিতে নির্জন ছিল না। রাত্রিবেলা একদল কুখ্যাত চোরগুণ্ডার আড্ডা ছিল এটা। গভীর রাত্রির নীরব মুহূর্তে তারা এখানে এসে তাদের চুরি ডাকাতির অর্থের ভাগ বাঁটোয়ারা করত। ভাগ শেষে চরস ও গাঁজা খেত। সেদিনও অন্ধকার রাত্রিতে তারা সেখানে এসে হাজির হল। বরং একটু আগেই এল তারা, কারণ কোথায় বড় রকমের একটা দা মেরেছিল সেদিন।

এই চরসখোর চোরগুণ্ডা দলের সর্দার ছিল বীরু চৌধুরী। পোড়ো বাড়িতে আসতেই একটা ছোট কামরা থেকে সে প্রদীপের আলো আসতে দেখলো। একটু বাদেই দেখল মন্দিরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে একটি স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটির বয়স অল্প। বেশ ভৈরবীর। কিন্তু রূপে অপ্সরী। যেমন গৌরকান্তি, তেমনি সুঠাম দেহশৈলী। এমন পরম রূপবতী রমণী, বীরু চৌধুরীর মনে সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক বাসনা উঁকি দিল। সমস্ত দেহ তার থর থর করে কাঁপতে লাগল কামনার তাড়নায়। এ হেন রমণীরত্ন তার চাইই। এমন নির্জন স্থান,

এমন একাকিনী রমণী, সে যদি তার ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে চায়, কে আটকাবে তাকে ? বীরু চৌধুরী আবেগের উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল। তাড়াতাড়ি সে ভাগ বাঁটোয়ারা সেরে নিল। চরসের মজলিসও সত্বর ভেঙ্গে দিল। সবাইকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিয়ে একা মন্দিরের সোপানে বসে থাকল।

মাতঙ্গী মায়ী ইতিমধ্যে ঘরের ভিতর নানা উপাচার সাজিয়ে বসছেন। হোমকুণ্ডও জ্বালিয়ে নিয়েছেন। বীরু চৌধুরী সোপানে বসে অধৈর্য হয়ে উঠলেন। তরুণী রূপসী তন্ত্র সাধনা করেন এতে তার বিশ্বাস নেই। তার মনে হল, এ-সব ধাপ্পা। আসলে রক্তমাংসের গড়া সেও একটা মেয়েমানুষ। এ-সবের উর্ধ্বে সে অন্য কিছু নয়। একবার মনে হল ঘরে ঢুকে এসব ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে সে মেয়েটাকে ধরে আনে। অকারণে বিলম্ব অসহ্য। তবু কি জানি কেন, হয়তো অবচেতন মনের নির্দেশেই সে এতটা অগ্রসর হল না।

ওদিকে মাতঙ্গী মায়ী যথারীতি তাঁর হোমক্রিয়া করতে লাগলেন। হোমক্রিয়া শেষ হল রাত বারোটায়। এবার আগুন নেভাতে হবে। হোমের উপাচারগুলি সরিয়ে ঘর পরিষ্কার করে ফেললেন তিনি।

অনেক পরিশ্রম গেছে, রাতও অনেক হয়েছে। শরীর ক্লান্ত। নতুন কেনা মাদুরটা একপাশে বিছিয়ে নিয়ে গা এলিয়ে দিলেন মাতঙ্গী মায়ী। প্রদীপের আলোটা তেলের অভাবে ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। আগত অন্ধকারের কথা চিন্তা করতে করতে তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেই কখন নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

বীরু চৌধুরী ভেবেছিল তন্ত্র-কন্যাটি তার হোমক্রিয়া শেষ করে একবার বাইরে আসবেন। তখন তাকে ধরা যাবে। কিন্তু হোমক্রিয়া শেষ হলেও তিনি বেরুলেন না। ইতিমধ্যে প্রদীপের আলো ক্ষীণ হয়ে আসছিল। মাতঙ্গী মায়ী মাদুরের উপর গা এলিয়ে দিলেন, বীরু চৌধুরী তাও দেখল। কিন্তু মাদুরে গা এলিয়ে দিলেও মাতঙ্গী মায়ী দরজা বন্ধ করলেন না। তাহলে কি তন্ত্রকন্যা তাকে দেখতে পেয়েছেন। ভৈরবী

ভৈরবী সম্পর্কে সে যা শুনে আসছে সেই রকম ভৈরবীই এ? বসনে ভৈরবী, কাজে আর দশজন মেয়েমানুষের মত? রক্তমাংসের দেহের ক্ষুধা সকলেরই আছে? সকলেই চায় দেহসুখ। দরজা খোলা রাখার কি কোন ইঙ্গিত আছে? মাঠে মাঠে যে মেয়ে একা ঘুরে বেড়ায় সে যে সতী সাধ্বী হবে এ বিশ্বাস বীরু চৌধুরীর নেই। আর ধৈর্য ধরে সে বসে থাকতে পারল না, হাতের সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। সে সরাসরি ঘরের ভিতর ঢুকে গেল।

অতুলনীয় এক সৌন্দর্যের প্রতিমা অসাড় হয়ে পড়ে আছে। যৌবন যেন ভরা নদীর মত কানায় কানায় ফুলে উঠেছে। বীরু চৌধুরী কামনার আগুনে টগবগ করে ফুটছিল এতক্ষণ। এবার যেন তার লালসার ফেনা উপছে পড়ল। সে মাতঙ্গী মায়ীর মাদুরের দিকে এগিয়ে গেল।

অতীন্দ্রিয় জগতের সাধনায় যাঁরা ব্রতী, তাদের স্থূলদেহে ক্লান্তি এলেও সূক্ষ্মদেহে চেতনা সব সময়ই জাগ্রত থাকে; চর্মচক্ষু মুদে এলেও সূক্ষ্মচক্ষু তাকিয়ে থাকে। তাঁদের কখনও অপ্রস্তুত করা যায় না। তাঁদের অজ্ঞাতসারে কখনও কোন কাজও করা যায় না। বাবা মহারাজ একেই বলতেন তৃতীয় নয়ন। সাধনার সিদ্ধি লাভ করে মাতঙ্গী মায়ীর মধ্যে তৃতীয় নয়ন জাগ্রত হয়েছিল। নরকের ক্রিমিকীট বীরু চৌধুরীর পক্ষে তা বোঝা কোনদিনই সম্ভব নয়। সাধারণ সৎ গৃহস্থও যদি সে হত, তাহলেও সে মাতঙ্গী মায়ীর দেহে ঐশ্বরিক বিভূতি লক্ষ্য করতে পারত। কিন্তু তার কামার্ত দেহে সন্ন্যাসিনীর উজ্জ্বলতনু ভোগের সামগ্রী হিসেবেই প্রতিভাত হয়েছিল। সেইজন্যই সে নির্দ্বিধায় এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এগিয়ে যেতেই বুঝল, মাতঙ্গী মায়ী অজ্ঞান অসাড় নন। মানুষের পায়ের শব্দ পেতেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন, কে? কে? খবরদার! শুয়ে ছিলেন, উঠে বসলেন তিনি। অন্ধকারের মধ্যেও স্পষ্ট দেখতে পেলেন একটা কামার্ত মানুষকে।

কিন্তু বীরু চৌধুরী থামবার পাত্র নয়। সে যথার্থই অন্ধ। সন্ন্যাসিনীর দেহের দিব্যজ্যোতি তার চোখে পড়ল না। সে বলল, গোলমাল কোরো না। চিৎকার করে লোকজন জড় করবার চেষ্টা করে লাভ নেই। এ তল্লাটে হেন লোক নেই যে আমাকে বাধা দেবে। তা ছাড়া তুমি যখন তরুণী ভৈরবী, তরুণ ভৈরবেরও তোমার দরকার! এর আগে যে তুমি কোন ভৈরবের সঙ্গে থাকনি তা তো নয়। আর একটা ভৈরব জুটলে এত আপত্তি কিসের! বরং যে-কটা দিন কালীঘাটে আছ আমাকেই ভৈরব করে নাও। দেহ মনেরও শান্তি পাবে। তাছাড়া আখেরেও কিছু হবে। বীরু চৌধুরী ফালতু পার্টি নয়। তাছাড়া তন্ত্রের প্রয়োজনে ভাল মদও পাবে। মদ আর মৈথুনও তো তন্ত্রের জন্য প্রয়োজন!

মাতঙ্গী মায়ীর চোখ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল। তিনি বললেন, —নরপশু, তুই আগুন নিয়ে খেলতে চাস? মরবি।

বীরু চৌধুরী বলল, রূপসী রমণীর যৌবন তো আগুনেরই মত। তাতে কে না ঝাঁপ দেয়।

মাতঙ্গী মায়ী গর্জে উঠলেন, বেশ, মর্ তবে।

—এই তো সুন্দরী, কাছে এস। বীরু চৌধুরী দুই হাত বাড়িয়ে কাছে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল। ঠিক সেই মুহূর্তে সে মাতঙ্গী মায়ীর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেল।

মাতঙ্গী মায়ী গুরুর দেওয়া সেই ত্রিশূলটি হাতে নিয়ে তাঁরই শেখানো মন্ত্র আওড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে গেল। তৎক্ষণাৎ ত্রিশূলের তিনটি ফলা থেকে ছুটে বেরুতে লাগল লেলিহান অগ্নি। সে ধরনের ভয়ঙ্কর আগুন চোখেও দেখা যায় না। আকাশের বিদ্যুৎকে পর্যন্ত চমকে দিয়ে তীব্র নীল আলোর স্রোত বেরিয়ে এল। একটা আলোর শিখা ভুজঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল বীরু চৌধুরীর সারা দেহে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। 'বাঁচাও! বাঁচাও! বলে আর্তরব তুলে বীরু চৌধুরী ঘর থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল

পাগলের মত। কাছাকাছি ছিল এক সাকরেদের বাড়ি। প্রাণপণে ছুটে সেখানে গিয়ে উঠল সে। তারপর সাকরেদের সাহায্যে অনেক কষ্টে আগুন নেভাল। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। সারা গায় হয়ে গেছে দগদগে ঘা। অসহ্য যন্ত্রণা। হাত, পা, বুক, জননেন্দ্রিয় আগুনে পুড়ে কুষ্ঠরোগের মত হয়ে গেছে।

বীরু চৌধুরীর চিৎকারে লোকজন জুটে গেছিল চারদিকে। এই অগ্নিদাহের কথা আর অজ্ঞাত রইল না কারো কাছে। কারণটাও জেনে ফেলল সবাই। কারো বুঝতে বাকী রইল না যে, তরুণী ভৈরবী মস্ত বড় সিদ্ধাই। তাঁর মন্ত্রপূঃত ত্রিশূলের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত কালীঘাট অঞ্চলে। মাতঙ্গী মায়ীকে দেখার জন্য ভিড় জমে গেল। বীরু চৌধুরীর মত অসুরকে যিনি দমন করেছেন, তিনি স্বয়ং অসুর নাশিনী দুর্গারই মত।

দুর্গার উদ্ধত পদ বক্ষে ধারণ করেই অসুরের জ্ঞান হয়েছিল যে, তিনি আদ্যাশক্তি মহামায়া। বীরু চৌধুরী সিদ্ধাই ভৈরাবীর ক্রোধানলে দগ্ধ হয়ে বুঝলে যে, জগজ্জননীর প্রসাদপুষ্ট এই মাতঙ্গী মায়ী। যাঁর ক্রোধানল দগ্ধ করে, তাঁর করুণার স্নিগ্ধ দৃষ্টি তেমনই শান্তিও দিতে পারে। সেই করুণা প্রার্থনার জন্যই শেষপর্যন্ত বীরু চৌধুরী অগ্রসর হল। দুদিন পরে দুটি জওয়ান সঙ্গীর কাঁধে ভর দিয়ে বীরু চৌধুরী এল মাতঙ্গী মায়ীর কাছে। চোখে তার জল, মুখে বীভৎস যন্ত্রণার ছাপ। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে হাত জোড় করে বলল, মা, আমি তোর অধম ছেলে, আমাকে ক্ষমা কর, কৃপা কর। আমি অধঃপতনের শেষ ধাপে গিয়েছিলাম। লৌকিক অলৌকিকে ভেদ করতে চাই নি। তোর দণ্ডদানে আমার শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে। আমাকে ক্ষমা কর মা। পাপের পথ আমি ছেড়ে দেব, আমায় আশীর্বাদ কর।

ঐশ্বরিক প্রকাশ যে মানুষের মধ্যে তাঁরাই হলেন বজ্রের চেয়ে কঠোর, আবার কুসুমের চাইতেও মৃদু। দুষ্টের দমনে তাঁরা ভয়ঙ্কর

হয়ে উঠতে পারেন সহজেই, আবার করুণাপ্রার্থী হয়ে গেলে মুহূর্তের মধ্যেই গলে যান। মাতঙ্গী মায়ীরও গলতে সময় লাগল না। 'মা' ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে যথার্থই তিনি মা হয়ে গেলেন। সমস্ত অপরাধ মুহূর্তের মধ্যে বিস্মৃত হলেন। বললেন, যখনই তোকে দণ্ড দিয়েছি, তখনই ক্ষমা করেছি। ভয় নেই। অধঃপতনের হাত থেকে তুই রক্ষা পেলি। কালীক্ষেত্র পরম পুণ্যক্ষেত্র, সতীমায়ের ডান হাতের আঙুল পড়েছে এখানে। পাপ তো এখানে প্রশ্রয় পাবে না বাবা। পাপ দমন হবে, আবার পাপীও উদ্ধার পাবে। দেখিস নে ৺মা দুয়ার অবারিত করে দিয়ে আছেন পাপীর স্পর্শ পাবার জন্য। পাপীর স্পর্শ নিয়ে তিনি যে পাপীকে তারণ করেন। তারণ করেন বলেই না তিনি, তারা, তারিণী।

বীরু চৌধুরী বলল, মা, আমার এখন কি হবে?

মাতঙ্গী মায়ী বললেন, কেন, ঘা সারে নি?

বীরু বলল, না। ডাক্তার বদ্যি ফেল পড়েছে একটুও উপশম হচ্ছে না যন্ত্রণায়। নিম্নাঙ্গ অসাড় হয়ে আসছে। মা বলে ডেকেছি তোকে, তুই আমার মা তারিণী। মহিষাসুরকে নিধন করেও দেবী পাদস্পর্শ দিয়ে করুণা করেছিলেন। এই অধম পিশাচকে তুই করুণা কর।

চিম্‌টা দিয়ে পাশের ধুনি থেকে কিছুটা ভস্ম উঠিয়ে আনলেন মাতঙ্গী মায়ী। তারপর সেটা বীরুর হাতে দিয়ে বললেন, যা, বাড়িতে গিয়ে গঙ্গার জলে মিশিয়ে খেয়ে ফেলবি। ভয় নেই। পোড়া ঘা সেরে যাবে। সেরে উঠলে ৺মায়ের বাড়িতে এসে ৺মাকে স্পর্শ করে যাবি। পাপ স্খালন হবে।

বীরু বলল, মা, আবার কবে দেখা পাব তোমার?

মাতঙ্গী মায়ী বললেন, তোমাদের সঙ্গে শিগ্‌গীর আর আমার দেখা হবে না।

—কেন?

—কাল ভোরে উঠেই আমি রওনা হব বীরভূমের দিকে। বীরভূমে আছে একান্নপীঠের পাঁচ পাঁচটি পীঠ। সেখানে হোমক্রিয়া করব। আমি যে একান্নপীঠ পরিভ্রমণেই বেরিয়েছি বাবা। বীরভূম থেকে যাব পুরী। সেখানে দেখব মা বিমলাকে ও ভৈরব জগন্নাথকে, দেখব কালমাধবের কালীকে এবং ভৈরব আসিতাঙ্গকে। দেখব ময়ূরভঞ্জের অরণ্যে মা বারাহী এবং ভৈরব মহারুদ্রকে। দেখব বিরাট-দেশে মা অম্বিকা ও ভৈরব অমৃতাক্ষকে।

সকলে বলল, ৺মায়ের একান্নপীঠের সব পীঠই কি আপনার পরিদর্শন করা হয়ে গেছে ?

মাতঙ্গী মায়ী বললেন, শুধু বীরভূম ও উড়িষ্যার পীঠ কয়টি বাদে।

—একান্নপীঠে সাধনা করলে কি হয় ?

—মহাসাধনায় সিদ্ধি লাভ হয়।

—সাধারণ লোক যদি এই একান্নপীঠ পরিদর্শন করে ?

—তাদের অশেষ পুণ্য হয়।

—একান্নপীঠের হদিশ তো আমরা সবাই জানি না।

—জেনে নিতে হবে।

—কি ভাবে ?

—আমি যেভাবে জেনেছি।

—আপনি কি ভাবে জেনেছেন মা ?

—ধ্যানে। যোগীরাও ধ্যানেই একান্নপীঠ উদ্ধার করেছিলেন—ধ্যান নিমিত্তম।

—আমরা জানব কি করে ?

—৺মাকে ধ্যান কর, তিনিই জানাবেন।

—বাংলা দেশে কি কালীঘাটের পরে বীরভূমিই একান্নপীঠের বাকী পীঠগুলি রয়েছে ?

—না। পূর্ববঙ্গে রয়েছে বরিশাল ও চট্টগ্রামে। উত্তরবঙ্গে বগুড়ায় ও জলপাইগুড়ির শালবাড়ি এবং জলপাইগুড়ি-ভূটান সীমান্তের

জয়ন্তীতে। বর্ধমানে রয়েছে উজ্জানী বা কোগ্রামে। কাটোয়ার কাছে ক্ষীরগ্রামে ও জুড়ানপুরে। মুর্শিদাবাদে আছে বড়নগরে। মেদিনীপুরে তমলুকে ও খুলনাতে ঈশ্বরীপুরে। এ-সবই আমার পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি পীঠেই আমি করেছি হোমক্রিয়া। এবার বীরভূম সেরে যাব পুরী। উড়িষ্যার পীঠ পরিভ্রমণ হলেই আমার একান্নপীঠ পরিক্রমা শেষ। আবার ফিরে যাব গুরুর কাছে জ্বালামুখীতে।

—আর কি বাংলাদেশে কখনও ফিরবেন না ?

—ফিরব, কেউ যদি আমাকে মনে প্রাণে স্মরণ করে।

বীরু চৌধুরী বলল, আমি করব মা।

মাতঙ্গী মায়ী বললেন, আমার দেখা পাবে বাবা। তোমার সুমতি হয়েছে। মহামায়ার কৃপাতে এই সুমতি থাকবে। বিপদে পড়ে আমাকে ডাকলেই দেখা পাবে বাবা।

কে যেন আরও কি একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল। মা বললেন, এখন আর কোন কথা নয় বাবা। আমি ধ্যানে বসব, আমাকে একটু নিরিবিলিতে থাকতে দাও।

মাতঙ্গী মায়ীর শেষ কথা শুনে একে একে ভিড় কেটে গেল। বীরু চৌধুরীও চলে গেল। মাতঙ্গী মায়ী যথার্থই ধ্যানে বসলেন।

বীরু চৌধুরী সত্যসত্যই ভাল হয়ে উঠল তিনদিনের মধ্যে। মাতঙ্গী মায়ীর নির্দেশ মত যন্ত্রণামুক্ত হয়ে কালীঘাটে এসে মায়ের মন্দিরে বিগ্রহ স্পর্শ করে পাপমুক্ত হল। তারপর কৌতূহলযুক্ত হয়ে সেই বাগান বাড়িতে আর একবার গেল মাতঙ্গী মায়ী আছেন কিনা তাই দেখতে। কিন্তু তিনি ততক্ষণে কলকাতার সীমানার বাইরে। গৃহী লোকেরা সংসারে তবু দু'দণ্ড বসে কিন্তু সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী তো নদীর স্রোত, শুধু প্রবাহ, প্রবাহ আর প্রবাহ। স্থির হয়ে যখন তাঁরা কোথাও বসেন তখন সাগর হয়ে যান। সাগরের আর গতি কোথায় ? মাতঙ্গী মায়ী সিদ্ধাই তন্ত্রকল্পা বটে, তবে সাগর হননি। এখনো সাগরের

পথে। নদীর মৃত্তিকা পরিক্রমা শেষ হলেই সাগর। পুরী ও উড়িষ্যার অন্যান্য পীঠ পরিক্রমা শেষ হলেই মাতঙ্গী মায়ী জ্বালামুখীতে গিয়ে সাগরে পড়বেন।

কোন যানবাহন নয়, পায়ের উপর ভরসা করেই মাতঙ্গী মায়ীর অভিযাত্রা। সুতরাং আরও বছর দেড়েক লাগল তাঁর একান্নপীঠের বাকী পীঠগুলি পরিভ্রমণ করতে। বছর দেড়েক পরে অবশেষে তিনি গুরুজী মার্তণ্ড মহারাজের কাছে ফিরে এলেন জ্বালামুখীতে।

যত তীর্থভ্রমণ, যত সাধনাই করা যাক না কেন, গুরুর সান্নিধ্য এক অতুলনীয় সিদ্ধি। গুরু মহারাজের কাছে ফিরে এসে যেন মাতঙ্গী মায়ীর সাধনায় ফুল ফুটে উঠল। সারা দেহে এক অপূর্ব জ্যোতি দেখা দিল। গুরুর কাছে একান্ন সতীপীঠ ভ্রমণের সকল অভিজ্ঞতা খুলে বললেন মাতঙ্গী। তাঁর আশীর্বাদ না থাকলে দুর্গম পথে, গিরিকন্দরে, মানুষ-পিশাচের মধ্যে নিরাপদে তীর্থ পরিক্রমা করে ফিরে আসে সম্ভব হত না। গুরু তাঁর অধ্যাত্ম জীবনে শুধু পথিকৃৎ নন, সহায় এবং সিদ্ধিও। তথাপি গুরুজী এখনও তাকে পূর্ণাভিষিক্ত করেন নি; এবার সেই শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষমানা মাতঙ্গী মায়ী।

গুরুজীও মাতঙ্গী মায়ীকে দেখে বুঝলেন যে, যে কৃচ্ছ্রসাধনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁকে, সেই কৃচ্ছ্রসাধন, পরিব্রাজন, ধ্যান, জপ ও হোমের সুফল তাঁর মধ্যে ফলেছে। তাই তিনি এবার তাঁকে পূর্ণাভিষিক্ত করা স্থির করলেন। সাধনার চূড়ান্ত সিদ্ধি সেই পূর্ণাভিষেকের মধ্যে। তাই তিনি মাতঙ্গীকে বললেন, মায়ী, আগামী শিবচতুর্দশী এক মহাপুণ্য তিথি। আমি স্থির করেছি যে, সেই পুণ্য তিথিতে তোমাকে পূর্ণাভিষিক্ত করবো। সেই হবে তোমার অধ্যাত্ম জীবনে আমার শেষ দীক্ষা। আবার তোমাকে কৃচ্ছ্রসাধন করতে হবে দীর্ঘ বার বছর। কিন্তু সে সাধনা জ্বালামুখীতে নয়। সে-সাধনা করতে হবে কাংড়াতে। সেখানে আছে নবমুণ্ডির আসন। সেই আসনে বসে কঠোর জপতপ ও হোম করতে হবে।

মাতঙ্গী বললেন, আবার আপনাকে ছেড়ে, জ্বালামুখী ছেড়ে আমাকে যেতে হবে?

হেসে গুরুজী বললেন, আমাকে ছেড়ে কোথা যাবি ঙমা। আমাকে তুই ছাড়লেও আমি তো তোকে ছাড়তে পারব না। গুরুর দায়িত্ব যে গুরু দায়িত্ব। গুরু কি শিষ্যকে ছাড়তে পারে? পুত্র পিতাকে ত্যাগ করলেও পিতা তো পুত্রকে ত্যাগ করতে পারে না। আর তাছাড়া কাংড়াও মহাপীঠ মা। শাস্ত্রে একে বলে গুপ্তপীঠ। দেবীর বামস্তন পড়েছিল এখানে। দেবীর নাম ত্রিপুরমালিনী, ভৈরবের নাম ভীষণ। জ্বালামুখী থেকে দূরত্বও খুব বেশী নয়, মাইল বিশেক। জ্বালামুখীর সমস্ত মহিমাই সেখানে বিরাজমান। মধ্যযুগে জ্বালামুখী আর কাংড়াকে এক করেই দেখত সবাই।

কাংড়া দূরে নয় বটে, তবু আসন্ন গুরুবিচ্ছেদের কথা চিন্তা করে মাতঙ্গী মায়ীর চোখ দুটি যেন ছলছল করে উঠে। তিনি বল্লেন, আপনার ছায়ায় বসে কি আমার কঠোর সাধনা করা সম্ভব নয়?

গুরু বললেন, নারে বেটি। তাহলে আর দূরে তোকে ঠেলব কেন। শক্তি সাধনায় এক একটা পর্যায় আছে। নির্দিষ্ট একটা বিধিবিধান আছে। আমাকেও কাংড়ার পবিত্র পীঠে দীর্ঘদিন সাধনা করতে হয়েছিল। মন্দিরের কাছেই জঙ্গলের মধ্যে আমার সেই আসনটি রয়ে গেছে। নবমুণ্ডির আসন। বড় জাগ্রত মা। এবার সেখানে গিয়ে বার বছরের জন্য তোকে বসতে হবে। সাধনার এই ক্রমটি শেষ হলেই জ্বালামুখীতে স্থায়ী হয়ে বসবি। তখন তোর সব অভীষ্টই পূর্ণ হবে।

মাতঙ্গী বললেন, এই দীর্ঘ বার বছর আর কি আপনার দেখা পাব না? মার্তণ্ড মহারাজ বললেন, নিশ্চয়ই পাবি মা। আমার আরও কয়েকজন সাধনরত শিষ্য রয়েছে সেখানে। তাদের জন্য যে মাঝে মাঝেই আমাকে সেখানে যেতে হয়। তা ছাড়া তোকে আরও অনেক নিগূঢ় নির্দেশ দেবার প্রয়োজন আছে বলেও আমাকে যেতে হবে।

মাতঙ্গী বললেন, আপনার চরণ আমার ভরসা। আমি জানি, আপনি আমাকে পরিত্যাগ করবেন না।

হেসে গুরুজী বললেন, ভরসা মহামায়ার চরণ মা। এই বিশ্বপ্রকৃতি মহামায়ার লীলা। তাঁর করুণা না হলে তাঁকে ভেদ করে কেউ সত্যের সন্ধান, পরম পুরুষের সন্ধান লাভ করতে পারে না। তাঁকে স্মরণ করতে হবে।

মাতঙ্গী চুপ করে থাকলেন।

গুরুজী মহারাজ বললেন, কাংড়ার মন্দিরের প্রধান পুজারীর নাম মহামায়া প্রসাদ। সে আমার ভক্ত। আমার কাছে সে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সাধন ভজন করে চলেছে। তোর কথা আমি তাকে বলে রেখেছি। নবমুণ্ডির আসনের পাশে সে তোর জন্য কুঠিয়াও তৈরি করে রেখেছে। সুতরাং অসুবিধা কিছুই হবে না। তা ছাড়া আমার মন্ত্রঃপূত ত্রিশূল তো তোর কাছে রয়েছেই। এই ত্রিশূল থাকতে কেউ তোর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

মাতঙ্গী মায়ী বললেন, সে আমি জানি। সে প্রমাণ আমি কালীঘাটে পেয়েছি।

—তাহলে তোর মনে আর কোন দ্বিধা নেই মা?

—না।

—তাহলে যাবার জন্য তৈরী হও।

—হ্যাঁ বাবা।

মার্তণ্ড মহারাজ আর বিলম্ব করলেন না। নির্দিষ্ট চতুর্দশীর পুণ্য তিথিতে পূর্ণাভিষেকে অভিষিক্ত করলেন তাঁকে। অভিষেকের পরের দিনই মাতঙ্গী মায়ী জ্বালামুখী ত্যাগ করে কাংড়া চলে গেলেন।

মাতঙ্গী মায়ীর এইবার জীবনের সবচেয়ে কঠোর পরীক্ষা। গুরু মহারাজের পুরানো সিদ্ধাসনে বসে তিনি কঠোর সাধনা আরম্ভ করলেন। এই সাধনার সময় দিনে একবারমাত্র মাতঙ্গী মায়ী তাঁর সাধনকুঠী থেকে বাইরে যেতেন। অন্ন সংস্থানের জন্য মাত্র একটি বা

দুটি গৃহস্থ বাড়িতে ভিক্ষা করতেন। রাতে মহামায়া প্রসাদ তাঁকে দেবী ত্রিপুরমালিনীর যে সামান্য ভোগ দিতেন,- তাতেই রাতের আহার সারতেন। রাতের আহার ছিল শুধুমাত্র দুখানা পুরি ও ঘুগনি।

মাতঙ্গী মায়ীর নিজের মধ্যেই ছিল অদ্ভুত ত্যাগ ও তিতিক্ষা। এ তাঁর প্রাক্তন সাধনার সঞ্চয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন গুরু মার্তণ্ডজীর আশীর্বাদ। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই সাধনায় সিদ্ধিলাভের অপরূপ দীপ্তি ফুটে উঠতে লাগল তাঁর দেহের রেখায় রেখায়। অনায়াসে ষটচক্র ভেদ করে মূলাধারস্থ শক্তিকে তিনি সহস্রারে নিয়ে যেতে পারলেন। স্তরে স্তরে পার্থিব জগৎ রূপ বদলাতে লাগল তাঁর কাছে। অবশেষে বস্তু ও অবস্তুর পার্থক্যহীন অক্ষয় অব্যয় অনন্ত স্নিগ্ধতার জগৎ উপলব্ধি করলেন তিনি। শেষে মনকে এমন নিয়ন্ত্রিত করলেন যে, ইচ্ছামাত্র পার্থিব চেতনা অপার্থিব চেতনার সঙ্গে মিশে যেতে লাগল। অর্থাৎ চিন্তামাত্র তিনি সমাধি লাভ করতে লাগলেন। ইচ্ছামাত্র অনুভব করতে পারলেন তুরীয় ও তুরীয়াতীত জগতের ভাব। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহের মধ্যে অতীন্দ্রিয় জগতের আলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। সুগন্ধি ফুলের যেমন বিজ্ঞাপনের দরকার হয় না, অলিরা এসে আপনিই জোটে, তেমনি মাতঙ্গী মায়ীর অলৌকিক সিদ্ধির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে পুণ্যার্থীরা আসতে লাগল এই মহাসাধিকাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য। এ সময়ে যাঁরা মাতঙ্গী মায়ীর দর্শনপ্রার্থী হয়ে আসতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন দু'জন প্রবাসী কৃতি বাঙ্গালী। একজন জালন্ধরের বাঙ্গালী অধ্যাপক বিষ্ণুচরণ সমাদ্দার এবং অপরজন লাহোরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার কালীভূষণ মুন্সী।

মাতঙ্গী মায়ীকে দেখার জন্য সবচেয়ে বেশী ভিড় হত রামনবমী তিথিতে। রামনবমী তিথিতে কাংড়ার ত্রিপুরমালিনীর মন্দিরে তন্ত্র-মতে পবিত্র হোম হত। সেই হোম উপলক্ষ্যে মন্দিরপ্রাঙ্গণে বিরাট মেলা বসত। এই মেলাতে আসত মাতঙ্গী মায়ীর বহু বিশিষ্ট বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী ভক্ত। এদের মধ্যে অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও ছিলেন।

তাঁরা মাতঙ্গী মায়ীর সঙ্গে সাধনমার্গের কথা বলে, দর্শন নিয়ে আলোচনা করে তৃপ্তি পেতেন। সাধনায় যাঁরা সিদ্ধি অর্জন করেন, তাঁদের কাছে দুরূহ জ্ঞানের তত্ত্ব আপনা আপনিই খুলে যায়। নিরক্ষর রামকৃষ্ণ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন। যিশুখ্রীষ্ট পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। বস্তুতঃ একমাত্র সাধক ব্যক্তির কাছেই সত্যের নতুন নতুন দিক আপনা আপনি উদ্ভাসিত হয়। বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার যাঁরা করেন, তাঁরা আপন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার দ্বারাই তা সম্ভব করেন। অধ্যাত্ম পুরুষেরাও আপন হৃদয়কে মেলে দিয়েই সত্যের সন্ধান পান। উপনিষদ্‌কারেরা নিজেদের হৃদয়ে স্বত উদ্ভাসিত সত্য অনুভব করেছিলেন। বেদের শ্লোকও কবি-হৃদয়ের অনুভূতিতে ধরা দিয়েছিল আপনা আপনিই। সেই জন্যই তাঁদের কাছে মনে হয়েছিল, বেদ অপৌরুষেয়। যথার্থ এই সমস্ত সৃষ্টিই পার্থিব অর্থে অপৌরুষেয়। কিন্তু পরম অর্থে সবই পৌরুষেয়। কারণ একমাত্র পুরুষ ছাড়া আর কারোই কোন কিছু করা সম্ভব নয়।

সে যাই হোক, উচ্চাঙ্গের সাধিকা হিসেবে মাতঙ্গী মায়ীর খ্যাতিও অল্প দিনের মধ্যেই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। জ্ঞানের মধ্যে অদ্ভুত পূর্ণতা লক্ষ্য করা গেল তাঁর ভিতর। বড় বড় পণ্ডিত, পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানে শিক্ষিত ব্যক্তি, সবাই মাতঙ্গী মায়ীর সঙ্গে আলোচনা করে নিজেদের জ্ঞানের দৈন্য অনুভব করতে পারলেন। মনীষী ম্যাক্স মূলার এক সময় রামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তাঁর তুলনায় ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদেরাও অন্ধকারে আলোক প্রত্যাশী। এই সব পণ্ডিত ব্যক্তিও মাতঙ্গ মায়ীর সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে পারলেন যে, জ্ঞানের ধ্বজা ধারণ করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। নিউটনের মত জ্ঞানসমুদ্রের তীরে নুড়ি কুড়িয়েছেন মাত্র। রত্নাকর মহাসাগরের সমস্ত আকরই সংগ্রহ করেছেন মাতঙ্গী মায়ী।

মাতঙ্গী মায়ীর কাংড়াতে সাধনা করার কথা ছিল বার বছর। কিন্তু তিনি সেখানে একাদিক্রমে চোদ্দবছর সাধনা করলেন। তন্ত্র সাধনার

অধিকাংশ গুহ্য রহস্য তাঁর কাছে ভেদ হয়ে গেল। এখন তিনি সিদ্ধ সাধিকা। মার্তণ্ড মহারাজ সবই লক্ষ্য রাখছিলেন। যেই মুহূর্তে তিনি বুঝলেন যে, মাতঙ্গী মায়ীর সাধনাতে কোন খুত্ নেই, ত্রুটি নেই, তিনি তাঁকে আহ্বান করে আবার নিয়ে এলেন নিজের কাছে জ্বালামুখীতে। মার্তণ্ড মহারাজের শরীরও এ-সময় ভাল যাচ্ছিল না। শরীর ক্রমশঃ জীর্ণ হয়ে আসছিল। তিনি প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। মাতঙ্গী এসে গুরুজীকে এই অবস্থাতে দেখে যেন ভেঙ্গে পড়লেন। তাঁর সাধনসিদ্ধ অনুভবের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে তিনি অমঙ্গলের সাড়া পেলেন : তাহলে কি গুরুজী তাঁদের ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন! তাঁর চোখেমুখে সেই চিন্তার ছায়া ফুটে উঠল। গুরুজী তা লক্ষ্য করে বললেন, তুই ঠিকই ধরেছিস বেটি। এবার আমাকে এই মরদেহ রাখতে হবে। আমার সামান্য যা কিছু দায়িত্ব ছিল তোদের মধ্য দিয়ে তা পালন করেছি। তোকে দেখে আমি প্রসন্ন চিত্তে বিদায় নিতে পারব এই ভেবে যে, কৌলসিদ্ধির কঠিন স্তরগুলি তুই অতিক্রম করতে পেরেছিস। অনেক পেয়েছিস তুই। তবু শক্তি সাধনার শেষ সিদ্ধিটি আমি তোকে দেইনি। এবার সেটুকু দিয়ে পরম পরিতৃপ্তিতে বিদায় নিতে চাই। এই জ্বালামুখী পীঠে রয়েছে জগন্মাতার মহাশক্তি, ব্রহ্মবিদ্যা ও পরাচৈতন্য। এখানে আমার আসন হল সেই মহাসিদ্ধির আসন। এখন থেকে আমার এই আসনে বসে তুই সেই পরাচৈতন্যের সাধনা কর? জগজ্জননী নিজেকে অতিক্রম করার ছাড়পত্র দেবেন এখান থেকেই। আশা করি সাধনার শেষ স্তরও তুই অতিক্রম করতে পারবি।

সহস্রারে পরম পুরুষের স্বাদ অনুভব করেছেন মাতঙ্গী মায়ী। জগজ্জননীর অনুমতিপত্র তো সেখানেই পাওয়া গেছে। তূরীয় পর্যায়ের স্বাদ অনুভব করেছেন মাতঙ্গী। তাহলে জগজ্জননীকে অতিক্রম করার ছাড়পত্র বলতে কি বোঝাতে চাইছেন গুরুজী। তাহলে এই পর্যায়কেই কি বলা হয় তূরীয়াতীত পর্যায়! যাকে তন্ত্রে বলা হয়েছে পরমশিব? চেতনা তখন বিন্দুরও অতীতে। মাতঙ্গী মায়ী পরাবিন্দুর স্বাদ অনুভব

করেছেন, কিন্তু বিন্দুর অতীত পরম শান্ত সেই শিবকে অনুভব করেন নি, বাহ্ব ঋষি উপনিষদে যাকে বলেছিলেন 'শান্তো ইয়ম আত্মা'। তূরীয়াতীত পরম শিব হলেন মহাবিকাশের প্রথম কেন্দ্র, শান্ত। সে অনুভব হলে জন্ম জন্মান্তরের খেলা আর হয় না। গৌতম বুদ্ধের মহা নির্বাণের মত পরম মুক্তি লাভ করা যায়।

গুরুজী মহারাজের নির্দেশে সেই সর্বশেষ আসনেও বসলেন মাতঙ্গী মায়ী। কর্ষিত এবং উর্বর ভূমিতে বীজ পড়লে যেমন ফসল ফলতে সময় লাগেনা, তেমনি গুরুর কৃপায় সবদিক থেকে প্রস্তুত সাধিকা মাতঙ্গী মায়ীরও তূরীয়াতীত পরম শিব পর্যায়ের মহাশান্তি লাভ করতে বিলম্ব হলনা। পরম শান্ত আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করে মাতঙ্গী মায়ী মহাসাধিকা হিসেবে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত জ্বলতে লাগলেন। শুধুমাত্র স্থানীয় সাধকদের মধ্যেই নয়, উত্তর ভারতের বহু তন্ত্রসিদ্ধ সাধকের মধ্যেও সাড়া তৈরি করলেন একের পর এক। নানা স্থান থেকে অভিনন্দন আসতে লাগল। কাংড়া, হিমাচল, জালন্ধর, জম্মু ও লাহোর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু জিজ্ঞাসু ও ভক্ত নরনারী শ্রদ্ধাভরে দর্শন করতে আসতেন এই সিদ্ধা তপস্বীকে।

মাতঙ্গী মায়ী জ্বালামুখীতে আসার বছর খানেক পরে মার্তণ্ড মহারাজ পূর্ব নির্দিষ্ট লগ্নে তাঁর মরদেহ ত্যাগ করেন। তবে মৃত্যুর আগে জেনে যান যে, তাঁর সাধনপীঠ উত্তরাধিকারীহীন নয়। মাতঙ্গী মায়ী অধ্যাত্ম সাধনার দীপ জ্বেলে রাখবেন সেখানে। সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মার্তণ্ড মহারাজের লোকান্তরে তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের মধ্যে একটা শোকোচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছিল। এতবড় একজন মহাপুরুষের অভাব জীবনে হয়তো কখনও পূরণ হবার নয়। কিন্তু সেই ক্ষোভ তাঁদের বেশীদিন থাকল না। জ্বালাজীর অধ্যাত্ম সমাজে অল্পদিনের মধ্যেই মাতঙ্গী মায়ী গুরুজীর সেই অভাব পূরণ করে দিলেন। মার্তণ্ড মহারাজের সিংহাসনে বসলেন তিনি নিজেই। সকলে তাঁকে মেনেও

নিল। মেনে নিল এই কারণে যে, অধ্যাত্ম সাধনায় তাঁর সন্দেহাতীত যোগ্যতাই তাঁকে এই আসনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিল। আর তাছাড়া সর্বসমক্ষে গুরুজীই তাঁকে এই আসনের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন। মার্তণ্ড মহারাজ তাঁকে এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন এই কারণে যে, ত্যাগ, প্রতীক্ষা, জপতপ সাধন মার্গের সমস্ত কৃচ্ছ্রসাধনার পথেই পরীক্ষা দিয়ে মাতঙ্গী মায়ী উত্তীর্ণা। কারণ এ-সব সাধনায় উত্তীর্ণ না হলে মার্তণ্ড মহারাজ কাউকে বীজমন্ত্র দীক্ষা দিতেন না। মঠ মোহান্ত বা ঐ ধরনের কোন ধর্মীয় সংগঠনের প্রতি তাঁর ছিল নিতান্ত অনীহা। গুরুগিরির নামে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ার তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। সেই জন্য তাঁর অনুগামীর সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। তাঁর সাধক মণ্ডলী ছিল অত্যন্ত ছোট।

মাতঙ্গী মায়ী গুরুজী মহারাজের আসনে বসে তাঁর মহাপ্রয়াণের কয়দিন পরে জ্বালাজীর মন্দির প্রাঙ্গণে এক ভাণ্ডারার আয়োজন করলেন। ধনী ভক্ত ও রাজরাজড়াদের সশ্রদ্ধ সহযোগিতায় সহস্র সাধুসন্ত ও দীনদুঃখীকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করানো হল। তারপর গুরুজীর সাধন পীঠের মর্যাদা রাখার জন্য মাতঙ্গী মায়ী আরো গভীরতর অধ্যাত্ম সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন।

শাক্ততীর্থ হিসেবে জ্বালামুখীর বিশেষ রকম গুরুত্ব থাকলেও আয়তনে জ্বালামুখী তীর্থ খুব বড় নয়। কিন্তু পরিসরের উপর তো পীঠের গুরুত্ব নির্ভর করে না, করে তার জাগৃতির উপর। জ্বালামুখী পীঠ হিসেবে ছোট হলেও অত্যন্ত জাগ্রত। পুণ্যময় সেই প্রাচীন কাল থেকেই তার পুণ্যের কাহিনী প্রচলিত। অলৌকিক পুণ্যস্থান হিসেবে হিন্দু মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধা কুড়িয়েছে জ্বালামুখী। সেইজন্য বহু উচ্চকোটির তান্ত্রিক সাধকদের এখানে আনাগোনা। শাক্তসাধক ও মাতৃ আরাধকরাই এখানে বেশী করে সমবেত হন। দলে দলে আসেন শাক্ত ভক্তেরাও। দেবীদর্শন, তীর্থ পরিভ্রমণ, যাগযজ্ঞ ও পূজা আরাধনা করে আবার তাঁরা ফিরে যান।

লাহোরের বাঙ্গালী ডাক্তার কালীভূষণ মুন্সীও এই মহাশক্তিপীঠে বার বার আসতেন। অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল তাঁর জ্বালামুখীর এই মহাতীর্থের প্রতি। প্রায় প্রতি ছ'মাস অন্তরই তিনি এখানে এসে দেবীপূজা ও হোম করতেন। মাতঙ্গী মায়ীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সীমা ছিল না। এখানে এলেই দু'চার দিন তাঁর সান্নিধ্যে থেকে যেতেন। সাধনমার্গ নিয়ে নানা কথা বলতেন। তন্ত্রের গূঢ় রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করতেন।

একবার ডাঃ মুন্সীর সঙ্গে কয়েকজন শিক্ষিত ভক্ত ও অধ্যাত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু ভক্ত এলেন। তাঁরা তন্ত্রসাধনা ও ধর্মতত্ত্বের নানা বিষয় আলোচনা করতে লাগলেন মাতঙ্গী মায়ীর সঙ্গে। তাঁদের অত্যন্ত জটিল প্রশ্নের খুব সহজ জবাব দিতে লাগলেন মাতঙ্গী মায়ী। এমন সহজভাবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসও তাঁর ভক্তদের সঙ্গে কথা বলতেন। আলোচনার ফাঁকে একবার ডাঃ মুন্সী জিজ্ঞেস করলেন, মায়ী, দশ-মহাবিদ্যার দেবীদের মধ্যে কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরীর সম্পর্কে কিছু অনুধাবন করতে পারি কিন্তু ছিন্নমস্তার রূপটি যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি দুর্বোধ্য। এই ভীতিপ্রদ মূর্তির অর্থ কি ?

মাতঙ্গী মায়ী হেসে বললেন, কালী তারা ভুবনেশ্বরীর মূর্তিও সাধারণের কাছে স্পষ্ট নয় বাবা।

—কেন ?

—তুমিই বল, কালী বলতে তুমি কি বোঝ ?

ডাঃ মুন্সী বললেন, কালী তমোময়ী প্রকৃতি, কার্যব্রহ্মা। নিষ্ক্রিয় মহাদেব রূপ পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় করছেন।

মাতঙ্গী মায়ী বললেন, কার্যব্রহ্মা বলতে তুমি কি বোঝ ?

ডাঃ মুন্সী তখন জবাব দিতে পারলেন না।

মাতঙ্গী মায়ী বললেন, এই কার্যব্রহ্মাই হলেন হিরণ্য গর্ভ। ঋগ্বেদে হিরণ্য গর্ভকে বলা হয়েছে কার্যব্রহ্মা ; অর্থাৎ অন্য কোন মহামানস সৃষ্ট মানস। সেই মহামানস হল কারণব্রহ্মা। এই কারণ ব্রহ্মাই

হলেন ঈশ্বর। কিন্তু তিনি সর্বেসর্বা নন। তাঁরও উপর হলেন ব্রহ্মাণ। এই কার্যব্রহ্মা কিন্তু প্রকৃতি নন, বিকৃতি। প্রকৃতি আরও উপরে। ব্রহ্মাণের গুণস্বরূপ বিকৃতির আগে যে প্রকৃতি, তিনি আবদ্ধা নন নিজের মায়াতে। তিনি তখন সর্বদর্শিনী, সর্বজ্ঞা, সর্বশক্তিমানা। সেই প্রকৃতিই সৃষ্টির উৎস, লয়েরও কারণ। তিনি ইচ্ছা করলে লয় হয়। তাঁর ইচ্ছায় লয় না হলে উৎসে গিয়ে মেলা যায় না। এই প্রকৃতির স্বরূপ অত্যন্ত দুরূহ। তাকে সহজে ভেদ করা যায় না। এই জন্য তিনি কৃষ্ণবর্ণা কালী। তিনি অনবরতঃ প্রসবকারিণী, অর্থাৎ তাঁর থেকে অনবরতঃ সৃষ্টি হচ্ছে, সেই জন্য তিনি উলঙ্গিনী। পুরুষের সঙ্গে অদ্ভুত সাম্যে অর্থাৎ সংযমে আছেন বলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়ম আছে। সেই সাম্যের প্রতীক রসনা, যাকে দন্তপংক্তিতে শাসন করছেন তিনি। তাঁর গলার নরমুণ্ডের মালা হল একান্ন বর্ণাক্ষরের প্রতীক। এই বর্ণাক্ষর কি না জানলে কালীতত্ত্ব বোঝা যায় না।

ডাঃ মুন্সী নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করে বললেন, আমার জ্ঞানের অহংকার ক্ষমা করবেন মায়ী। বর্ণাক্ষর তত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের বলুন।

মাতঙ্গী মায়ী বললেন, পরমপুরুষের মধ্যে অব্যক্ত ইচ্ছার স্ফুরণকেই বলে প্রকৃতি-পুরুষের সঙ্গম। এই সঙ্গম থেকে এক ধরনের আলোড়ন হয়। নানা বিচিত্র পরিমাপে সেই তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে মহাকাশে। তরঙ্গের প্রকৃতি ভেদে নানা বর্ণ। দৃশ্যবর্ণ, অদৃশ্যবর্ণ।

একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করলেন বর্ণ অদৃশ্য হয় কেমন করে?

মাতঙ্গী মায়ী হেসে বললেন, আলো অন্ধকারের মধ্যে পার্থক্য কি বল তো?

ডাঃ মুন্সী বললেন একটা ভাইব্রেশনের পার্থক্যের জন্যই আলো এবং অন্ধকার।

—কি রকম? মাতঙ্গী মায়ী ডাক্তার কালীভূষণ মুন্সীর দিকে তাকালেন।

ডাঃ বললেন, একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গের জন্য আলো দেখি। সেই তরঙ্গ বেশী বা কম হলে আলো দেখি না।

—তাহলে অন্ধকারের মধ্যেও তরঙ্গ আছে ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে অন্ধকারও একটা আলো একথা বলতে হয় না কি ?

—যিনি 'বর্ণ অদৃশ্য হয় কেমন করে', এই কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি লজ্জা পেয়ে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সেই রকম সৃষ্টি কতকগুলি অদৃশ্য ও দৃশ্য তরঙ্গের পথ ধরে শেষ পর্যন্ত বস্তুরূপ ধারণ করেছে। তন্ত্র বলে পঞ্চাশটি স্তর পার হয়ে একান্ন স্তরে এই বস্তু জগৎ। সেই একান্নটি স্তরের প্রতীক হল আমাদের অক্ষর সমূহ যাকে এই জন্য বর্ণমালাও বলে।

আশ্চর্য হয়ে সকলে মাতঙ্গী মায়ীর দিকে তাকালেন। এ ধরনের তত্ত্ব বর্ণনা তারা আগে শোনেন নি।

মায়ী বললেন, সেই একান্নটি তরঙ্গ বা বর্ণ বা অক্ষরই মায়ের গলায় ও হাতে শোভা পাচ্ছে মুণ্ড হয়ে। পঞ্চাশটি মুণ্ড গলায়, একটি হাতে। অর্থাৎ মূল প্রকৃতি মা এই একান্নটি তরঙ্গে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

সকলেই নতুন এক জ্ঞান লাভ করে বললেন, মায়ের মুণ্ডমালা সম্পর্কে নতুন জ্ঞান হল।

মাতঙ্গী মায়ী ডাঃ কালীভূষণের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিরে, তবে না কালীতত্ত্ব খুব বুঝেছিস ?

ডাঃ বললেন, অর্জিত বিদ্যা দ্বারা যে এ-তত্ত্ব বোঝা যায় না, তা এতক্ষণে বুঝলুম। এ-জন্য সাধনসিদ্ধ হতে হয়। এবার দয়া করে তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ইত্যাদি মূর্তির প্রতীকীরূপ ব্যাখ্যা করুন।

মাতঙ্গী মায়ী বললেন, কালী তারা ভুবনেশ্বরী মাতঙ্গী এরা হলেন দশ মহাবিদ্যা। তন্ত্রমতে এর আরো তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যাও আছে। সেই ব্যাখ্যা করছি শোন।

সকলে উৎসুক হয়ে মাতঙ্গী মায়ীর মুখের দিকে তাকালেন।

মাতঙ্গী মায়ী বলতে লাগলেন: প্রধান অব্যক্ত ব্রহ্ম থেকে ত্রিগুণের বিকাশ। এই অব্যক্ত ব্রহ্মকেই তন্ত্রে বলে কৃষ্ণশিব। অর্থাৎ যে শিব সম্পর্কে ধারণা করা যায় না। ইনিই পরম শিব। তুরীয়াতীত, শান্ত। তিনি মহাশান্ত। স্বত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে নিজের মধ্যে ধারণ করেন। তাঁর নিজের গুণও তখন অপ্রকাশ। সেই পরম শান্ত শিব থেকে অব্যক্ত কারণে ত্রিগুণের বিকাশ। অর্থাৎ সেই অব্যক্ত শান্তের মধ্যে অজ্ঞাত কারণে ইচ্ছার উন্মেষ হয়। ইচ্ছার উন্মেষ হলেই পরম পুরুষের সঙ্গে একাত্ম প্রকৃতির মধ্যে হয় আলোড়ন। একেই শাস্ত্রে বলে নাদ। তন্ত্রে এর প্রতীক হল শিবলিঙ্গ ও যোনি। এই যোনি ও লিঙ্গ থেকে অর্থাৎ গুণসাম্য প্রকৃতি বীজ থেকে প্রথম সৃষ্টি হয় স্বত্ত্ব প্রধান মহত্তত্ত্বের—শ্বেত শিব। প্রকৃতি তখন শিবের অর্ধাঙ্গ, রজোগুণান্বিতা রক্তবর্ণ ঈশ্বরী। মহত্তত্ত্ব বীজ থেকে স্বত্ত্বপ্রধান অহংকারতত্ত্বের বিকাশ। অহংকার তত্ত্বই হল অহংকৃতা অবিদ্যা। অহংকারপূর্ণ মায়া হল তমোগুণান্বিতা তমোসা। সৃষ্টিকালে প্রধানা প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট যে পুরুষ তিনিই সবগুণান্বিত মহত্তত্ত্বে প্রতিভাত ঈশ্বর। সেই মহত্তত্ত্বের 'প্রকৃতি' অংশ মহামায়া, রজোগুণান্বিতা ; সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্রীরূপে বিশ্ববীজ স্বরূপা। অহংকৃত অবিদ্যার উৎস, মহামায়া।

কর্মমতির সাধনকালে মহেশ্বরের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় প্রকৃতির। মহেশ্বর চান না প্রকৃতিকে ত্যাগ করতে। শক্তি তখন কর্মপথগামিনী, তাই কালকে ভীত করতে স্বরূপ প্রকাশ করেন। তখনই দেখা দেন দশ দিকে দশমহাবিদ্যা।

সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছিলেন, রুদ্ধনিশ্বাস ও রুদ্ধবাক হয়ে জানতে চেষ্টা করছিলেন। দশমহাবিদ্যার উৎপত্তির বর্ণনা শুনে নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। বললেন, এতক্ষণে দশমহাবিদ্যার স্বরূপ বুঝলুম।

স্মিত হাস্যে মাতঙ্গী মায়ী তখন দশমহাবিদ্যার প্রত্যেকের স্বরূপ বর্ণনা করতে লাগলেন। বললেন, দশমহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যা হলেন মহাকাশের শক্তিদায়িনী মহাশক্তি কালী। দ্বিতীয় মহাবিদ্যা অনন্ত-

দেশের অর্থাৎ তোরা যাকে ইংরাজীতে বলিস infinite space, তার প্রকৃতিরূপিণী, দেশ (Space)-শক্তি দ্বারা সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী। অনন্তশক্তি তারা তাই অনন্তনাগ বেষ্টিতা হয়ে ঋষিদের ধ্যানদৃষ্টির প্রতিমা। আকাশকেই বলে দেশ ও কাল। কালী এবং তারা হলেন সেই কাল ও দেশশক্তি। সর্বশক্তির আধার হল এই আকাশ। তারই প্রতিমা কালী ও তারা। সেই আকাশ থেকে উৎপত্তি সর্বশক্তিসম্পন্না চিরযৌবনা ষোড়শীর। কারণ, শক্তির বল চিরকালই অক্ষুন্না। ষোড়শী চিরযৌবনা। ষোড়শী সর্বশক্তির শ্রেষ্ঠা। তাই তিনি রাজরাজেশ্বরী। শক্তিই ঈশ্বরের বলবীর্য। তাই সর্বশক্তিরূপিনী রাজরাজেশ্বরীকে ধ্যান করেন পঞ্চদেবতা। কারণ, এই আদ্যাশক্তিই তাঁদের উৎস। কালী তারা মহাবিদ্যা থেকেই এই আদ্যাশক্তির উৎপত্তি। চতুর্থ শক্তি হলেন ভুবনেশ্বরী। শক্তির দুই রূপ, কোমল এবং প্রচণ্ড। ভুবনেশ্বরী শক্তির মনোহারিণীরূপ। ভৈরবী চণ্ডশক্তি। অষ্টবিধ প্রচণ্ডতায় বিভক্ত হয়ে তন্ত্রের অষ্টনায়িকা। ভৈরবীই আবার ছিন্নমস্তা, ষষ্ঠ বিদ্যা।

ভগবতী সকল মূর্তিতেই বিশ্বপালিকা। কারণ, তিনি যেমন সৃষ্টির কারণ, তেমনই স্থিতিরও মূল। ছিন্নমস্তারূপে পালিকাশক্তি প্রবল হলে প্রকৃতি ভৈরবী থেকে ভিন্ন। ছিন্নমস্তার তিন রুধির ধারাতে আছে অন্নপূর্ণার ত্রিধাশক্তি। ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগরূপে জগতের অন্নস্বরূপা হলেন অন্নপূর্ণা। সেই জন্যই তাঁর রুধির হল ত্রিধারা। জগত ভোক্তারূপে নিজ জগদ্দেহ থেকে ভোগ্য সংগ্রহ করছেন প্রকৃতি। আবার ভোগ্য অন্নকে আপনিই ভোগ করে পরিপুষ্টা ও পালিতা হচ্ছেন নিজেই। ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ এই তিনই পৃথক শক্তিরূপে বিরাজমানা। অথচ একই মহামায়া। কোন কোন সাধক অবশ্য বলেন দেবীর নিজমুণ্ড ছেদন হল অহংবোধের মুণ্ডচ্ছেদ। কামনা-বাসনা ত্যাগ করে, অহংকে বিনষ্ট করে যিনি পরাশক্তির পবিত্র ত্রিধারা পান করতে পারেন মহাশক্তির কোলে বসার অধিকার তিনিই পান। কিন্তু বাবা, এ ব্যাখ্যা যথার্থ নয়।

ভোক্তা থাকতে পারে, ভোগ্যও থাকতে পারে, কিন্তু ভোগ না হলে পুষ্টি নেই। জগতের পালনের জন্যই এই ভোগ। তাই ত্রিরুধির ধারার একটি ভোগধারা ছিন্নমস্তা পান করছেন স্বয়ং। অপর দুই ধারা পান করছেন একাত্ম দুই সখী ভোক্তা এবং ভোগ্য। এ-দু'জনও শক্তি-রূপা। সেই জন্য স্বতন্ত্রদেহী।

ছিন্নমস্তায় আছে অন্নপূর্ণার জগৎপালনরীতি। কিন্তু ভোগই তো শেষ কথা নয়। ভোগ শেষ হলেই হয় প্রলয়। তাই ছিন্নমস্তার পর শক্তি হলেন প্রলয়রূপিনী ধূমাবতী। জগতের ভোগ শেষ হলে জরাজীর্ণা ভগবতী আসেন বৃদ্ধাবেশে, কাকধ্বজ যমের প্রলয়রথে চড়ে। আসেন ক্ষুধাতুরা ও বিস্তৃতবদনা হয়ে। সকল সৃষ্টিকে কুলায় সংগ্রহ করে নিজের উদর পূর্ণ করেন তিনি। ধূমাবতী তাই প্রলয়রূপিনী ভৈরবরী ভয়ঙ্করী মূর্তি। অষ্টম মূর্তি বগলা হলেন রক্তবর্ণা, রজঃরূপিনী। এই মূর্তিতে দেবী ঘোর বেদবিরোধী অসুরকে বিনাশ করেন। সেই অসুর নাশে যে জ্ঞানের উদয় সেই নিখিল জ্ঞানরূপিনী ভগবৎশক্তিই হলেন মাতঙ্গী। মাতঙ্গরূপেতে বিশ্বরূপিনী শক্তি অজ্ঞানরূপ অবিদ্যা নাশিনী কৃষ্ণাঙ্গী, তমোরূপিনী শক্তি।

এই সমস্ত শক্তিধারিণী হয়ে শক্তি অষ্ট ঐশ্বর্যশালিনী কমলারূপে জগৎ-ব্যাপিনী। সর্বত্রই তাঁর ঐশ্বর্যমূর্তি। যে ব্রহ্মাণ্ড কমল আসন-রূপে কারণ বারি থেকে সঞ্জাত—সেই কমলেই কমলার ব্রাহ্মীশক্তি এবং অপর বিদ্যার আসন। কেবল কালী ও তারা মূর্তিতেই ভগবতী মহাকাল ও মহাদেবরূপ ব্রহ্মস্বরূপ বিশ্বেশ্বরের বক্ষারূঢ়া। তাই এই কালী ও তারামূর্তিই আসল মহাবিদ্যা। অন্য আটটি মূর্তি এই দুই মহাবিদ্যা থেকে উৎপন্ন 'পরাপর বিদ্যা' ও 'সিদ্ধবিদ্যা' নামে তন্ত্রশাস্ত্রে বিভক্ত। সুতরাং যে বিশ্ব কমল ত্রিগুণময় হয়ে ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত, অষ্ট-বিদ্যার আসল স্বরূপ হল তাই।

ডাঃ কালীভূষণ মুন্সী বললেন, মায়ী, এই প্রসঙ্গে আমাদের দক্ষ-যজ্ঞের গুরুত্ব একটু ব্যাখ্যা করে বলুন।

মায়ী বললেন, বাস্তব বিচারে এটা তথাকথিত যজ্ঞ। তৎকালীন আর্য প্রধান দক্ষপ্রজাপতি এই যজ্ঞ করেছিলেন। এই যজ্ঞে অনার্যদের কোন স্থান ছিল না। সেই সময় আর্যদের মধ্যে নিয়ম ছিল যে, যজ্ঞে পিতৃপুরুষ ও দেবতাদের নামে সে-সকল আহুতি দেওয়া হত সেই সব দ্রব্যের ভাগ আর্যরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতেন। শিব নূতন সাধনপ্রণালী এনেছিলেন। অত্যন্ত সহজ ছিল এই প্রণালী। জাত নির্বিশেষে সবাই এই প্রণালী অনুসরণ করতে পারতেন। আনুষ্ঠানিকতাও কিছু ছিল না। ছিল না পোশাক ও খাদ্যাখাদ্যের বালাই। অথচ যে যৌগিক প্রথা তিনি আমদানী করেছিলেন তার তুলনা নেই। প্রথম দিকে শিবকে অবজ্ঞার চোখে দেখত আর্যরা। কিন্তু শিবের অপুর্ব সাধনকৌশলে মুগ্ধ হয়ে দক্ষকন্যা তাঁকে বিবাহ করেন নিজে পছন্দ করে। এই জন্য যজ্ঞে তাকে আমন্ত্রণ করেন নি দক্ষ প্রজাপতি। বিনা নিমন্ত্রণে এলে অপমান করেন। শিবের দীক্ষায় যৌগিক কলাকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন দক্ষকন্যা সতী। তিনি অপমান সইতে না পেরে আসনে বসে প্রাণবায়ু ত্যাগ করেন। শিব তখন নিজে এসে তার আশ্চর্য যোগবিভূতি প্রদর্শন করে আর্যদের বুঝিয়ে দেন যে, যথার্থই তিনি এক উন্নত অধ্যাত্ম সাধনপ্রণালীর অধিকারী। তাঁর এই অলৌকিক যোগবলের মাহাত্ম্য অস্বীকার করতে না পেরে অগত্যা আর্যরা তাঁকে যজ্ঞ ভাগ দান করতে বাধ্য হন।

একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করলেন, দক্ষের ছাগ মুণ্ড হবার কারণ কি? মায়ী এবিষয়ে কিছু বলার আগেই ডাঃ মুন্সী বলেন, সেটা সম্ভবতঃ একটি বিশেষ গোষ্ঠীর প্রধান্যের প্রতীক।

—কি রকম?

মুন্সী বললেন, প্রাচীনকালে গোষ্ঠীবদ্ধ লোকেরা নিজেদের গোষ্ঠীর পরিচয় হিসেবে কিছু প্রতীক ব্যবহার করতেন। মিশর, মেসোপোটেমিয়া, ইরাণ, ভারত সর্বত্রই এরকম ছিল। কেউ বৃষ, কেউ ছাগ, কেউ মোষ, নানা প্রতীক নিতেন। প্রত্যেকের আরাধ্য দেবতার মাথায় সেই

প্রতাকের মুখ ব্যবহার করে পুজো করতেন। শিব যে গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন তার প্রতীক ছিল সম্ভবতঃ বৃষ।

একজন বললেন, তাহলে আপনি বলতে চান যে—দক্ষ প্রজাপতি শিবের দ্বারা পরাজিত হয়ে শিবের গোষ্ঠী প্রতীক গ্রহণ করেছিলেন?

—হ্যাঁ, তাই।

—তাহলে দক্ষের মাথাটা ছাগ মুণ্ড না হয়ে তো বৃষমুণ্ড হওয়া উচিত ছিল?

মুন্সী বললেন, শিব সম্ভবতঃ কোন ছাগ প্রতীক গোষ্ঠীর সহায়তায় ভারতে এসেছিলেন তিব্বত থেকে। দক্ষকে পরাজিত করে সেই ছাগ প্রতীকীদের অধীনস্ত করে দিয়েছিলেন।

ভক্তদের মধ্যে এই আলোচনা শুনে মাতঙ্গী মায়ী মৃদু মৃদু হাসছিলেন।

একজন ভক্ত তা দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, মায়ী আপনি কি বলেন?

মাতঙ্গী মায়ী বললেন, এ-সবই স্থূল বিচার। কিন্তু অধ্যাত্ম জগতে স্থূলবিচারের চাইতে সূক্ষ্ম বিচারের মূল্য বেশী।

একজন বললেন, মায়ী, দয়া করে আপনিই এ বিষয়ে ব্যাখ্যা করুন।

মাতঙ্গী মায়ী বললেন, এর অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা এই রকম: সমস্ত ভক্ত মণ্ডলী উৎসুক দৃষ্টিতে মাতঙ্গীমায়ীর মুখের দিকে তাকালেন। মাতঙ্গী মায়ী বলতে লাগলেন: কালের দুই মূর্তিতে শক্তির প্রকাশ—কর্মশক্তি ও ব্রহ্মশক্তি। এই শক্তি যখন ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকেন কালের সঙ্গে এবং ব্রহ্মশক্তি ও কর্মশক্তির মধ্যে যতক্ষণ সাম্য রক্ষা পায় ততক্ষণই শক্তি। কেউ যদি কর্মশক্তির মদগর্বে ব্রহ্মশক্তিজ্ঞানহীন হয়ে শক্তিকে কালের অঙ্কচ্যুত করেন—ধ্বংস তখন অনিবার্য। আত্ম অহংকারে অহংকৃত দক্ষ যজ্ঞে কালের কর্মশক্তিকে আহ্বান করেছিলেন। তিনি ব্রহ্মশক্তির মূল্য নিরূপণ করতে পারেন নি। কিন্তু শিবব্রহ্ম-

শক্তিচ্যুত কালের কর্মশক্তি তো জড় মাত্র। তা দিয়ে কর্মসিদ্ধি হয় না। সুতরাং দক্ষের কর্মযজ্ঞও ব্যর্থ হতে বাধ্য। যজ্ঞ পণ্ড হয়েছিল। সতী হলেন কর্মশক্তির প্রতীক।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন, কর্মশক্তি কি একটু বুঝিয়ে বলবেন?

মায়ী বললেন, স্বত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হল কর্মশক্তি, ব্রহ্মশক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকাশিত। ব্রহ্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই হয় বিকৃতি, অবিদ্যা। অবিদ্যার ধ্বংস অনিবার্য। সতীর দক্ষযজ্ঞে আগমন হল তাঁর তিন গুণে আত্মপ্রকাশ। তাঁর পুরুষ সত্তা তখন নিষ্ক্রিয়, অচৈতন্য। এই ত্রিগুণ অর্থাৎ সতীর মৃত্যু হলেই হয় প্রলয়। তখন নিষ্ক্রিয় ও অচৈতন্য পুরুষ স্বরূপে জেগে উঠেন। শক্তি অর্থাৎ সতী শিবে প্রত্যাবর্তন করলেই পুনরায় নির্মল জ্ঞানের অর্থাৎ পরম চৈতন্যের নিজের অবস্থা দেখা দেয়। দক্ষযজ্ঞে দক্ষের জ্ঞানলাভের এই হল অর্থ।

জিজ্ঞাসু ভক্ত যাঁরা মাতঙ্গী মায়ের কাছে কিছু অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভের জন্য এসেছিলেন তাঁরা সকলেই মাতঙ্গী মায়ীর মুখে দশ মহাবিদ্যার এই অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনে চমৎকৃত হলেন। প্রত্যেকেই পরস্পর বলাকওয়া করতে লাগলেন যে, পরমসিদ্ধাই না হলে গভীর অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে এ ধরনের কোন কিছু ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। একবাক্যে সকলেই তাঁরা মাতঙ্গী মায়ীকে অনন্যা তন্ত্রসিদ্ধা রমণী বলে স্বীকার করে নিলেন। সকলেই শ্রদ্ধা ভরে মায়ের চরণে প্রণাম জানিয়ে একে একে বিদায় নিলেন।

মাতঙ্গী মায়ী পরম জ্ঞানের অধিকারিণী হয়েছিলেন। তবে যখন তখন অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে চমক সৃষ্টি করে শিষ্য সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করতেন না। তবে তাঁর অনুগত ভক্তদের রক্ষার জন্য মাঝে-মাঝে তৎপর হতেন। সেবার এ-রকম এক ঘটনা ঘটেছিল।

কুলু ও কাংড়া অঞ্চলের চারদিকে এ-সময় খুব আফিং ও ভাঙ হত। চরসের কারবার করেও বেশ কিছু লোক অর্থ সংগ্রহ করেছিল। অনেকেই বিনা লাইসেন্সে এই ব্যবসা করত। দুর্নীতি করে হাজার হাজার টাকা আয় করত।

আবগারি বিভাগের কর্তারা এ-সময়ে একবার এই দুর্নীতি রোধের জন্য ভয়ানক তৎপর হয়ে উঠেন। বেশ ধরপাকড় শুরু হয়ে যায়। কাংড়ার তিনজন বড় বড় আড়ৎদার ও চালানদার প্রচুর অবৈধ মাল রাখার জন্য ধরা পড়ে। পুলিশ তাদের সদরে চালান দেয়।

এই তিনটি আড়ৎদার ও চালানদার মাতঙ্গী মায়ীর ভক্ত ছিলেন। মাতঙ্গী মায়ী যখন কাংড়াতে চোদ্দ বছর কঠোর সাধনায় ব্রতী ছিলেন তখন এঁরা মাঝে মাঝেই তাঁকে দর্শন করতে আসতেন ও ভেট দিয়ে যেতেন। ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে পড়বার ভয়ে তাঁরা ভয়ানক আতঙ্কিত হলেন। সদর থেকে জামিনে খালাস পেয়েই তাঁরা ছুটে এলেন মাতঙ্গী মায়ীর কাছে। মায়ীর সিদ্ধি এবং অলৌকিক ক্ষমতার কথা তখন নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁরা ভাবলেন মায়ীর স্মরণ নিলে হয়তো এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। তাঁরা এসে জ্বালামুখীতে মায়ীর কাছে কাতর মিনতিতে ভেঙে পড়লেন: মায়ী অধম সন্তানদের এই ঘোর বিপদ থেকে রক্ষা কর তুমি।

এই তিনজন আড়ৎদার ও চালানদারের মধ্যে সহায়রাম নামে এক ব্যবসায়ী ছিলেন। অন্যায় ব্যবসা যাই করুন না কেন তিনি কিন্তু পিতৃভক্তিতে ছিলেন অতুলনীয়। পিতার নির্দেশে তিনি সব কাজই করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর যে আর দু'জন সঙ্গী ছিল—মগনলাল ও বৃজমোহন, তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত দুষ্টপ্রকৃতির। অর্থের লোভে কোনো কুকর্ম করতে বাধতো না।

মাতঙ্গী মায়ীর অজ্ঞাত কিছু নেই। এরা তার কাছে আসতেই তিনি সব বুঝে নিয়েছিলেন। প্রত্যেকের চরিত্রও তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল। তাই অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে সহায়রামকে বললেন, সহায়রাম তোমার অপরাধ খুবই গুরুতর। তুমি মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর জিনিষ নিয়ে ব্যবসা করে বড় হচ্ছ। খুবই অন্যায় করছ। তবে গুরুস্থানে যথার্থই মাতৃজ্ঞানে আমাকে ধরেছ। তাছাড়া তুমি খুবই পিতৃভক্ত। পিতার পুণ্য আর আশীর্বাদ তোমাকে ঘিরে আছে।

সেজন্য এবার তুমি মুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু সাবধান! অর্থলোভে ভবিষ্যতে এরকম কাজ আর কখনও করবে না।

অপর দু'জনের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, মগনলাল তুমি ঘোরতর মহাপাপী। ভাঙ চরস মদের নেশায় দিনরাত ডুবে থাক। সাধ্বীসতী স্ত্রীকে মারধোর কর। অন্যায় ভাবে আয় করা টাকা রক্ষিতার পেছনে ঢাল। তোমার জন্য জ্বালাজীকে আমি কোন কথা বলতে পারব না। ধনগর্বে ফুলে উঠে অসহায় বৃদ্ধ বাপকে তাড়িয়ে দিয়েছ। তোমাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।

অপর অপরাধীর দিকে তাকিয়ে তিনি একই কথা বললেন।

তিনি যা বললেন, তা সবই বর্ণে বর্ণে সত্য। সুতরাং অপর দুই অপরাধীর মুখে কোন কথা থাকল না। তাঁরা মাথা নিচু করে উঠে চলে গেলেন।

কয়েক সপ্তাহ পরে মাতঙ্গী মায়ীর কথা মতই ফল ফলল। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে সহায়রামের বিরুদ্ধে কোন মামলা দাঁড় করানো গেল না। সদর থেকে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু মগনলাল ও বৃজমোহন উদ্ধার পেলেন না। তাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। তাদের প্রত্যেকের চার বৎসর করে জেল হল।

মগনলাল ও বৃজমোহন প্রথমে মাতঙ্গী মায়ীর রূঢ় ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু কারাবাসের সময় আত্মসমালোচনা করে তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন। বুঝতে পারেন, মাতঙ্গী মায়ীর ব্যবহারই ঠিক। পাপের বিনিময়ে পুণ্য সামান্যমাত্র না থাকলেও বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। তাঁদের মনের পরিবর্তন ঘটে যায়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার তাঁরা এসে মাতঙ্গী মায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর চরণে আশ্রয় নেন। এবার থেকে ধর্মকর্ম ও পুণ্যচিন্তায় তাঁরা আত্মসমর্পণ করেন।

মাতঙ্গী মায়ী অলৌকিক ক্ষমতা দেখানো পছন্দ না করলেও কখনও কখনও যথার্থ সৎ, বিনয়ী ও ধর্মপরায়ণ লোকের ব্যথা বেদনায়

বড় বিচলিত হয়ে পড়তেন। তখন ভক্তদের কল্যাণের জন্য অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। সেবার লাহোর কলেজের এক বিজ্ঞানের অধ্যাপকের জন্য তিনি অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগে ইতস্তত করেন নি। অধ্যাপক অশ্বিনীকুমার মিত্র। লাহোর কলেজে বিজ্ঞান পড়ান। অনেকবার তিনি ডাক্তার কালীভূষণ মুন্সীর সঙ্গে মায়ীর কাছে এসেছেন। মায়ীর আশীর্বাদ লাভ করে ধন্যও হয়েছেন। এবার তিনি মায়ীর কাছে একটা বিশেষ প্রার্থনা নিয়ে এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন স্ত্রী এবং পুত্রকে। তাঁর দশ বছরের পুত্রটি পলিও রোগে আক্রান্ত। নিম্নাঙ্গ একেবারে অসাড়। ডাঃ কালীভূষণ মুন্সী অধ্যাপক মিত্রের বন্ধু। দীর্ঘদিন তিনি ছেলেটির চিকিৎসা করে হার মেনেছেন। শেষে তিনিই বলেছেন মা ঙ্গী মায়ীর কাছে আসতে।

অধ্যাপক মিত্র মাতঙ্গী মায়ীর দিকে করুণচোখে তাকিয়ে বললেন, মায়ী, বিজ্ঞান তো এ রোগে ব্যর্থ। কোন অষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। বাধ্য হয়ে আপনার আশ্রয়ে এসেছি। আপনার চরণে একে সমর্পণ করলাম। আপনার যা খুশি করবেন।

মায়ী হেসে বললেন, আমি কি করব বাবা ?

অধ্যাপক মিত্র বললেন, অধমকে ছলনা করবেন না। আপনার যোগ-বিভূতি অসামান্য। ইচ্ছে করলে পঙ্গুকেও গিরি লঙ্ঘন করাতে পারেন।

মায়ী কিছু বললেন না।

অধ্যাপক মিত্র এবং তাঁর স্ত্রী ছেলেটিকে এনে মায়ীর পায়ের কাছে রেখে ধর্ণা দিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। বললেন, মায়ী একটা মাত্র পুত্র আমাদের। এ রোগ যদি না সারে তাহাল মৃতকল্প হয়ে আমাদের কাটাতে হবে।

ভক্তের ক্রন্দনে মাতঙ্গী মায়ী স্থির থাকতে পারলেন না। করুণার দৃষ্টি ফেলে মুমূর্ষু বালকটির দিকে তিনি তাকালেন। তারপর কি একটু ভাবলেন। ব্রহ্মজ্ঞানীর হৃদয়ে সম্ভবত এর প্রতিকার সন্ধান

করলেন, তারপর কুঠিয়া থেকে কোথায় বের হয়ে গেলেন। কিন্তু খুব দূরে গেলেন না তিনি। পাশের একটি বেলগাছ থেকে কয়েকটি বেলপাতা সংগ্রহ করলেন। সেগুলি নিয়ে এসে ঘিয়ে ভিজিয়ে কুঠিয়ার পাশের হোমকুণ্ডে পুড়িয়ে নিলেন। তারপর গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রপুঃত ত্রিশূলটি রুগ্ন ছেলেটির মাথায় ছুঁইয়ে তার বাবার হাতে বেলপাতাগুলি দিলেন। বললেন, বাবা এখানে বারটি বেলপাতা আছে। ছেলেকে লাহোরে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাও। রোজ একটা করে পাতা খাওয়াবে। ধীরে ধীরে দেখবে ওর শরীরের নিচের দিকে রক্ত চলতে থাকবে। কোনো চিন্তা নেই, ভালো হয়ে যাবে।

অধ্যাপক মিত্র বললেন, মায়ী আপনার মুখের কথা ব্রহ্মবাক্য। আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই আমার। আমার ছেলে ভাল হবেই।

আত্মপ্রত্যয়ে কোন কথা বললে তা ব্যর্থ হয় না। নিঃশর্ত বিশ্বাস নিয়ে কোন কিছু বিশ্বাস করলে বিশ্বাস ফল দান করে। অসম্ভবও সত্যি সত্যি সম্ভব হল। বিজ্ঞান যাকে ব্যর্থ হয়ে ছেড়ে দিয়েছিল অধ্যাত্ম জ্ঞান তাকে রক্ষা করল। চিকিৎসাশাস্ত্র দ্বারা পরিত্যক্ত ছেলেটি সত্যিই ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করল। উত্তরকালে এই ছেলেটি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র হিসেবে গণ্য হয়েছিল।

লাহোরের এক বিজ্ঞানের অধ্যাপক অশ্বিনীকুমার মিত্র ও জালন্ধর কলেজের অধ্যাপক বিষ্ণুচরণ সমাদ্দার পরবর্তীকালে স্থায়ীভাবে এসে দিল্লীতে থাকতেন। এঁরাই দিল্লীতে বাঙ্গালী-ভক্তসমাজে মাতঙ্গী মায়ীর যোগবিভূতির নানা বিস্ময়কর কাহিনী প্রচার করেন।

ঈশ্বরের বিচিত্র ইচ্ছার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া ভার। মহাসাধনায় মহাসিদ্ধি অর্জন করে মাতঙ্গী মায়ী কিন্তু বেশীদিন বেঁচে থাকেন নি। অথচ শোনা যায় যে যোগবিভূতি যারা অর্জন করেন তাঁরা দীর্ঘায়ু হন। বারোদির লোকনাথ ব্রহ্মচারীর বয়সের হিসেব নেই। কাশীর বিশ্বনাথ-তুল্য তৈলঙ্গ স্বামীও দীর্ঘায়ু। শোনা যায় যোগীবর শ্যামাচরণ লাহিড়ীকে

যিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন তিনি এখনো বেঁচে আছেন। অনেকে বলেন তাঁর নাম 'হইরা বাবা'। তবে দ্রোণগিরিতে শ্যামাচরণ লাহিড়ীর আসনে সিদ্ধিলাভ করেছেন বলে দাবি করেন এমন একজন হিমালয়ের বাঙ্গালী সাধু কিছুদিন আগে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁর ভক্তেরা তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিলেন। এক ভক্ত ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজের বাংলার অধ্যাপক সুধীন বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সন্ন্যাসীর নিজের মুখে শুনেছি—তিনিও স্বয়ং শ্যামাচরণ লাহিড়ীর গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। হিসেব করলে দেখা যায় শ্যামাচরণ লাহিড়ীর গুরুর বয়স তিনি এখনও বেঁচে থাকলে চারশ বছর। বেদে আছে পুরুষ শতায়ু। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যেও শতবৎসরকে অতিক্রম করে বেঁচে আছেন এমন মানুষের সংখ্যাও প্রচুর। যোগীরা তার চাইতেও দীর্ঘায়ু। এবং সাধারণতঃ এঁরা সকলেই দীর্ঘায়ু হয়ে থাকেন। হয়তো জগৎহিতায় তাঁরা বেঁচে থাকেন। তাহলে মাতঙ্গী মায়ী কি জগৎহিতায় আসেন নি? তিনি কি এসেছিলেন আত্ম-মুক্তির সাধনা করতে? সে যাই হোক, সাধনায় সিদ্ধিলাভের পরই অকস্মাৎ তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের মধ্যাহ্নে কেন যেন পূর্ণগ্রহণ নেমে এল। ১৯২৮ সালের শীতকাল। শিবচতুর্দশীর আর মাত্র দু'দিন বাকি। জ্বালামুখীতে অনেক ভক্তের সমাবেশ ঘটেছে। এদের মধ্যে অনেকেই মাতঙ্গী মায়ীর ভক্ত ও শিষ্য। এদের সবাই এসেছেন মায়ীকে দর্শন করে তাঁকে প্রণাম জানাতে। কিন্তু সকলেই একটি সংবাদে বড় মর্মাহত হলেন। সংবাদটি তাঁদের পক্ষে নিতান্তই মর্মভেদী। মায়ী বলে দিয়েছেন যে, শিবচতুর্দশীর সারারাত তিনি আপন কুঠিয়ায় বসে হোমকুণ্ডে আহুতি দেবেন। জপ ও ধ্যান করবেন। ভোরবেলায় মর্ত্যলীলার চিরযবনিকা টানবেন।

সংবাদটি মুহূর্তের মধ্যে ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্য ছড়িয়ে পড়ে। যাঁরা ভিড় করেছিলেন তাঁরা বাদেও আরও নতুনেরা এসে ভিড় করেন। মহাসাধিকার মহাপ্রয়াণ যেমন মর্মান্তিক তেমনই অলৌকিকও বটে। শিবচতুর্দশীর রাত্রে সত্যি সত্যি মায়ীর কথা মত কুঠিয়ার দরজা বন্ধ

হয়ে যায়। গবাক্ষ পথ দিয়ে হোমকুণ্ডের ধুঁয়া বেরুতে থাকে। সকলেই বুঝতে পারেন যে, মায়ী হোমক্রিয়া করছেন।

অদ্ভুত উদ্বেগের মধ্য দিয়ে সারারাত কেটে যায়। ভোর বেলা শিষ্যেরা কুঠিয়ার দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন। প্রবেশ করে দেখতে পান যে, আসন করে বসে আছেন মায়ী। যোগবলে প্রাণ বায়ুর নিষ্ক্রমণ ঘটিয়েছেন তিনি। মায়ীর প্রাণহীন দেহ নিশ্চল নিথর। কিন্তু মৃত্যুবিষের স্পর্শ নেই। স্বর্গীয় দীপ্তিতে যেন উদ্ভাসিত। যেন একটি নিষ্কলঙ্ক ফুল মায়ের পায়ে উৎসর্গিত হয়ে হাসছে। তাই হয়। জীবনের উৎস যাদের কাছে উন্মোচিত হয়, মৃত্যু তাঁদের কাছে বেদনার নয় মোটেই। পৃথিবীর বৃন্তচ্যুত হলেও বৃন্তচ্যুত ফুলের মতই সে দেহ হাসতে থাকে।

শিষ্য এবং ভক্তরা তাঁদের শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন মায়ীর উদ্দেশ্যে। তারপর মায়ীরই নির্দেশ মত কুঠিয়া সংলগ্ন বেলগাছের নিচে মার্তণ্ড মহারাজের সমাধির পাশে তাঁর চন্দন ও সুগন্ধিচর্চিত দেহকে সমাধিস্থ করলেন। এক মহাসাধিকা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত মুহূর্তকালের জন্য জ্বলে, কেন কে জানে আবার নিজের ইচ্ছাতেই নিভে গেলেন।

কামরূপ কামাখ্যার পিশাচসিদ্ধ

বর্তমানে তন্ত্রের জাগ্রত পীঠ হিসেবে দুটো পীঠের খুব নাম—পশ্চিমবঙ্গে তারাপীঠ এবং আসামে কামাখ্যা। এখনো নাকি তারাপীঠে পাওয়া যায় অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন তন্ত্রসাধকের সাক্ষাৎ। সেই জন্য বহুলোক এখনও সেখানে ভিড় করে। শ্মশানবাসী শঙ্কর পাগলকেই অনেকে মনে করে পাগলের ছদ্মবেশে মহাশক্তির তন্ত্র সাধক। সুতরাং তাঁর করুণা পাবার জন্য লোকের চেষ্টার অন্ত নেই। আবার আর একদলের লক্ষ্য কামরূপ কামাখ্যা। এখনও তন্ত্রসাধনার জন্য বহুলোক গিয়ে সেখানে ভিড় করেন। বহু পুণ্যার্থী কামাখ্যা মায়ের কাছে মানত করে সেখানে পুজো দিতে যান। বড় বড় জ্যোতিষীরা তন্ত্রক্রিয়ার জন্য কামাখ্যাকেই বেছে নেন। কামাখ্যাতে মানত করে বহুলোক বিপদমুক্ত হয়েছেন এ ঘটনা আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

সাধক বশিষ্ঠ প্রাচীনকালে, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তারাপীঠে চীনাচার তন্ত্র এনেছিলেন বলে বিশ্বাস। কিন্তু কামাখ্যাতে কোন্ তন্ত্র কে প্রচার করেছিলেন জানা যায় না। পণ্ডিত ব্যক্তিদের ধারণা কামাখ্যার তন্ত্র বিদেশ থেকে আমদানী করা নয়। এদেশের মাটিতে এখানেই তার জন্ম।

তন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ দেখে মনে হয়, আর্যদের ধর্মসাধনার অঙ্গ এটা নয়। অনার্যরাই এর জন্মদাতা। শিব যিনিই হোন না কেন—আর্য ছিলেন না তিনি। দক্ষযজ্ঞের কাহিনীই প্রমাণ করে যে, নিজের অলৌকিক অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষমতা দেখিয়ে, যোগবল দেখিয়ে আর্য জগতে শিব নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণেরা এই তন্ত্রধর্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তন্ত্রের আদি বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে পারেননি, এর মাহাত্ম্য বাড়াতে পারেননি, বরং এর ক্ষতি করেছেন।

কামাখ্যা কামরূপের তন্ত্রসাধনার ধারা সেই মাটি থেকেই উদ্ভূত। অতি প্রাচীন কাল থেকেই এই অঞ্চলে ছিল মাতৃ-আরাধনার বিশেষ কতকগুলি পদ্ধতি। সেই পদ্ধতিই তন্ত্র সাধনার গুহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে পরবর্তীকালে। কামরূপ কামাখ্যার নামও এ-অঞ্চলের আদি অধিবাসীদের কাছ থেকেই এসেছে। পণ্ডিতদের ধারণা, অস্ট্রিক শব্দ কামোই, যার অর্থ দৈত্য, কামোইত, যার অর্থ শয়তান, কোমিন, যার অর্থ সমাধি কমেত যার অর্থ খাসিয়া ভাষায় মৃতদেহ, কমরু সাঁওতালদের কোন দেবতা, এই সব শব্দ থেকেই কামরূপ কামাখ্যা নামের উৎপত্তি। কম্বোজের অস্ট্রিক মন্‌খেমেরদের একটা শব্দের সঙ্গে কামরূপ কামাখ্যা তো হুবহু মিলে যায়! যেমন, কা-মেই-খা' বলে একটি শব্দ আছে মন্‌ খেমেরদের। যার অর্থ পিতামহী বিশ্বমাতা। কা অর্থাৎ স্ত্রী, মেই অর্থাৎ মা এবং খা অর্থাৎ জন্মদাত্রী। সুতরাং কামাখ্যাকে মনে হয় এ অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদেরই কোন দেবী। এই দেবীকে বিশেষ রকম একটা পদ্ধতিতে পূজা করতেন এ-অঞ্চলের অধিবাসীরা। সেই থেকেই কামাখ্যা তন্ত্রের উদ্ভব।

এ-অঞ্চলের চুটিয়া বা ছুতিয়াদের কথাই ধরুন না কেন। ব্রাহ্মণদের বাদ দিয়ে দেওরী নামে নিজেদের পূজারী দিয়ে মায়ের বিভিন্ন রূপের পুজো করত তারা। মায়ের যে-রূপটা ছিল তাদের কাছে বেশী প্রিয়, সেরূপ হল 'কেশাইখাতি' অর্থাৎ কাঁচা মাংসভোজী। চুটিয়া বা ছুতিয়াদের মতে বিশ্বস্রষ্টা পরম পুরুষের নাম হল কুন্দী। এই কুন্দীর প্রকৃতি বা শক্তি হলেন মা-মা, অর্থাৎ মহামায়া। এই মহামায়াই হলেন কেশাইখাতি বা কা-ছাইখাতি। বড় কাছারী জাতের লোকেরা বলে মহামায়া রণচণ্ডী বা কা-ছাইখাস্তি। অনেকে এঁকে বলতেন তাম্রেশ্বরী। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ক্রীটদ্বীপের ছাইক্রাস দেবীও ছিলেন তাম্রেশ্বরী নামে পরিচিত। নরবলি দিয়ে পূজা করা হত এই মাকে। অহমরা এ অঞ্চল জয় করে নিলে যে-কোন লোককেই বলি দিতে দেওয়া হত না। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত লোকদেরই শুধু বলি দিতে দেওয়া হত। এরকম

মানুষ যদি না পাওয়া যেত, তাহলে বলি দেবার জন্য ছতিয়াদের মধ্যেই ছিল বিশেষ এক ধরনের উপজাতি। যে-লোকটি নির্বাচিত হত বলি দেবার জন্য তাকে প্রতিপালন করা হত বিশেষ রকম যত্নে। রাজকীয় ভোজ দেওয়া হত তাকে যাতে মা তার নধর মাংস পেয়ে খুশি হন।

বর্তমানে যে কামাখ্যা দেবী, তাঁরও প্রতিষ্ঠা হয়েছিল নরবলি দিয়েই। বর্তমান কামাখ্যাদেবীর প্রতিষ্ঠা কালে ১৪০ জন মানুষের মাথা তাম্রপাত্রে উপহার দেওয়া হয়েছিল মাকে।

এ-অঞ্চলে দেবী-পূজার জন্য ভোগী বলে একটি জাতের মধ্যে এই বলিপ্রথা প্রচলিত ছিল অনেক দিন আগে থেকেই। ভোগীরা বাস করত কামরূপে। 'আই' নামে এক দেবীর কাছে স্বেচ্ছায় তারা প্রাণ বিসর্জন করত। দেবী 'আই' বাস করতেন গুহায়। ভোগীরা নাকি শুনতে পেত আইয়ের ডাক। আইয়ের ডাক শুনলেই সে-ব্যক্তি চিহ্নিত হয়ে যেত বিশেষ ভাবে। তখন তার বিশেষ সম্মান সমাজে। যা খুশি তাই করতে পারে। যে-কোন রমণীকেই ইচ্ছামত ভোগ করতে পারে। কিন্তু আইয়ের বাৎসরিক পূজা এলেই তার দিন শেষ। তখন বলি।

সতীর অঙ্গের একটি অংশ পড়েছিল কামাখ্যাতে। সেই জন্য এ-পীঠ একান্ন পীঠের এক পীঠ। একান্ন পীঠের গল্পকারেরা অবশ্য কামরূপ কামাখ্যার নামকরণের জন্য দক্ষযজ্ঞনাশরূপ ঘটনাকেই দায়ী করেছেন প্রত্যক্ষভাবে। যেমন, সতীর মৃত্যুর পর শিব যখন দক্ষযজ্ঞ নাশ করে তাঁকে কাঁধে নিয়ে ঘুরতে লাগলেন উদ্ভ্রান্তের মত তখন সতীভার মুক্ত করতে বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে সতীর দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ছড়িয়ে দিলেন দেশের নানা প্রান্তে। সতীভার মুক্ত হয়ে শিব বসলেন আবার ধ্যান করতে। শিবকে তখন প্রকৃতির প্রতি আকর্ষিত করার জন্য দেবতারা কামদেবকে ধরলেন শিবের মধ্যে কামনা জাগাতে। কামদেব ফুলশর নিক্ষেপ করে শিবের মধ্যে জাগালেন কামনার ইচ্ছা। চোখ মেলে শিব যখন তাঁর এই চাঞ্চল্যের কারণ হিসেবে সামনে

দেখতে পেলেন কামকে তখন তাঁর তৃতীয় নয়নের রোষানল দিয়ে সম্পূর্ণ ভস্মসাৎ করে দিলেন তাকে। অবশ্য দেবতাদের অনুরোধে পুনরায় কামকে স্বরূপ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন শিব। আসামের এই অঞ্চলে শিব-রোষানলে দগ্ধ হয়ে কাম আবার তাঁর রূপ ফিরে পেয়েছিলেন বলে এ অঞ্চলের নাম কামরূপ।

এই কামরূপে সতীর দেহের যে-অংশ পড়েছিল তা হল যোনিদেশ। এইজন্য এই স্থান তন্ত্রসাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। যোনির এই গুরুত্বের কারণ এই যে, অতি প্রাচীন কাল থেকেই যোনিকে মাতৃশক্তির প্রতীক বলে ধরে নিয়ে বিশেষ রকম শ্রদ্ধা করত লোকে। প্রাচীনকালে এইজন্য যোনিকুণ্ডে স্নান করা ছিল তীর্থপুণ্যপ্রয়াসীদের কাছে একটা বড় রকমের ধর্ম। যারা মাতৃ আরাধক, তারা পূজা করত মাতৃশক্তি-রূপে যোনিপ্রতীককে। যারা পিতৃ-আরাধক তারা পূজা করত লিঙ্গের। পরে যখন লোকে বুঝতে পারে যে, লিঙ্গ ও যোনি একত্র না হলে উৎপাদন নেই, জন্ম নেই, তখন দুইকে এক করে লিঙ্গ ও যোনি পূজার ব্যবস্থা হয় একত্রে। প্রাচীন মহেন-জো-দড়োর ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও লিঙ্গ ও যোনির সন্ধান পাওয়া গেছে। এধরনের বিশ্বাস এ-দেশের প্রাচীন অনার্য অধিবাসীদেরই ছিল, আর্যদের নয়। আর্যরা এই ধরনের লিঙ্গ-যোনি পূজারীদের ঘৃণা করত 'শিশ্নে দেবাঃ' বলে। কামাখ্যায় যোনিপ্রতীকে মায়ের পূজো দেখে সেই জন্যই মনে হয় তন্ত্র-সাধনায় এতদঞ্চলীয় ধারণা এ-অঞ্চলের মাটি থেকেই জাত। বাহ্যতঃ এই ধরনের দৃষ্টিকটু প্রতীকের মধ্যেও আছে গূঢ় কোন তত্ত্ব, যে-তত্ত্ব আর্যদেরও হার মানিয়েছিল অধ্যাত্ম সাধনায়। সে-জন্য তন্ত্রকে প্রথম দিকে অবজ্ঞা করলেও শেষপর্যন্ত অবজ্ঞা করতে পারেনি তারা।

ভারতবর্ষের অন্যত্রও আরও কামাখ্যা তীর্থ ছিল একসময়। যেমন, পদ্মপুরাণের পঞ্চম খণ্ডে আছে, উত্তর প্রদেশের রায়বেড়িলির উত্তর পশ্চিম প্রান্তের পার্বত্য অঞ্চলে ছিল প্রাচীনকালের এক কামাখ্যা। বর্তমানে এর নাম চণ্ডিকাস্থান। মহাভারতের বনপর্বে আছে,

ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তে ছিল ৮০ মাইল দীর্ঘ ও চার মাইল প্রশস্ত দেবিকা সরোবর। সরোবরের তীরে ছিল রুদ্রদেবের পবিত্র তীর্থস্থান কামাখ্যা তীর্থ। এই তীর্থে বানর জাতীয় ব্রাহ্মণেরা দৈবকার্য করত। মাদ্রাজের কাঞ্চীপুরেও ছিল কামাখ্যাদেবীর মন্দির। সেখানে কামকোটিতে হত দেবীর যোনি প্রতীকের পূজা। কিন্তু সে-সব কামাখ্যার কোনটাই আজ আর মাহাত্ম্য নিয়ে টিকে নেই। কিন্তু আসামের কামরূপ কামাখ্যা আজও আছে তার চিরকালীন মহিমা নিয়ে জাগ্রত। কোন অধ্যাত্ম সত্য না থাকলে তা সম্ভব হত না।

আর্যপূর্ব যুগ থেকেই এখানে অধ্যাত্ম সাধনার এক বিশেষ ধারা প্রচলিত। তাকেই বলা যেতে পারে তন্ত্রসাধনার ধারা। আর্যযুগেও বৈদিক অধ্যাত্ম সাধনার ধারাকে অস্বীকার করে এই তন্ত্রসাধনার ধারা প্রচলিত ছিল। তবে কামরূপ হিসেবে এ স্থান বিখ্যাত হলেও মহাভারতে এ অঞ্চলকে বলা হত প্রাগজ্যোতিষ, তন্ত্র ও পুরাণে কামরূপ। এক বিরাট অঞ্চল নিয়ে ছিল এই প্রাগজ্যোতিষ বা কামরূপের অবস্থান। মহাভারতের কালে এর বিস্তৃতি ছিল দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থেকে উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত। এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে পশ্চিমে করতোয়া পর্যন্ত। কামাখ্যা মন্দির ছিল এই বিস্তৃত অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র। অর্থাৎ এই বিস্তৃত অঞ্চলের সবটাই কামরূপের মাতৃসাধনার ধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। বস্তুতঃ এই বিরাট অঞ্চলে আজও আর্যরক্তের ধারা খুব কম দেখা যায়। এবং এই অঞ্চলে বৈদিক ধর্মকে অস্বীকার করে আজও তন্ত্রসাধনার ধারা প্রবলরূপে বিদ্যমান। এই বিস্তৃত তন্ত্রসাধনার আঞ্চলিক পরিমাপ করা যাবে—পুরাণে বর্ণিত এই স্থানের ভৌগোলিক নির্দেশ থেকে। যেমন, বিষ্ণুপুরাণে লেখা আছে, কামাখ্যা মন্দির থেকে চতুর্দিকে একশ যোজন পর্যন্ত অর্থাৎ ৪৫০ মাইল পর্যন্ত এলাকা জুড়ে ছিল এর বিস্তৃতি। সবটা বর্ণনা বিশ্বাস্য না হলেও সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন কামরূপের মধ্যে ছিল অধুনা পূর্ববঙ্গের সবটা, সেই সঙ্গে আসাম এবং

ভূটান। যোগিনীতন্ত্রে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা নির্দেশ আছে এই ধরনের, যেমন, পশ্চিমে করতোয়া নদী থেকে পূর্বদিকে সিন্ধু এবং উত্তরে কুঞ্জগিরি থেকে দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাখ্যা নদীর সঙ্গম। অর্থাৎ এর মধ্যে ছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, ভূটান, রঙপুর ও কুচবিহার এবং উত্তরপূর্ব ময়মনসিংহ ও গারো পাহাড়। দেশটা ছিল চার ভাগে বিভক্ত, যেমন (১) কামপীঠ (করতোয়া থেকে সঙ্কোশ) (২) রত্নপীঠ (সঙ্কোশ থেকে রূপাই) (৩) সুবর্ণপীঠ (রূপাই থেকে ভরলি) এবং (৪) সৌমার পীঠ (ভরলি থেকে দিক্‌রাঙ্)।

কামরূপের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত আছে এখানকার দেবী মাহাত্ম্যও। কামরূপের সব চাইতে প্রাচীন যে রাজার নাম শোনা যায়, তাঁর নাম মহিরঙ্গ দানব। তারপরই শোনা যায় হটক অসুর, সম্বর অসুর ও রত্ন অসুরের নাম। এঁরা যে কারা, কি জাত সে-বিষয়ে জানার উপায় নেই। তবে আর্য নয় একথা বোঝা যায়। মেসোপোটেমিয়ার আসিরিয়ায় এরা ছিল অত্যন্ত সভ্য। কিন্তু অসুর নামে পরিচিত। ইরাণে এরা দেবতার সমগোত্রীয়। যেমন অহুর (অসুর) মজদ বা ভালর দেবতা ইত্যাদি।

হটক, সম্বর ও রত্ন অসুরের পর যাঁর নাম বিশেষ নজরে পড়ে তিনি হলেন ঘটক অসুর। ঘটক ছিলেন কিরাতদের প্রধান। এই কিরাতরা মদ্য মাংসে আসক্ত। মনু সেইজন্য এদের বলতেন ম্লেচ্ছ। শিব ছিলেন এই কিরাতদেরই এক দেবতা। হিমালয় দুহিতা গঙ্গা ও উমা—এই কিরাতদের কন্যা বা স্ত্রী। সে-জন্য তাদের এক নাম কিরাতী।

ঘটককে পরাজিত করে কামরূপে ক্ষমতা পেয়েছিলেন নরক অসুর। এই নরককে নিয়ে পুরাণ ও তন্ত্রগ্রন্থে নানা গল্প আছে। এই সব শাস্ত্রমতে নরক হলেন বিষ্ণুর পুত্র। বিষ্ণু যখন বরাহ অবতার হয়েছিলেন তখন তাঁর ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে নরকের জন্ম। বিদেহরাজ জনক যেমন সীতাকে পেয়েছিলেন লাঙলের ফলায়, তেমনি পেয়েছিলেন নরককেও। এই নরকই প্রাগজ্যোতিষপুরে তাঁর রাজধানী স্থাপন

করেছিলেন। তিনিই কামাখ্যাতে ব্রাহ্মণদের এনে বসিয়েছিলেন। পশ্চিমে করতোয়া থেকে পূর্বে দিক্‌রাঙ নিয়ে বিরাট এক রাজ্য ছিল নরকের। বিদর্ভ রাজকন্যা মায়াকে বিবাহ করেন তিনি। বিষ্ণুর আশীর্বাদে তাঁর অবিশ্বাস্য উন্নতি হয়েছিল। বিষ্ণুর কাছ থেকেই তিনি কামাখ্যা দেবীর আরাধনা করতে শিখেছিলেন। কামাখ্যা দেবীর আশীর্বাদে তার অবিশ্বাস্য উন্নতিও হয়েছিল। কিন্তু শোণিতপুরের রাজা বান অসুরের প্রভাবে তাঁর মনে দুষ্ট বুদ্ধি জন্মে। নরক ধর্মপথ ছেড়ে পাপের পথে নামেন। নিজের শক্তিমত্তায় অন্ধ হয়ে তিনি কামাখ্যা দেবীকে বিবাহ করতে চান। দেবী কামাখ্যা শর্ত দেন যে, নরক যদি এক রাতের মধ্যেই নীলপাহাড়ের উপর দেবীর একটি মন্দির, মন্দিরে উঠার সিঁড়ি ও পুষ্করিণী করে দিতে পারেন তবে দেবী তাঁকে বিবাহ করবেন। নরক রাজী হলেন। অসংখ্য শ্রমিক লাগিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন তিনি। অসম্ভবকে প্রায় সম্ভব করে আনলেন নরক। এক রাতের মধ্যেই প্রায় সবকাজ সমাধা করে ফেললেন। তখন দেবী মায়া বিস্তার করলেন। কাজ শেষ হবার সামান্য আগেই রাতশেষের জানান দিয়ে একটা মোরগ ডেকে উঠল। দেবী বললেন শর্ত পূরণ হয়নি। সুতরাং তিনি নরককে বিবাহ করবেন না। ক্রুদ্ধ নরক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন মোরগের উপর। সেখানেই হত্যা করলেন মোরগটিকে। যেখানে তিনি মোরগটিকে হত্যা করেছিলেন, আজো তার নাম কুক্‌রাকাটা।

নরকের ব্যবহারে দেবী রুষ্ট হলেন। নরকও ক্রুদ্ধ হলেন দেবীর উপর। তিনি স্থির করলেন কামরূপে আর কামাখ্যা দেবীর পূজা হতে দেবেন না। এমন সময় ঋষি বশিষ্ঠ একদিন এলেন কামরূপ কামাখ্যাতে মাকে পূজো দিতে। নরক পূজো করতে দিলেন না। ক্রুদ্ধ হয়ে বশিষ্ঠ দেবী ও নরক অসুর দুইয়েকেই অভিশাপ দিলেন। বললেন, কামাখ্যাকে পূজো করলে কারো মনোস্কামনা পূর্ণ হবে না। পরে অবশ্য শিবের হস্তক্ষেপে অভিশাপের সময়কাল কমে যায়। তিনশ

বছর পরে আবার দেবী পূজায় লোকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে এই ব্যবস্থা করে দেন তিনি। এর পরই নরকের ভাগ্য বিরূপ হয়। দেবী কামাখ্যা ও বিষ্ণু দুজনেই নরকের উপর ক্ষুব্ধ হন। শেষপর্যন্ত বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে নরককে হত্যা করেন।

নরকের আমলের সেই কামাখ্যা মন্দির এখন আর নেই। সময়ের আক্রমণ ও মুসলমানদের হস্তক্ষেপের ফলে সে মন্দির নষ্ট হয়ে গেছে। নতুন মন্দির তৈরি করেছেন কোচরাজা নরনারায়ণ। সময় ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। মন্দির তৈরি হয় তন্ত্রমতে। প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা বহন করে কামাখ্যা নতুন করে প্রতিষ্ঠিতা হন। তামার টাটে দেবীকে গুণে গুণে ১৪০টি নরমুণ্ড উপহার দেওয়া হয়। সেই আদি কা-মেই-খা, কা-ছাইখাস্তি বা কামাখ্যা নতুন করে আবার জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন। তন্ত্রমতে জাগ্রতা হয়ে দেবী আবার নতুন করে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা হন। আজো সবাই মা কামাখ্যাকে অত্যন্ত জাগ্রত বলেই মনে করেন। কালিকাপুরাণে দেবীর মাহাত্ম্য এইভাবে লেখা আছে :

'কামার্থমাগতা যস্মান্নয়া সাদ্ধং মহাগিরৌ।
কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলকূটে রহোগতা॥
কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা, কামাঙ্গদায়িনী।
কামাঙ্গনাশিনী যস্মাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে॥'

অর্থাৎ ভগবান মহাদেব বলছেন যে, এই দেবী অভিলাস পুরণের জন্য আমার সঙ্গে নীলকূটে আসায় নামলাভ করেছেন কামাখ্যা। তিনি কামদা, কামিনী, কামা, কান্ত', কামদায়িনী এবং কামনাশিনীও বটেন। সে-জন্যও লোকে বলে কামাখ্যা। এই কামাখ্যা দেবীও যে তান্ত্রিক দেবী এই শ্লোকে তার প্রমাণ আছে। দেবীর কামরূপ তন্ত্রের মৈথুন অংশকে কেন্দ্র করেই। এই মৈথুন বাহ্যতঃ ভোগের প্রতীক হলেও পরিণতিতে কামনাশিনী।

কামাখ্যার মূলতঃ কোন মূর্তি নেই। যোনিপ্রতীকই হল দেবীর প্রতীক। এই যোনি সতীর যোনি বলে লোকের ধারণা। যোনি

মণ্ডলের পরিমাণ এই ধরনের যেমন, এর দৈর্ঘ্য ২১ আঙ্গুল এবং প্রস্থ এক বিতস্তি অর্থাৎ আধ হাত। সব সময়ই সিঁদুর ও কুঙ্কুমে চর্চিত। এই যোনি পীঠ লাল শালুতে ঢাকা থাকে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস দেবী এখানে প্রতিমাসে রজস্বলা হন।

দেবীর মন্দির পাহাড়ের উপর। পাহাড় যে খুব ছোট তা নয়। আঁকা বাঁকা সর্পিল পথে অনেকক্ষণ ধরে উপরে উঠতে হয়। পাহাড়ের চূড়ায় মায়ের মন্দির। মন্দিরের চার পাশে পাণ্ডাদের ঘর বাড়ি। পাশেই আশ্চর্য দৃশ্য। কেরল সমুদ্রের উপকুলে নারকেল কুঞ্জের মত পাহাড়ের উপর নারকেল বনের সারি। আশে পাশে ছোট ছোট জঙ্গল। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। উত্তর দিকে পাহাড়ের পাদদেশে স্পর্শ করে তীব্রগতি ব্রহ্মপুত্র প্রবহমান। মন্দিরের মুখে প্রতিষ্ঠাতা রাজা নরনারায়ণ ও তাঁর দিগ্বিজয়ী ভ্রাতা চিলারায়ের পাষাণ মূর্তি স্থাপিত। পাহাড়ের উপর কালোপথরের বেশ বড় মন্দির কামাখ্যা মায়ের। উপরে গম্বুজ। পাশে পুষ্করিণী। মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকে মায়ের দর্শনের জন্য সিঁড়ি বেয়ে অনেক নিচে নেমে যেতে হয়। সেখানে গর্ভগৃহে মায়ের অধিষ্ঠান। চতুর্দিকে একটা অদ্ভুত গুমোট ভাব। একটি মাত্র দীপ জ্বলছে। ঐ রহস্যময় দীপালোকেই পূজা আরতি হয়। ধাতুর আবরণে আবৃত রয়েছে শিলাখণ্ড অর্থাৎ মায়ের যোনি। এই পরম শিলার স্পর্শ লাভের জন্য অম্বুপাচি উপলক্ষ্যে এখানে লক্ষ লক্ষ তীর্থ যাত্রীর সমাবেশ ঘটে।

কামাখ্যা মন্দিরের কিছু দূরে একটি কালীমন্দির আছে। কিন্তু কোন মূর্তি নেই। সবই এখানে পীঠস্থান। একটি কালোপাথরে সিঁদুর মাখিয়ে রাখা হয়েছে। এতেই মায়ের পুজো হয়। আর একটু চড়াই অতিক্রম করলে ভুবনেশ্বরের মন্দিরে যাওয়া যায়। এখানেও কোন মূর্তি নেই। কালীমন্দিরের মত কালো পাথরে পুজো হয়।

পাহাড়ের উপর একটু চড়াই ভেঙে যদি নীলাচল পর্বতের শিখর দেশে উঠা যায় তাহলে প্রকৃতির নয়নাভিরাম দৃশ্য নজরে পড়ে। দৃষ্টির

সামনে ভেসে উঠে খাসিয়া জয়ন্তিয়া গারো পাহাড়ের শ্রেণী। কৃষ্ণ মেঘের রেখার মত গাঢ় শ্যামলিমায় সব আচ্ছাদিত। সিঁথির মত সরুপথ অরণ্য ছায়ার নিচ দিয়ে চলতে চলতে হারিয়ে গেছে। এটা শিলং যাবার পথ। সম্মুখ ভাগ গৌহাটি পাহাড়ের আড়াল দিয়ে ঢাকা। নিচে ইস্পাতের পাতের মত তির্যক ব্রহ্মপুত্র। ব্রহ্মপুত্রের বুকে আর একটি পাহাড়ের শীর্ষদেশ। মা কামাখ্যার ভৈরব উমানন্দের মন্দির আছে সেখানে। নীলাচল শিখর থেকে চতুর্দিকের পরিবেশ দেখতে দেখতে মনে পড়ে একটি স্তোত্র :

"যোনিপীঠ কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা।
যত্রাস্তে মাধবঃ সাক্ষাদুমানন্দোহ ভৈরব।'

এই দেবী কামাখ্যা ও উমানন্দের জন্য এখানে সেই প্রাচীনকাল থেকে অসংখ্য পুণ্যার্থী ভিড় জমিয়েছে। অসংখ্য নবীন সন্ন্যাসীও ভিড় করছে। এইজন্য কামাখ্যা তন্ত্রপীঠের অন্যতম একটি পীঠ।

কামাখ্যা বলতে যে একটি নির্দিষ্ট স্থানই বোঝায় তা নাও হতে পারে। কামাখ্যা বেশ একটি বিরাটায়তন স্থান। সেই স্থান জুড়ে যুগে যুগে অসংখ্য সাধক কামরূপ কামাখ্যাতে ভিড় করছে। তাদের অধিকাংশেরই স্থান কামাখ্যা মন্দিরের চতুস্পার্শ। তবে বৃত্ত একটু বিস্তৃত করে দিলে আরও অনেক সাধনপীঠ কামাখ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়। কামাখ্যায় এত তন্ত্র-সাধকের ভিড় যে, তাঁদের মধ্য থেকে কোন বিশেষ একজনকে বেছে নিয়ে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা দুরূহ। অপর পক্ষে কামাখ্যার বিখ্যাত সব তন্ত্র সাধকদের নিয়েই যদি লিখতে হয় তাহলে এক কামাখ্যাই একশ হয়ে উঠে। একান্নপীঠের সমস্ত সাধকের জীবনী গ্রন্থ লেখা একক জীবনের পক্ষে সম্ভব হয় না। সেইজন্য কামাখ্যার ছায়ায় বসা এক বিরাট রহস্যময় পুরুষ সম্পর্কে আলোচনা করছি যাঁর নাম নেই, কিন্তু যিনি পিশাচসিদ্ধ নামে পরিচিত। অনেক তাঁকে বলেন বগলা বাবা।

বগলা বাবা ঠিক কামাখ্যায় থাকতেন না, অর্থাৎ কামাখ্যা মন্দির

সংলগ্ন অঞ্চলে যেখানে তন্ত্রাভিলাসী অসংখ্য সাধক সাধনা করে সিদ্ধি লাভের চেষ্টা করতেন, সেখানে থাকতেন না। তবে কামাখ্যা দেবীর ছায়াতেই কামাখ্যা মন্দির ও গৌহাটির মধ্যবর্তী অঞ্চলে ব্রহ্মপুত্রের ধারে নিবিড় অরণ্যে থাকতেন তিনি। বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদেও এই অঞ্চলে নানাস্থানে নিবিড় অরণ্য ছিল। এই অরণ্যের মধ্যে জনগণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকতেন তিনি। অধিকাংশ সাধকের যেমন আত্ম প্রচারের কামনা থাকে, গুরুগিরির বাসনা থাকে তাঁর তেমন কিছুই ছিল না। বক্রেশ্বরের অঘোরী বাবার মত তিনিও নির্জনে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতেন। সাধারণ লোকে তাঁর ধারে কাছে যেতে ভয় পেত। অনেকে তাঁকে বলত কাপালিক। নরবলি দিয়ে পূজা করতেন এই ধরনের বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাস থাকার জন্য লোকে তাঁর ধার কাছ দিয়ে আরও ঘেঁষতো না। লোকের ধারণা ভূতপ্রেত নিয়েই তাঁর কাজ। মন্ত্র বলে এক অপ্সরাকে ধরে রেখে ভৈরবী করেছেন। ভূতপ্রেত আর সেই অপ্সরা ভৈরবী নিয়েই থাকেন। কোথাও যান না, বা কারো সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না।

কেউ যদি বগলা বাবা বা সেই পিশাচসিদ্ধের কাছে যেতে চাইতেন, স্থানীয় লোকেরা বার বার মানা করতেন। বগলা বাবার কাছে গেলে কেউ আর কখনও ফিরে আসে বলে লোকের ধারণা নয়। পিশাচসিদ্ধ কাপালিক তাকে বলি দেন। তারপর সেই মৃত লোকের আত্মাকে ধরে রেখে তার ভূতকে দিয়ে নিজের নানা কাজ করিয়ে নেন।

দু'এক জন যাঁরা তাঁর কাছে গিয়েছিলেন, বাবাকে দেখাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তাঁদেরও ধারণা, লোকটা অস্বাভাবিক। দেখতে কুৎসিৎ। হাতে একটা খাঁড়া নিয়ে ঘুরে বেড়ান। লোক দেখলেই কাটতে আসেন। মন্ত্রবলে এক অপ্সরীকে বেঁধে রেখেছেন। তাঁর রূপের তুলনা নেই। রাত্রি হলেই ভূত প্রেতের নৃত্য শুরু হয়ে যায় তাঁর আশ্রমের আঙিনা জুড়ে।

১৯৫০ সাল নাগাদ কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক গিয়েছিলেন

কামাখ্যায়। তন্ত্রবিষয়ে অপার কৌতূহল। এ বিষয়ে বিস্তৃত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যই কামাখ্যা গিয়েছিলেন। সেখান থেকে পিশাচসিদ্ধের কথা শুনে তাঁর কৌতূহল হয়। লোকের নিষেধ অগ্রাহ্য করেও পায়ে হাঁটা পথে ব্রহ্মপুত্রের তীর ধরে তিনি সেই পিশাচসিদ্ধের আশ্রমের দিকে এগিয়ে যান। সারা দিন জঙ্গল দিয়ে হেঁটে হেঁটে তিনি বিকেলের দিকে সেই পিশাচসিদ্ধের আশ্রমের কাছে এসে উপস্থিত হন।

আশ্রম বলতে কামাখ্যার ধারে কাছে অসংখ্য সাধকের যেরকম আশ্রম আছে সেরকম আশ্রম নয়। প্রকৃতির স্বাভাবিক অরণ্যকে একটু থাকবার মত করে গুছিয়ে নেওয়া। কয়েকটি কাঠের উপর কোন রকমে ছাউনি দেওয়া। এরকম দুটি ঘর। ছোট ছোট জানালা। একদিকে বারান্দা। ছোট একটা আঙিনা।

কলকাতার সেই ভদ্রলোক অদম্য সাহসী হলেও এই কাপালিকের বীভৎসতা সম্পর্কে আগে থাকতেই নানা কাহিনী শোনার জন্য ভয় পাচ্ছিলেন। ভাবছিলেন কি করবেন। হঠাৎ যদি বিপদই হয় আত্মরক্ষা করবেন কি করে। যথার্থই লোকের কথা না শুনে তিনি ভাল করেছেন কি মন্দ করেছেন তাই ভাবতে লাগলেন। এমন সময় এক অপূর্ব দৃশ্য দেখে তিনি চমকে গেলেন। দেখলেন, আঙিনার একটা গাছের ডালে এক অপূর্ব সুন্দরী রমণী কাপড়ের খুঁট বাঁধছেন বা খুলছেন। দেখতে অনেকটা কামরূপ অঞ্চলের গেরস্ত ঘরের বৌ-ঝিয়ের মত। গৌরবর্ণ। কপালে জ্বল জ্বল করছে সিঁদুরের ফোঁটা। পরিধানের শাড়ি গাঢ় লাল। রূপের ছটা এত তীব্র যে, গড়নে একটা সাধারণ মানবীর মত হলেও ইহ-লোকের কোন জীব বলে মনে হয় না তাকে। রামায়ণ মহাভারতে অপ্সরাদের যে রূপের কথা পড়েছেন অবিকল সেই রকম। যেন তুলিতে আঁকা ভ্রূযুগল। নীলাভ চোখের মণি। তাকে দেখেই ভদ্রলোকের মনে পড়ে গেল আশেপাশের লোকে যে অপ্সরার কথা বলেছিল সেই অপ্সরার কথা। মনে হল, এ মানবী হতে পারে না, যথার্থই অপ্সরা। তন্ত্রবলে কেউ তাকে বেঁধে

রেখেছেন। তখন সেই বীভৎসরূপ বগলা বাবার কথা ভেবে তাঁর ভয় হ'তে লাগল। সত্যিই যদি তিনি নরহত্যাকারী কাপালিক হন! তা হলে!

সেই অপ্সরার সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় হল। কিন্তু সেই দৃষ্টিতে অভূতপূর্ব একটা করুণার ছায়া ছাড়া অন্য কিছু তিনি দেখতে পেলেন না। ভীতির কোন চিহ্ন সেখানে নেই। যেন একটা বরাভয়। এতে কিছুটা ভরসা পেয়ে হাত জোড় করে তিনি নমস্কার করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এখানেই কি কৌল বগলা বাবা থাকেন?

সেই অপূর্ব রূপলাবণ্যময়ী একটু হেসে ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন। কেন হাসলেন, কি উদ্দেশ্যে হাসলেন, তিনি বুঝতে পারলেন না। একটা বিদ্যুৎ যেমন অকস্মাৎ মেঘ চিড়ে দেখা দিয়ে তাকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ না দিয়ে ডুবে যায়, তেমনি মহিলাটি তার হাসির কোন অর্থ খুঁজে বার করবার সুযোগ দেবার আগেই হন্ হন্ করে হেঁটে ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ভদ্রলোক একা একা দাঁড়িয়ে সেই হাসি বিশ্লেষণ করে তার অর্থ খুঁজবার চেষ্টা করলেন। সেই হাসির অর্থ বোঝার উপর তাঁর থাকা না থাকা নির্ভর করছে।

তিনি আপন মনে ভাবছিলেন, হঠাৎ এমন সময় এক বীভৎস দৃশ্য দেখে চমকে উঠলেন। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এক দীর্ঘদেহ মূর্তি। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। দেখতে অকল্পনীয় কুৎসিৎ। হাতে একখানা রাম দা। এমন ভয়াবহ দৃষ্টিতে তিনি ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন যে, তার বুকের ভিতর হৃদপিণ্ডটা হাতে-ধরা একটা পাখির মত কাঁপতে লাগল। ভয়ানক রক্তবর্ণ তাঁর চক্ষু দুটি। সুরাপানে উন্মাদ ব্যক্তির চোখের মত। গোখরো সাপের মত যেন ক্রোধে ফুঁসছেন। অত্যন্ত কর্কশ-কণ্ঠে বললেন, কে তুই? এখানে কি চাস?

ভদ্রলোক নিতান্তই ভয় পেলেন। বুঝতে পারলেন যে, ইনিই সেই কাপালিক, পিশাচসিদ্ধ। সম্ভবতঃ এবার আর তার নিস্তার নেই। অন্য কেউ হলে হয়তো তৎক্ষণাৎ ছুটে পালিয়ে যেতেন। কিন্তু

কেন যেন ভদ্রলোক সেই পথ নিলেন না অথবা নিতে পারলেন না। বোধ হয় পা-ছুটো অবশ হয়ে এসেছিল। সেইজন্য সিঁড়ির ধাপে বসে পড়লেন। কিন্তু আশ্চর্য! সেই কাপালিক আর এগুলেন না। দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হল আকাশে সূর্যোদয়ের ছটা দেখা দেবে। সূর্য ওঠার প্রাকমুহূর্তে আকাশের মত কাপালিকের ঠোঁটের ফাঁকে একটা হাসির পূর্বাভাষ লক্ষ্য করা গেল। ঠিক সেই সময় চেটাইয়ের আসন হাতে সেই অপ্সরাটি বেরিয়ে এসে দাওয়ায় তা পেতে দিলেন, বসুন বাবা।

ভদ্রলোক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে একবার সেই কাপালিক, আর একবার সেই অপ্সরার দিকে তাকালেন।

সেই কাপালিক একটু হাসলেন কিনা বোঝা গেল না। তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। তারপর খাঁড়া হাতে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। ভদ্রলোক ঘামছিলেন। এই এতক্ষণ পরে যেন একটি শীতল হাওয়া পেয়ে জুড়ালেন। কপালের ঘাম মুছে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সেই অপ্সরাকে প্রণাম করে বললেন, মা, একি হল? যথার্থই অপ্সরার ছুই চোখে তখন স্নিগ্ধ মাতৃত্বের অপূর্ব ছায়া। তিনি তখন মা। মা বললেন, বাইরে থেকে কোন লোক এলে উনি প্রথমে ঐ রকম করেন। খাঁড়া হাতে ঘর থেকে বের হন। ওঁকে খাঁড়া হাতে দেখলেই লোকে পালায়। উনি হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকেন। আসলে উনি পরীক্ষা করেন, যে এল, সে কেন এল। সত্যিই ধর্মপথের তারা পথিক, না এমনি লোক। মায়ের কৃপা যাঁর উপর আছে তিনি এতে ভয় পান না। তখন তাঁর সঙ্গেই উনি কথা বলেন। বুঝতে পারেন আগন্তুক যথার্থই শক্তি-সাধক।

ভদ্রলোকটি বললেন, তাহলে আর কোন ভয় নেই মা?

—না। আপনি যখন শক্তিসাধক তখন কোন ভয় নেই।

—আমি যে শক্তিসাধক তা বুঝলেন কি করে?

মা বললেন, আমরা বুঝতে পারি।

—কি ভাবে ?

—মায়ের কৃপাতেই বুঝতে পারি।

ভদ্রলোক নিজের অন্তরের মধ্যে অনুসন্ধান করে দেখলেন। নিজের মনের মধ্যেই বিচার করবার চেষ্টা করলেন যে, তিনি যে এখানে থেকে গেলেন তা কি যথার্থ ই একটা কৌতূহল থেকে না, চলৎশক্তি রহিত হয়েছিলেন বলে ? দেখতে পেলেন যে, তাঁর অন্তরের মধ্যে যথার্থ ই শক্তিতত্ত্ব জানার আগ্রহ প্রবল। এবং সে-জন্যই তিনি ভারতবর্ষের নানা তন্ত্রপীঠ পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। বগলা বাবা যথার্থ ই তাঁর কৌতূহলের কথা জানতে পেরেছেন। এঁদের রহস্য বোঝা ভার। কিছুটা যেন স্বস্তি বোধ করলেন তিনি। মহাশাক্তপীঠ কামাখ্যাতে তিনি শক্তিতত্ত্ব জানার জন্যই এসেছিলেন। সেজন্যই বেশ কিছুদিন তিনি সেখানে ছিলেন। উমাপতি বাবার মত শক্তিধর সাধক দেখেছেন সেখানে তিনি। এলোকেশীর মত ভৈরবী দেখেছেন। দেখেছেন উচ্চাটন সিদ্ধ ভৈরব। তন্ত্রের নামে যৌন ক্ষুধাতুর অনেক সাধককেও দেখেছেন। ভেকধারী সন্ন্যাসীও নজরে পড়েছে। এদের মধ্যে একমাত্র উমাপতি ছাড়া আর কাউকে তাঁর মনে ধরেনি। উমাপতি শান্ত, ধীর, জ্ঞানী। কিন্তু কোন অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করেন নি। কিন্তু তন্ত্রাভিলাষী এই ভদ্রলোকের তন্ত্রের অলৌকিক শক্তির দিকেই বেশী ঝোঁক। এর ক্রিয়াকলাপও কিছু প্রত্যক্ষ করতে চান। সেটি পাননি বলেই বগলা বাবার নাম শুনে সেখানে এসেছিলেন। তন্ত্র-সাধকের কাছে ঐহিক সুখের কামনায় কোন আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে তিনি আসেননি। এসেছেন এ-সম্পর্কে জানতে। বগলা বাবা যে যথার্থই তা ধরতে পেরেছেন, এটা জেনে তিনি পুলক অনুভব করলেন। বললেন, তাহলে বাবার দেখা পাব তো ?

মা বললেন, বসুন, উনি যখন বাইরে আসবেন কথাবার্তা হবে। ওঁর খেলাই এই ধরনের।

ভদ্রলোক অপেক্ষা করতে লাগলেন। যথার্থ সাধক দেখার

বাসনাতে তিনি দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ প্রান্ত ঘুরে তবে তিনি কামাখ্যা এসেছেন। এর মধ্যে দু'জন মাত্র সিদ্ধপুরুষ তাঁর নজরে পড়েছে। একজন বহুদিন আগে দেখা তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা এবং আর একজন ফরিদপুরের জগৎপ্রভু মহাত্মা। বক্রেশ্বরের অঘোরী বাবাকেও তিনি দেখেছেন। তাঁর অঘোরাচার লক্ষ্য করেছেন। জ্ঞানের কথাও তাঁর কাছ থেকে অনেক শুনেছেন। কিন্তু অঘোরী বাবা তাঁকে অলৌকিক কোন শক্তি দেখাননি। অঘোরী বাবাও এক ধরনের পাগলা, বগলা বাবার মতই। অঘোরী বাবা তাঁকে কোন সিদ্ধাই দেখাননি। বগলা বাবার কাছে সেই সিদ্ধাইয়ের খবর তিনি পাবেন বলে মনে করলেন।

ব্রহ্মপুত্রের ধারে অরণ্যাবৃত বগলা বাবার আশ্রম খুবই নির্জন। মগ্নচৈতন্য হয়ে ডুবে থাকার জন্য অপূর্ব পরিবেশ। আপন হৃদয়ের মধ্যে বগলা বাবাকে নিয়েই চিন্তা করছিলেন ভদ্রলোক। এমন সময় মা জিজ্ঞেস করলেন, কতদূর থেকে আসা হচ্ছে বাবা? দেশ কোথায়? কি কর? এখানেই বা এসেছ কেন?

ভদ্রলোক বললেন, দেশ কলকাতা। কাজ কিছুই করি না। এসেছি তন্ত্র সম্পর্কে জানতে।

—তন্ত্র সম্পর্কে এত কৌতূহল কেন?

—তা তো জানি না মা। তবে আমার ধারণা অধ্যাত্ম সাধনার জন্য তন্ত্র খুব বড় হাতিয়ার। বর্তমানে লোকে তন্ত্রের আসল পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু তন্ত্রের সত্য পরিচয় পাওয়া গেলে অধ্যাত্ম সাধনার একটি বড় পথ আবার খুলে যাবে।

মা কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রত্যুত্তর না করে অন্য কথা বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিছু খাবে বাবা? জিজ্ঞাসা করতাম না। আগেই হয়তো খাবার নিয়ে আসতাম। কিন্তু এখন বিকেল। তার উপর তুমি সাধক। আসনে বসবার আগে কিছু খাবে কিনা বুঝতে পারছি না বলেই জিজ্ঞেস করলাম।

মায়ের কণ্ঠে যেন স্নেহরসের সুধা ঢালা। ভদ্রলোক নিতান্তই মোহিত হলেন। ইতিমধ্যে মা ঘর থেকে একটি নরম কাঁথা ভাঁজ করে এনে ভদ্রলোককে বললেন,—কাঁথাটা বিছিয়ে বস বাবা। অনেকক্ষণ তো বসতে হবে। চ্যাটাইয়ের আসনে এতক্ষণ বসা যায় না।

ভদ্রলোক দেখতে পেলেন একটু দূরেই চ্যাটাই। তার উপর শতরঞ্চ বিছানো। শতরঞ্চের উপর পুরু একখানি বাগছাল এনে বিছিয়ে দিলেন। এই আসনে ছিল খুব খাটো পায়ার একখানি নিচু চৌকি। ভদ্রলোক ঐ আসনের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন। এই ধরনের আসন কেন সে-কথা ভেবে এর জবাব খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু নিজের মনের মধ্যে এ প্রশ্নের জবাব পাবার আগেই ঘর থেকে দিগম্বর বগলা বাবা বেরিয়ে এলেন। এখন তাঁর মধ্যে সেই ভয়ঙ্করিতা নেই। মূর্তি সৌম্য। কিন্তু চোখ দুটি লাল। গলায় একগাছি রুদ্রাক্ষ ও হাড়ের মালা। হাতের বাজুতেও রুদ্রাক্ষ এবং প্রবাল, নীল ও লাল পাথরের মালা জড়ানো। তিনি এসে সেই আসনে বসলেন। ভদ্রলোক লক্ষ্য করে দেখলেন, বগলা বাবার চোখ একটু ট্যাঁড়া। ভদ্রলোকের মধ্যে ট্যাঁড়া সম্পর্কে একটা সংস্কারগত ভয় ছিল। তিনি যেন একটু দমে গেলেন। বগলা বাবা কি বলেন সেইজন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু বগলা বাবা কোন কথাই বললেন না।

বগলা বাবা নীরবে বসে রইলেন। মা আশ্বাস দিয়েছিলেন তিনি কথা বলবেন, কিন্তু কথা বলার কোন লক্ষণই তাঁর মধ্যে দেখা গেল না। ইতিমধ্যে মা দুটি ডিজ হ্যারিকেন জ্বেলে একটি ওখানে রেখে অপরটি নিয়ে নিজে ভেতরে গেলেন। তারপর একটি ছোট মদের বোতল এনে রাখলেন। পাথরের একটি বাটিতে মাছ মাংস ও মুদ্রাদি উপকরণ এনে চৌকির উপর রাখা হল। এরপর জল ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক সব এল। ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন, তন্ত্রের পঞ্চ-মকারের যে অনুষ্ঠান হয়, তাই হবে। এরকম একটা অলৌকিক অনুষ্ঠান তিনি বক্রেশ্বরের শ্মশানে অঘোরী বাবাকে কেন্দ্র করে দেখেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ

সময় এ অনুষ্ঠান একটা পৈশাচিক রূপ নেয়। গৃহী মানুষের পক্ষে এ-সব দেখলে গা ঘিন্‌ঘিনিয়ে উঠে। পঞ্চ-মকারের পশ্বাচার ক্রিয়া-কলাপ সাধারণ মানুষের চোখে অসহ্য ঠেকে। ভদ্রলোক ভাবতে লাগলেন, তিনি এসব দেখবেন, না দেখবেন না। সরাসরি সামনে বসে এ-সব তিনি সহ্য করতে পারবেন না বলে মনে করলেন। বক্রেশ্বরে ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছিলেন। সাতপাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত তিনি উঠেই দাঁড়ালেন। বিকৃতাক্ষ সেই বগলা বাবা সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠলেন, উঠছ কোথা! এখনই তো চক্র আরম্ভ হবে?

ভদ্রলোক বললেন, এই একটু বাইরে থেকে আসছি। তাঁর ইচ্ছা ছিল উঠে সটান রাজপথের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করে দেবেন। একবার রাজপথে উঠতে পারলে গৌহাটি যাওয়া তেমন সমস্যা হবে না। এ ধরনের চক্রক্রিয়া দেখবার তাঁর ইচ্ছে নেই। কিন্তু বগলা বাবা বাধা দিলেন। বললেন, তোমার মাথা খারাপ নাকি? বাইরে কেউটে, খরিস, গোখরোর রাজ্য। এ-তোমার কলকাতা নয়। এ-সন্ধ্যায় বার হতে পারবে না। হাত-মুখ ধোবে তো ধোও। জায়গা আছে।' আসনে বসেই ডাকলেন—মা।

মা এগিয়ে এলেন।

বগলা বাবা বললেন, একে হাত-মুখ ধোবার জায়গা দেখিয়ে দাও।

মা আগে আগে পথ দেখিয়ে তাঁকে পাথরে বাঁধানো একটা জায়গায় নিয়ে এলেন। তারপর মুখ না ঘুরিয়েই কানে কানে কথা বলার মত নিচু গলায় বললেন, বাবা, বাইরে দেখে ভুল বুঝো না, চলে যেও না। এসেছ যখন রাতটা এখানেই থাক। কোন অভাব হবে না। আমার কথা শুন, তোমার ভালই হবে।

ভদ্রলোক বললেন, আমি তন্ত্রমার্গের লোক নই মা। এ পথে তো আমার সাধনা নয়।

মা তেমনি ফিস্ ফিস্ করে বললেন, জাগ্রত শক্তিমন্ত্র পেয়েছ। এখানে মনে মনে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে বাধা কি? বাইরে যা-ই হোক না কেন, তাতে তোমার কী এসে যায়!

অদ্ভুত আকর্ষণে ভরা মায়ের বলার ভঙ্গী। ভদ্রলোকের মধ্যে একটা উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। কথা কয়টি শুনে যেন তা শান্ত হয়ে গেল। তিনি খুব সহজবোধ করলেন যেন। তাঁর মনে হল, এ-যেন স্বয়ং মা জগদম্বার নির্দেশ। তিনি বললেন, আপনার নির্দেশ মতই কাজ হবে মা।

ভদ্রলোক হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে এসে আসনে বসে স্থির হবার চেষ্টা করলেন। ভাবলেন, বাইরে যা-ই হোক না কেন, নিজের মনের মধ্যে ইষ্টমন্ত্র জপ করে সব এড়িয়ে যাবেন। আসনে বসে তিনি নিজের মধ্যে মন নিবিষ্ট করবার চেষ্টা করলেন। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে আসছিল। আশেপাশে চারদিকে শেয়াল ডেকে উঠল। নির্জন এই অরণ্যে সামান্য একটা আশ্রমের চারপাশ থেকে শিবাকুলের চিৎকারে ভদ্রলোকের হৃদ্‌পিণ্ড পর্যন্ত কেঁপে উঠল। মনের মধ্যে কোথায় একটা সুপ্ত ভীতি কাজ করছিল। সেই ভীতিই তাকে অস্থির করে তুলছিল হয়তো। বগলা বাবার মনে কি উদ্দেশ্য আছে কে জানে। তিনি কি কাপালিকের মত শেষ পর্যন্ত নরবলি দেবেন? কিন্তু মায়ের কণ্ঠস্বর কথা মনে করে আবার অনেকটা শান্ত হলেন। বগলা বাবা তখন জপ করছিলেন। মা-ও সব কাজ সেরে এসে তাঁর পাশে বসে জপ আরম্ভ করলেন। ভদ্রলোক লক্ষ্য করে দেখলেন, তাঁর দিকে তখন এঁদের কারো আর দৃষ্টি নেই। সঙ্গে সঙ্গে স্থান মাহাত্ম্যে অন্য রকম একটা অনুভূতি যেন তাঁর মধ্যে ঢেউ খেলে গেল। ভীতি ধীরে ধীরে কেটে যেতে লাগল। তিনি নিজের ইষ্টমন্ত্রে ডুবে যাবার চেষ্টা করলেন।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। প্রায় ঘণ্টাখানেক। চতুর্দিকে একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা থম থম করছে। অন্ধকার যেন ঘন আলকাতরার

মত জমাট বেঁধে উঠেছে। জোনাকির মায়াময় আলো জ্বলছে আর নিভছে। বগলা বাবা জপ শেষ করে মাকে বললেন, এবার এসো পাত্রটা দাও। তারপর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি এখন দেখ। আমরা খাই। তুমি শুধু শেষ খাবারটা খাবে। তখন আমরা দেখব, কেমন ?

কি ঘটনা ঘটবে, ভদ্রলোক অনুমান করতে পারছিলেন না। ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানিয়ে বললেন, সেটাই ভালো।

এক কাচ্চা তরল পদার্থ ধরে এমন একটা ছোট কালো পাথরের বাটি। তাতে কারণ ঢেলে মা বগলা বাবার হাতে দিলেন। বগলা বাবা তিনবার সেই পাত্রভরতি কারণ পান করার পরে মা গেলাসী থেকে তর্জনীতে তার এক ফোঁটা তুলে কপালে দিলেন। তারপর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, সরে এসো বাবা, ফোঁটা নাও অবজ্ঞা করতে নেই। এযে পূজার সামগ্রী। সবই এখন দেবীর প্রসাদ হয়ে আছে। ভদ্রলোক কোন দ্বিরুক্তি করলেন না। নিঃসঙ্কোচে এগিয়ে এসে কপালে ফোঁটা নিলেন। মাছের পাত্রে বড় বড় তিন চার টুক্‌রো মাছ ছিল। এরপর বগলা বাবা তা থেকে একটি মাছ তুলে নিলেন। একটি ভদ্রলোককে দিলেন। মা-ও একটুক্‌রো নিলেন শিবাভোগের জন্য একটুক্‌রো পড়ে রইল। ঘিয়ে ভাজা ছোট ছোট কয়েকটুক্‌রো রুটি ছিল। প্রত্যেকেই তা থেকে কয়েকখানা করে তুলে নিলেন। রুটির সঙ্গে তিন চার টুক্‌রো মাংস নেওয়া হল।

খাবার অত্যন্ত কম। খুন্নিবৃত্তি হবার কথা নয়। কিন্তু ভদ্রলোক ঐ সামান্য খাবার মুখে দিয়েই চমৎকার ক্ষুন্নিবৃত্তি বোধ করলেন খাওয়া শেষ হলে বিকৃতাক্ষ বগলা বাবা ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, বাবা তন্ত্রক্রিয়া দেখতে এসেছ, দেখ। ঘৃণা করে চলে গেলে তন্ত্র সম্পর্কে জানবে কি করে ? পঞ্চ-'ম'কারের চারটি কাজ খাদ্য, মাংস, মৎস্য ও মুদ্রা হল। বাকীটা দেখার জন্য তৈরি হও।

শেষটিকেই ভদ্রলোকের বড় ভয়। ঐটিকেই তিনি পছন্দ করেন

না। তাই বললেন, বাকী জিনিষ দেখবার নয়। দেখবার প্রবৃত্তিও আমার নেই। আমি বরং সরে যাচ্ছি।

বগলা বাবা হাসলেন। বললেন, নিজেদের ও কাজ সবাই দেখে। অপরের দেখেচ ?

ভদ্রলোক বললেন, কাজটা জঘন্য। হেয়ও বটে, এতো দেখবার নয়।

বগলা বাবা বললেন, পশুপাখির তো দেখেছ ?

—হ্যাঁ। কিন্তু ওদের ওটা স্বভাবজ কাজ।

—মানুষেরও যদি স্বভাবজ হত তাহলে দেখতে এতে ঘৃণার কিছু নেই।

—কিন্তু অধ্যাত্ম সাধনার এতে কি আছে ?

বগলা বাবা বললেন, জগতের মূলেই আছে স্বভাবজ মৈথুন। সেইজন্যই তোমার আমার অস্তিত্ব। সেইজন্যই তোমার অধ্যাত্ম জীবন সম্পর্কে কথা বলার অধিকার। নিজের উৎসকে ঘৃণা করবারই বা কি আছে।

ভদ্রলোক কি বলবেন, জবাব খুঁজতে লাগলেন।

কিন্তু তিনি কোন জবাব দেবার আগে বগলা বাবাই বললেন, বাবা, এরও প্রয়োজন আছে। এরও অধ্যাত্ম গুরুত্ব আছে। যার একটা সংযম ব্রত আছে, তার একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না। পরস্ব মৈথুনের দ্রষ্টা হলেই তো তাঁর সিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাবে। তাছাড়া জান তো—শাস্ত্র বলেছে, লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়। এই তিন থাকলে কোন কাজই হয় না। পার্থিব জীবনের কাজ হয় না, অধ্যাত্ম জীবনের কাজও হয় না। এ থেকে মুক্ত হতে না পারলে সিদ্ধিলাভ হবে কি করে। তাছাড়া মৈথুনকে তুমি জঘন্য কাজ বলে মনে করছ কেন ? তার মানে সহজভাবে নেবার মত মনের জোর তোমার নেই ?

ভদ্রলোক বললেন, সমাজে ওটা প্রচলিত নয়।

বগলা বাবা বললেন, সমাজ তো কৃত্রিমতা দিয়ে তৈরি।

ভদ্রলোক বললেন, কৃত্রিমতা তো ভালর জন্য।

—কি রকম?

—নইলে সমাজে বিশৃঙ্খলা হত।

—কেন?

—পশু জগতে হয়।

—পশু জগতে মৈথুনের বিশৃঙ্খলা সাময়িক। মৈথুনের একটা নির্দিষ্ট সময় পার হলে পশুদের মৈথুনের জন্য কোন আগ্রহ থাকে না। কিন্তু মানুষকে স্বভাবজ মৈথুন উপভোগ করতে দেওয়া হয়নি বলে মৈথুনের ক্ষেত্রে মানুষ প্রকৃতিকে উপেক্ষা করেছে। স্বাভাবিক প্রয়োজনের বাইরেও অস্বাভাবিক মানবিক চাহিদা তৈরি করে মৈথুনকে বিকৃত করেছে। মানুষের মৈথুনে পাপ ঢুকেছে।

ভদ্রলোক বললেন, জানোয়ারদের যা কাজ, তা মানুষ করলে মানুষের মনুষ্যত্ব কোথায়? মানুষ জানোয়ার নয় বলেই তো একাজ প্রকাশ্যে করে না। এনিমালিটি ও রেশনালিটি নিয়ে মানুষ। মানুষ নিজের বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা নিজেকে সংযত ক'রে সামাজিক নিয়ম-কানুন তৈরি না করলে—মানুষে পশুতে তফাৎ থাকত না। সুতরাং পশুর যে কাজ, মানুষের সে কাজ করে গৌরব নেই। সামাজিক মানুষ তাই মনে করে সর্বসমক্ষে মানুষের মৈথুন অন্যায় কার্য, ঘৃণ্য,হেয়।

বগলা বাবা হেসে বললেন, এই তো বাবা বলতে পারলে না আসলে ও কাজটা হেয় কেন।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো জানেন যে, ওটা হেয়। হেয় নয় কেন বলুন না।

বগলা বাবা বললেন, ওটাকে যদি ধর্মের অঙ্গ বলে ভাব তবে জঘন্য বা হেয় বলবে কি?

—আমাদের কাছে তবু ওটা হেয় বলেই মনে হবে। সম্ভবতঃ পশুদের কাজ থেকে একাজ একটু উন্নত হবে, এই যা।

বগলা বাবা হেসে বললেন, তুমি আসল কথাটা বলতেই পারলে না। মাকে জিজ্ঞেস কর, মা-ই তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন। তিনি মায়ের দিকে তাকালেন।

মা সবই শুনছিলেন, কিন্তু এতক্ষণ কোন কথাই বলেন নি। বগলা বাবার নির্দেশ পেয়ে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন। মায়ের কণ্ঠস্বরের মধ্যে অদ্ভুত একটা স্নিগ্ধতা আছে, অদ্ভুত একটা আকর্ষণী ক্ষমতা আছে। ভদ্রলোক মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন। মা বললেন, —ও কাজটা কামমূলক বাবা। সৃষ্টি আর সম্ভোগের কামনায় এর উৎপত্তি। সেইজন্যই এ কাজ হেয়। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হবে, ইন্দ্রিয় সুখ ছাড়া এতে আর কি আছে। ওটা শরীরের ভার, রক্তের বোঝা। নেমে গেলেই আরাম। দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর মল মূত্র ত্যাগেও এই রকম আরাম হয়। শারীর ধর্মে এরকম হয়। ওতে শরীরের স্ফূর্তি আছে, কিন্তু আনন্দ কোথায়? যাদের মধ্যে শুদ্ধ প্রেম আছে, ভালবাসা ঘনীভূত হয়ে আছে, তাদেরই এ-সব কাজকে হেয় বলে বোধ হয়। কারণ তারা জানে, এটা কামমাত্র—যথার্থ প্রেম-প্রীতির হন্তারক। ওটা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ শুদ্ধ প্রেমের স্থান হয় না।

তবে কি জান বাবা, জগদম্বা তাঁর জীবসৃষ্টির ধারা বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক কামপূর্ণ ঘটের মধ্যে একবিন্দু প্রেম মিশিয়ে দিয়েছেন। তাই যৌবনকালে সংসারমুখী স্ত্রী-পুরুষের মিলনকে প্রেমের সম্পর্ক বলেই মনে হয়। এই প্রেমবিন্দু ঠিক এক গামলা জলে এক ফোঁটা পুষ্পসারের মত। সারা জলটাই অল্পক্ষণের জন্য গন্ধে ভরে যায়। ব্যবহার করলে শরীর সুগন্ধি হয়ে উঠে। সংসারেও প্রেমের এমন মহিমা যে, নরনারীর কামময় অস্তিত্ব যৌবনের রঙে আগাগোড়াই প্রেমপূর্ণ বলে মনে হয়। আসলে সৃষ্টির প্রবৃত্তি সতেজ রাখার জন্যই স্রষ্টার এই কৌশল।

মনে মনে মায়ের কথার বিশ্লেষণ করছিলেন ভদ্রলোক।

ভাবছিলেন, সংসারে রক্তমাংসের দেহের প্রেম আর কামতো প্রায় একই ধরনের। কিন্তু তাঁকে চিন্তা করতে দিলেন না মা। কি করে তার মনের তরঙ্গ হুবহু ধরে ফেললেন, তাই বললেন, তা কি করে হবে। ও দুটো যে বিপরীতধর্মী বাবা।

—কিরকম? ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন।

মা বললেন, প্রেমে দুই অঙ্গ এক হয়ে যায়। কামে দুই শরীরের পৃথক অস্তিত্ব বিলীন হয় না। সম্ভোগের ফলে সাময়িক কালের জন্য এক মনে হলেও দু'জনের শরীর ও মন পৃথকই থাকে। কিন্তু শুদ্ধ প্রেমের এক ফোঁটাতে সিন্ধু প্রমাণ রস সৃষ্টি করে। যেখানে শুধুমাত্র কাম, সেখানে সংঘর্ষ। সংঘর্ষই কামের সার কথা।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে ভাবছিলেন—সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে অনেক দূরে, এই নির্জন অরণ্যে—এত তত্ত্বকথা আপাত দৃষ্টিতে অশিক্ষিতা এই মা জানলেন কেমন করে! তবে অধ্যাত্ম সাধনায় যাঁরা সিদ্ধি অর্জন করেন, তাদের কাছে কিছু অজ্ঞাত থাকে না বলেই জানা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু উপনিষদের সার কথা তাঁর বোধের মধ্যে সহজ হয়েছিল। বস্তু বিজ্ঞানের উন্নতির আগেই দ্রষ্টা ঋষিরা উপনিষদে যে তত্ত্বালোচনার অবতারণা করেছেন তা রীতিমত বিস্ময়কর। অন্তর চর্চা করলে জ্ঞান আপনিই উদ্ভাসিত হয়। এঁরা বোধহয় কৌল সাধনার অনেক উন্নত মার্গে বিচরণ করছেন। তা না হলে এমন কথা বলতে পারতেন না। মৈথুন সম্পর্কে তন্ত্রাভিলাষী সেই ভদ্রলোকের যে অবজ্ঞার ভাব, ঘৃণার ভাব ছিল, তা যেন অনেকটা কমে গেল।

মা কথা শেষ না করতেই বগলা বাবা বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলেন, বুঝলে কিছু? আর বুঝবেই বা কি, এতে বুঝবার আছেই বা কি? মোদ্দা কথা এই যে, দুই থাকতে কিছু হচ্ছে না বাবা।

হঠাৎ ভদ্রলোক কি জানি কেন, বোধহয় মুখ ফস্কেই বলে ফেললেন,

—আপনাদের তো শুনেছি সিদ্ধাবস্থা। আপনাদেরও এই মৈথুন চলে নাকি? শুনে বগলা বাবা হাসলেন, বিন্দুমাত্র বিরক্ত হলেন না। বললেন,—মৈথুন হল পরম তত্ত্ব বাবা। সাধনার এ হল শেষ পর্যায়। তখন যে দুইয়ে মিলে এক হয়ে যায়।

ভদ্রলোক বললেন, একথা দ্বিজ চণ্ডীদাসের কাব্যে পড়েছি। অনেকের মুখে শুনেছিও, কিন্তু কখনও দেখিনি।

বগলা বাবা অন্তর্ভেদি দৃষ্টি দিয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি প্রাক্তন কর্মফলে তন্ত্র সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছ। তন্ত্র সম্পর্কে জানবার জন্য দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছো। মনের মত তান্ত্রিকের দেখা পেয়েছ মাত্র দুটি ক্ষেত্রে, তারাপীঠে বামা ক্ষ্যাপার এবং বক্রেশ্বরে অঘোরী বাবার। বামা ক্ষ্যাপা এ-সব কিছুই দেখান নি। আড়ালে লুকিয়ে অঘোরী বাবার ক্ষেত্রে এই মিলন দেখেছ। কিন্তু পূর্ণমাত্রায় দেখনি।

ভদ্রলোক আশ্চর্য হয়ে বগলা বাবার মুখের দিকে তাকালেন। বগলা বাবা অন্তর্যামী নাকি! এ-সব তিনি জানলেন কি করে! বগলা বাবার বাইরের আকৃতি দেখে তাঁর মধ্যে যে খানিকটা অবজ্ঞার ভাব দেখা দিয়েছিল, তা যেন অনেকটা কেটে গেল। যথার্থই এই ভদ্রলোক তারাপীঠে খুব কম বয়সে বামাক্ষ্যাপার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। কিছুদিন আগেই বক্রেশ্বরের অঘোরী বাবাকে দেখে এসেছেন। তন্ত্রে পূর্ণ তৃপ্তি না হওয়াতে এখনও অনুসন্ধান শেষ হয়নি তাঁর। সেইজন্য এসেছেন কামাখ্যাতে। ভদ্রলোকের নাম পি. কে. চট্টোপাধ্যায়। নানা গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এই তন্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব জানার কৌতূহলে শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ভদ্রলোকের অবাক ভাব দেখে বগলা বাবা বললেন, কি বাবা, সব কথা বলে দিচ্ছি বলে চমকে যাচ্ছ নাকি! এ-সব কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। এর জন্য তন্ত্র করার প্রয়োজন হয় না। ভড়ং দেখাবার জন্য এ-সবের প্রয়োজন হয়। তন্ত্র হল অপার আনন্দের

ব্যাপার। তন্ত্রের চূড়ান্ত পর্যায় দেখবার জন্য তোমার প্রাক্তনের তাগিদেই তুমি এখানে এসে হাজির হয়েছ। তুমি মৈথুনের যথার্থ মূল্য বুঝতে চাও। অথচ তা না দেখেই, ওটাকে হেয় বলে দূরে সরে যাচ্ছিলে।

এত ক্ষমতা দেখেও ভদ্রলোকের অবচেতন মনে একটা সন্দেহ খেলা করছিল। ভাবছিলেন—তিনি বোধহয় অকস্মাৎ বেশী গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছেন বগলা বাবাকে। কাকচরিত্র আয়ত্ত করে লোকটা হয়তো তাঁকে ঠকিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের কালো কুৎসিৎ রোগা মানুষ দৈব ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। তূরীয় আনন্দের স্বাদ যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একটা অদ্ভুত দীপ্তি ফুটে উঠে। মুখ চোখ নাকের গড়নে বিচার করলে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব খুব সুপুরুষ নন। ঠোঁট দুটো ভয়ানক পুরু। অথচ সারা দেহে সাধনা-সিদ্ধির অপূর্ব দীপ্তি। কিন্তু এই বগলা বাবার মধ্যে সেটা কোথায়?

ভদ্রলোক যখন দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে এই সব ভাবছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল মায়ের দিকে। দেখলেন, মা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখে চোখে হতেই বললেন, স্থূল নিয়ে পড়ে আছ বাবা, রূপ আকড়ে আছ, সিদ্ধ অসিদ্ধ বুঝবে কি করে?

যেন শঙ্কর মাছের লেজের একটা চাবুক খেলেন ভদ্রলোক। নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বলে মনে করলেন। তিনি চোখ নামিয়ে নিলেন। তারপর বোধহয় মার্জনা চাইবার জন্যই বগলা বাবার দিকে তাকালেন।

বগলা বাবা বললেন, দুই প্রহর হয়ে গেল। এখন আসনে বসতে হবে। তোমার যদি দেখবার ইচ্ছে হয়—তবে নিজের আসনে বসেই দেখ। তবে আমাদের অবস্থান্তর দেখলে ভয় পেও না, উঠে পড়ো না।

এমন কণ্ঠে কথা বললেন বগলা বাবা, যেন গ্রহান্তরের মানুষের কোন কণ্ঠ। বেশ যেন একটা শঙ্কাজড়িত শিহরণ অনুভব করলেন ভদ্রলোক নিজের মধ্যে। এমন সময়, যেন অন্ধকার কাঁপিয়ে আশেপাশের অসংখ্য ঝোঁপঝাড়ের আড়াল থেকে একদল নিশাচর শেয়াল ডেকে উঠল। রহস্যময় এক অজানা ভবিষ্যৎ যেন সামনে। কেন, কিসের জন্য, ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন না। তার বুক কাঁপতে লাগল।

বগলা বাবা উলঙ্গই ছিলেন। এবার মা-ও বস্ত্র ত্যাগ করলেন। অপ্সরাপ্রতিম নিটোল শাশ্বত যৌবনে ভরা দীপ্তিময়ী এক নারী দেহ। সেই দেহ সম্পূর্ণ অনাবৃত হচ্ছে। সহজাত সামাজিক বোধে ভদ্রলোকের চোখের পাতা দুটো নেমে এল। কিন্তু মনের মধ্যে কে যেন হঠাৎ চাবুক কষল। বলল, এটাই দুর্বলতা। মনে কামনা-বাসনা রয়েছে, তাই তাকাতে পারছ না। অধ্যাত্ম জীবন অত সহজ নয়। অরণ্যে একা ব্রহ্মচারী হয়ে পালিয়ে বেড়ানো সম্ভব। কিন্তু রমণী নারীর মধ্যে রাজর্ষি জনক রাজা হওয়া কষ্টকর। যিনি অবিচলিত চিত্তে নরনারীর এই মৈথুন দেখতে পারেন, স্বচক্ষে দেখেও সামান্য বিচলিত হন না, একে অধ্যাত্ম সত্য বলে ভাবতে পারেন, পরম শিবের সাধনা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তুমি কাপুরুষ, অধ্যাত্ম জীবনের উপযুক্ত নও।

ভদ্রলোক আবার চোখ তুলে তাকালেন। অবিচলিত চিত্তে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন। দেখলেন, মা বস্ত্র ত্যাগ করে তার অনন্ত যৌবনের অনিন্দ্যনীয় দেহ নিয়ে বগলা বাবার কোলে উঠে বসলেন। দু'জনে দু'জনের মুখোমুখি তাকালেন, চোখে চোখ রাখলেন, একে অপরকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন। আশ্চর্য! যে দৃশ্য দেখে দেহে সহস্রতেজ সূর্য জ্বলে উঠা উচিত, হৃদ্‌পিণ্ডে ভূমিকম্প হওয়া উচিত, সেই দৃশ্য চোখের সামনে রেখেও ভদ্রলোক অবিচলিত থাকলেন। আসনের উপর তাঁর শরীর যেন স্থির হয়ে থাকল। ভদ্রলোক নিজেই

অবাক হলেন, তাঁর মধ্যে এমন অভূতপূর্ব সংযম তিনি আগে কখনও অনুভব করেননি। তিনি আরও স্পষ্টভাবে তাকালেন। আর ঠিক সেই সময় কার্নিশে হাওয়া খেলে যাবার মতন শব্দ করে কে যেন তাঁর কানে কানে বলে গেল, এইবার দেখ। সেই শব্দ শুনতেই ভদ্রলোকের দেহে কাঁটা দিয়ে উঠল। তিনি যেন অনেকটা বোধশক্তিহীন হয়ে গেছেন, এমন মনে হল। তবু অপলক দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু যেন মায়াবলে সামনেটা শূন্য হয়ে গেছে। তিনি বগলা বাবার আসনে আর কিছুই দেখতে পেলেন না। বগলা বাবা বা মা কেউ নেই। আলোটা যেখানে জ্বলছিল, তেমনি জ্বলছে। অন্ধকার যে চোখের উপর কালো পর্দা টানিয়ে সব অদৃশ্য করে দিয়েছে তা নয়। তাহলে? ভদ্রলোক যোগাসনে বসার মত আসন করে বসে রইলেন। এই রহস্যের কিনারা না হওয়া পর্যন্ত যেন সেই আসনেই তাঁকে বসে থাকতে হবে। সেই প্রভাব থাকা অবধি এইভাবে তিনি নিস্পন্দ বসে রইলেন।

ভোরবেলায় ভদ্রলোকের মনে হল যেন প্রচণ্ড এক মহাশক্তির আসন এই বগলা বাবার আশ্রম। এই আশ্রমে থাকবার অধিকার তাঁর নেই। তিনি যেন এখানে অবাঞ্ছিত আগন্তুক। ভোরের আলো ফুটে উঠতেই তিনি কৌল বাবার আশ্রম ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। ঠিক সেই সময় তিনি দেখা পেলেন মায়ের! প্রসন্নমুখ মা, যেন করুণার নির্ঝরিণী। বললেন, আর থাকতে পারলে না বাবা!

ভদ্রলোক বললেন, না, মা। তবে আমার জীবন সার্থক হল। আমার ভ্রান্ত ধারণা দূর হল। তন্ত্র সাধারণ লোকের জন্য অসাধারণ সাধনা। বেদ-বেদান্ত উপনিষদের অনেক ঊর্ধ্বে তন্ত্র। তন্ত্রের পঞ্চ-মকার অধ্যাত্ম সাধনার বিশেষ উপাদান। মৈথুন হল তন্ত্র সাধনার চূড়ান্ত পর্যায়। পঞ্চ-'ম'কার সম্পর্কে ইতিহাসের সকল বিশ্লেষণই অসত্য। ইতিহাস মৈথুনকে বলেছে বিরেচন। ইংরেজীতে যাকে

বলে Purgation. কিন্তু এ হল অপব্যাখ্যা। মৈথুন হল পূর্ণ সত্য। মৈথুন থেকেই এ বিশ্ব। পূর্ণ মৈথুনে বিশ্বের লয়। অজ্ঞাত এক কেন্দ্রের মৈথুন থেকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, জ্ঞাত মৈথুন থেকে মুক্তি। মনে মনে তিনি ভাবলেন, যে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখলেন তার তুলনা নেই। তবে একটি কৌতূহল তখনও ছিল, সেটা চরিতার্থ করার জন্য মাকে প্রশ্ন করলেন, —মা, মিলনের 'এক' মূর্তি তো দেখতে পেলাম না?

মা বললেন, আমরা এক, কালের মধ্যে ছিলাম তুই হয়ে। মিলনে এক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় আর রইল না। মিলনের সময় সামান্য একটু দেখা যায়। তারপরেই অস্তিত্ব যে অনাস্তিত্ব হয়ে যায়, দেখবে কি করে। তুটি মানুষ প্রকৃতির কারণেই পৃথক, নইলে স্ত্রীজাতির কিন্তু স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই। পুরুষের মধ্যেই স্ত্রী। আমাকে যে বাইরে দেখছ, এই আমিই কিন্তু ওঁর ভেতরে। আবার আমার ভেতরও উনি। আসলে এই দেহটা তো খোলশমাত্র। দেহটা হল প্রকৃতি, স্থূল প্রকৃতি। এই স্থূলপ্রকৃতির মধ্যে সূক্ষ্ম আকারে রয়েছে স্ত্রী এবং পুরুষ। ইচ্ছে করলে সেই স্ত্রীপুরুষকে মিলিয়ে দিয়েও এই মৈথুন উপভোগ করা যায়। সেখানেও এমনি করে মিলনে অস্তিত্ব অনস্তিত্ব হয়ে যায়। কাল যেটা করেছি, সেটা তোমার জন্যই। যাও বাবা, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক। তবে যা দেখলে, এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে তা প্রচার কোরো না। তোমার ভাল হবে। নিজের ভিতর তুমি অধ্যাত্ম সাধনার চূড়ান্ত মৈথুন লক্ষ্য করবে।

যে-ভদ্রলোক এই অলৌকিক ঘটনা অনুভব করেছিলেন তিনি আরো দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। টালিগঞ্জ রসা রোড সেকেণ্ড লেনে তিনি বাড়ি করেছিলেন। ট্রাম কোম্পানীতে কাজ করেন, এক সময় ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির খুব নাম করা কর্মী ছিলেন, এমন কোন লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ট্রামকর্মী সেই ভদ্রলোক এখনও বেহালা ট্রাম ডিপোর কাছে ভকতদার বইয়ের দোকানে বসেন। তাঁর কাছে শোনা, বগলা বাবার এই অলৌকিক দৃশ্য দেখা ভদ্রলোক শেষ

জীবনে তন্ত্রসাধনায় চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ১৯০০ সালের গোড়ার দিকে তিনি দেহ রাখেন। শেষ দিকে কারো সঙ্গে দেখা করতেন না। কেউ দেখা করতে গেলে বলতেন, আমাকে বিরক্ত কোর না, আমি এখন মৈথুন ক্রিয়ায় ব্যস্ত আছি। শেষপর্যন্ত আভ্যন্তরীণ মৈথুন ক্রিয়ায় তিনি ব্যস্ত থাকতেন, যাকে বলে সমাধি। মায়ের আশীর্বাদ তাঁর জীবনে সার্থক হয়েছিল।

বৃন্দাবনের আয়েঙ্গার বাবা

বৃন্দাবন পরম বৈষ্ণব তীর্থ। কিন্তু শাক্ততীর্থ হিসেবেও এর খ্যাতি খুব কম নয়। বৃন্দাবনের মাটিতে যে শুধু পরম বৈষ্ণবরাই মেলা বসিয়েছেন তা নয়। যদিও বাহ্যতঃ বৃন্দাবন পরিক্রমা করলে একে বৈষ্ণব তীর্থ ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না, তথাপি বৈষ্ণব ভক্তজনের মধ্যে এখানে গভীর দৃষ্টি নিয়ে খুঁজলে অনেক মহাযোগী শাক্ত সন্ন্যাসীরও দেখা পাওয়া যাবে। এইখানেই পরম যোগী কাঠিয়া বাবা তাঁর অনেক মাহাত্ম্য দর্শন করিয়েছিলেন। কিন্তু সে-সব কথা থাক। শাস্ত্রেও শাক্তপীঠ হিসেবে বৃন্দাবনের উল্লেখ আছে। পীঠনির্ণয়ে বৃন্দাবনকে একান্নপীঠের একপীঠ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। পীঠ-নির্ণয়ে বলা হয়েছে :

'বৃন্দাবনে কেশজালমুমানাম্নী চ দেবতা।
ভূতেশো ভৈরবস্তত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥'

অর্থাৎ বৃন্দাবনে পড়েছে সতীর কেশজাল। দেবীর নাম উমা, ভৈরবের নাম ভূতেশ। অবশ্য পৃথক বর্ণনাও আছে, যেমন—

'বৃন্দাবনে কেশজালে কৃষ্ণনাথস্তু ভৈরবঃ।
কাত্যায়নী তত্র দেবী সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী॥'

ভারতচন্দ্রের অন্নদা মঙ্গলে আরও একটু ভিন্ন ধরনের বর্ণনা আছে। যেমন—

'কেশজাল নাম স্থানে পড়ে তাঁর কেশ।
উমা নামে দেবী তাহে ভৈরব ভূতেশ॥'

ভারতচন্দ্র স্থান হিসেবে বৃন্দাবনের নাম উল্লেখ না করে উল্লেখ করেছেন কেশজালের। শিবচরিতেও 'কেশজাল' বলে উল্লেখ আছে।

তবে শিবচরিতকার বৃন্দাবনকে মহাপীঠ হিসেবে বর্ণনা না করে উপপীঠ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে কেশজাল যে বৃন্দাবন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমি বৃন্দাবনে গেছি। পরম ভক্তিভরে রাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি হিসেবে তাকে শ্রদ্ধা করেছি। বৃন্দাবনের মাটিতে পা দিয়েই রাধাকৃষ্ণের অলৌকিক প্রণয় লীলা অনুভব করবার চেষ্টা করেছি। সেখানে যে কালীতত্ত্ব আছে একথাটা খোঁজও করিনি, কেউ আমাকে বলেও দেয়নি। পাণ্ডারা শুধু দেখিয়েছে রাধাকৃষ্ণের লীলাকেন্দ্র, একবার ভুলেও শাক্তমহাপীঠের কথা উচ্চারণ করেনি। বলেনি যে, বৃন্দাবনে একান্নপীঠের একটি পীঠ আছে। পাণ্ডারা অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণের পাণ্ডা। তারা জানে যে, বৃন্দাবনে যাঁরা আসেন, তাঁরা সবাই প্রায় বৈষ্ণব। শাক্ততীর্থে তাঁদের আগ্রহ নেই। সেইজন্য তাদের জানা থাকলেও পাণ্ডারা শাক্ততীর্থ বা পীঠের কথা কাউকে বলে না। আমাকেও বলেনি। কিন্তু ধর্ম বলতে আমাদের অধিকাংশেরই তো আছে কুসংস্কার, তাই নানা ধর্মকে পৃথক করে দেখি। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্তের মধ্যে পার্থক্য করি। তত্ত্বজ্ঞান থাকলে বৈষ্ণব শাক্তে পার্থক্য নেই। নেই শাক্ত শৈবেও। কালী আর রাধা তো একই সক্রিয় পুরুষ, প্রকৃতি। যখন তিনি নিষ্ক্রিয় তখনই শিব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ যা-ই বলুন। তথ্যজ্ঞান অনেকেরই আছে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান নেই বলেই বিপত্তি। আমি যখন বৃন্দাবন গিয়েছি তখন আমার তথ্যজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান কোনটাই ছিল না। যে-জন্য আমি নিজেও সেই মহাশাক্তপীঠ দেখাবার জন্য পাণ্ডাদের অনুরোধ করিনি। কিন্তু যাঁরা তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে পরিভ্রমণ করেছেন, যথার্থই তীর্থপুণ্যের আশায় ভ্রমণ করেছেন, তাঁরা যেমন দেখেছেন রাধাকৃষ্ণকে, তেমনি দেখেছেন শিব-কালীকে। তাঁরা দেবী হিসেবে উমাকে দেখেছেন, ভৈরব হিসেবে ভূতেশকে দেখেছেন। যিনি দেবীকে উমা নামে জানেন, তিনি উমা নামেই তাঁকে পূজো দিয়েছেন, যিনি জানেন কাত্যায়নী নামে তিনি

কাত্যায়নী নামেই বিশ্বাস করেছেন। ভৈরবকে কেউ দেখেছেন ভূতেশ হিসেবে, কেউ বা কৃষ্ণনাথ হিসেবে। আমি নিশ্চিত বলতে পারি না বৃন্দাবনে সেই মহাশাক্তপীঠ কোথায়। কারো কারো মতে এই পীঠ আছে উমাবনের কাছে। কিন্তু বৃন্দাবনে একটি পীঠস্থান আছে যমুনার তীরে—কেশীঘাটে। সতীর কেশজাল এখানে পড়েছিল বলেই এর নাম হয়তো কেশীঘাট। এই কেশীঘাটকেই ভারতচন্দ্র হয়তো বলেছেন কেশজাল। এই কেশীঘাট বা কেশজালে একজন বড় সাধক ছিলেন বৃন্দাবনে, তাঁর নাম জগদীশ বাবা।

জগদীশ বাবার নাম শোনা গেলেও লোকে তাঁকে খুব কমই দেখেছে। অধিকাংশ আশ্রমনিবাসী সাধু সন্ন্যাসীর মত তিনি গুরুগিরি করেন না, আত্মপ্রচার করেন না। জগদীশ বাবাকে দেখেছে এমন প্রত্যক্ষ দর্শীর সঙ্গে অনুসন্ধিৎসু তীর্থপুণ্যপ্রয়াসীদের কারোই প্রায় দেখা হয়নি। সবাই শুধু তাঁর নাম শুনেছেন, অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনেছেন। সেই অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার এক তন্ত্রাভিলাসী সাধক বৃন্দাবন গিয়েছিলেন তাঁকে দেখতে। টালিগঞ্জে রসারোড ইস্টে-এ থাকতেন তিনি। তীর্থপুণ্য-প্রয়াসী থেকে পাণ্ডা, সবাইকে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন জগদীশ বাবার কথা। কেউ বলতে পারেন নি। ফলে সাধু সন্ন্যাসীর আস্তানায় আস্তানায় তিনি জগদীশ বাবার খোঁজ করতে থাকেন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বৃন্দাবনে জমজমাট আশ্রম ছিল কেশবানন্দ ব্রহ্মচারীর। তিনি থাকতেন রাধাবাগে। অনেক শিষ্য-সামন্ত ছিল তাঁর। সকলেই তাঁকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করত। জগদীশ বাবার হদিশ পাবার জন্য সেই ভদ্রলোক তখন কেশবানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে আসতে লাগলেন। কিন্তু অনুসন্ধান করে খুব উৎসাহজনক কোন খবর পেলেন না। অনেকে অবশ্য বললেন যে, তিনি একজন মহাপুরুষ। কিন্তু তাঁর কোন হদিশ দিতে পারলেন না। কেউ কেউ বললেন, জগদীশ বাবা কোন সাধকই নন, একটা ভণ্ড,

প্রতারক। কিন্তু তাতেও বাঙ্গালী সেই ভদ্রলোকের কৌতূহল শেষ হল না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকেও সমকালে কতজন পরিহাস করতেন। প্রত্যক্ষ দর্শন না হলে মহাপুরুষ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া অনুচিত। সুতরাং তিনি তাঁর খোঁজ করতে লাগলেন।

একদিন কেশবানন্দ সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে তাঁর আশ্রমে বসে আছেন, নানা ধরনের আলোচনা চলছে। পাঁচ ছয় বছরের এক শিশু ব্রহ্মচারী, নাম সত্যানন্দ, তাকে নিয়েই অভিনয় চলছে। কেশবানন্দ সবার সামনেই তাকে প্রশ্ন করলেন, সত্যানন্দ তোমার ঘর কোথায় ?

সত্যানন্দ চোখ দুটি কেশবানন্দের পায়ের দিকে রেখে বলল, গুরুদেবের শ্রীচরণে। সবাই বেশ উপভোগ করছিলেন সেই অভিনয়।

সেটা ছিল শ্রাবণ মাস। বৃন্দাবন তখন জমজমাট। অসংখ্য ভক্তজন সমাগমে বৃন্দাবন গম গম করছে। প্রচণ্ড গরমেও সেই অসংখ্য ভক্তজনের বেশ কিছু কেশবানন্দের আশ্রমে এসেছেন। এত গরম যে, হাত পাখার প্রয়োজন হচ্ছে। ঠিক সেই সময় ঝড়ের মত একটা লোক এসে কেশবানন্দের সেই আশ্রমে ঢুকল। অদ্ভুত লোকটি ! বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাঝ মাথায় টাক। দুধারে কাঁচা পাকা ছোট ছোট চুল। খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। প্রায় সপ্তাহ-খানেক কামানো হয়নি বেশ বোঝা যায়। তবে চোখ দুটি ভয়ানক উজ্জ্বল। দৃষ্টি তীক্ষ্ম। সে চোখের দিকে যেন তাকানো যায় না। সাধারণের কাছে সে দৃষ্টি অসহ্য। ভাব অনেকটা পাগলের মত। একটা ল্যাঙ্গট পরা। সর্বাঙ্গে সেই শ্রাবণ মাসের গরমের মধ্যেও একটা মোটা কম্বল জড়ানো। গায়ে আর কিছু নেই, সেই কম্বল কখনও কাঁধ থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছে, কখনও টেনে উপরে তুলছেন। সব মিলিয়ে অদ্ভুত আচরণ লোকটির। কোন দিকে কোন কিছু যেন গ্রাহ্য নেই তাঁর। শিষ্টাচারও নেই, ঘরে ঢুকে কোন নমস্কার করল না কাউকে। ঝড়ের মত ঢুকলো, যেন কত ব্যস্ততা। কিন্তু ঢুকেই চুপ করে বসে গেল।

কেশবানন্দজীই জিজ্ঞেস করলেন, স্বামীজী, বৃন্দাবন ধামমে কব্ আয়া? অর্থাৎ স্বামীজী বৃন্দাবনধামে কবে এলেন?

পাগলা লোকটি বললেন, উস্‌মে তুমারা কিয়া কাম? অর্থাৎ এতে তোমার কি দরকার? অব্ তো কুছ্ খানেকো মাঙ্গাও। অর্থাৎ এখন কিছু খাবার আনতে বলতো?

কেশবানন্দজীকে দেখা গেল, লোকটার কথা শুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন শিষ্যকে খাবার আনতে পাঠালেন। যাঁরা কেশবানন্দজীর আশ্রমে এসেছিলেন তাঁরা কিছু না বুঝতে পেরে একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। নানা রকম কথাবার্তা হচ্ছিল, সব বন্ধ হয়ে গেল। আগন্তুকটি বললেন, লেও, তোমলোক বাৎ করো, চুপ্ কাহে? তোমরা কথা বলছিলে, বল, চুপ করে আছ কেন?

কেশবানন্দজী বললেন, আপতো কুছ্ শুনাইয়ে, কুছভি পরমার্থ কি বাৎ, অর্থাৎ আপনি কিছু পরমার্থের কথা শোনান না।

অদ্ভুত মেজাজ লোকটির। এই ভাল কথাতেও যেন অকস্মাৎ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। রাগে চিৎকার করে উঠলেন, ইয়ে চোট্টা লোককি সাৎ পরমার্থ কি বাৎ? এইসব চোরের সঙ্গে পরমার্থের আলোচনা! কোন্ মাঙ্গতে তুমারা পরমার্থ? পরমার্থ কে চায়! সব তো কসবি ও ঢেবুয়ার পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছ। পয়সা পয়সা করে মরছ সব, বড়লোকের পা চাটছ, তোমাদের পরমার্থের কথা কী শোনাব? পরমার্থের কথা কেইবা শুনবে, আর শুনতেই বা চায় কে। এ-সব তো ঝুঠা, চোর। পরমার্থের কথা আর বোলো না।

বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে, এত কড়া কথা বলা সত্ত্বেও কেশবানন্দজী উত্তেজিত হলেন না। বরং ভেতরে ভেতরে কেমন যেন তিনি একটু শঙ্কিত। কিন্তু সেই শঙ্কাজাত কম্পন চেপে রেখে হাসবার চেষ্টা করে বললেন,—স্বামীজী দুনিয়াতে সবই তো একরকম মানুষ নয়!

আগন্তুকটি যেন এ-কথায় আরও রেগে উঠলেন। বললেন, সব্,

সব্, সব্ শালা চোট্টা, যেতনা আশ্রমী, লোটা কম্বলবালে সব্ চোট্টা হ্যায়; সব্ শালা বিলকুল ঝুঠা। পয়সাকো লিয়ে সবকুছ করতে। ফির বাৎ মৎ করো, বাজে কথা বোলো না। চুপচাপ বসে থাকো।

কেশবানন্দজী দ্বিতীয় কোন কথা বলার আগেই খাবার এসে গেল। আগন্তুক লোকটি খাবারের থালা থেকে একটা লাড্ডু তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করল। এমনভাবে খেতে আরম্ভ করল যেন গো-গ্রাসে গিলছে।

লোকটির অদ্ভুত ব্যবহারে বাঙ্গালী বাবুটির মধ্যে প্রচণ্ড এক কৌতূহল তৈরি হল। তিনি ভাবলেন, নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন বিরাট রহস্য লুকিয়ে আছে। বাহ্যতঃ পাগল হলেও লোকটির মধ্যে কোন লুকানো ঐশ্বর্য আছে। এমন তেজস্বিতা, এমন স্পষ্ট কথা সাধারণ মানুষ বলতেই পারবে না।

লোকটি সেই একটিমাত্র লাড্ডু মুখে দিয়ে খাবার পরই কি হল কে জানে, আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে রইলেন। আর কেউ যে কোন কথা বলবে, তাও নয়। যেন সবাই জড়বৎ হয়ে গেছে, ভয় পেয়ে থেমে গেছে, কথা বলবে এমন সাধ্যই নেই। কেউ তাঁর মুখের দিকেও যেন তাকাতে পারছে না। ভাবখানা এই যে, যেন দিনের বেলায় সূর্যের প্রভাবে গ্রহ-উপগ্রহ সব চাপা পড়ে গেছে। কেবল সেই বাঙ্গালী ভদ্রলোকটিই তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কেশবানন্দজী যেন চন্দ্রসভা তৈরি করেছিলেন। সূর্যের আবির্ভাবে তিনিও ম্লান হয়ে গেছেন।

লোকটি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আর একটি খাবার তুলে মুখে পুড়ে দিলেন। কি দেখছিলেন কে জানে। সেটা শেষ করে লোটা ভর্তি জল খেলেন। হাতটা কাঁধের কম্বলে মুছে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর এক পা দু'পা করে প্রাঙ্গণের বাগানের মধ্যে ঢুকলেন।

যেন সূর্য নিভে গেলে গ্রহ-উপগ্রহ আবার ফুটে উঠল।

কেশবানন্দজীর শিষ্যসামন্তরা কথা বলতে আরম্ভ করল। কেশবানন্দজী বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, গাজা খেয়ে খেয়ে পাগল হয়ে গেছে লোকটা। কখনও কখনও এখানে আসে। দক্ষিণের লোক। বিকানীরের এক মহাজন আছে বৃন্দাবনে তাঁর বাড়িতে থাকে।

একজন বললে, বোধহয় কোন গুপ্তচর। সরকারী কাজে ঐভাবে ঘুরে বেড়ায়।

আর একজন বলল, ওসব কিছুই নয়। আসলে বদ্ধ পাগল। না হলে এমন অসভ্যের মত কেউ কথা বলে।

কিন্তু তাঁদের সে-সব কথার কোনটাই বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মন ছুঁতে পারল না। তাঁর মনে হল, নিজেদের দুর্বলতাকে ঢাকবার জন্যই সকলে এইভাবে কথা বলছেন। তিনি বরং সেই পাগলের দিকেই প্রবল আকর্ষণ বোধ করলেন। ভাবলেন, এই খদ্যোতের সভা পরিত্যাগ করে সূর্যের কাছে যাওয়াই ভাল। খদ্যোতের আলোতে অন্ধকার কখনও দূর হবে না। পথও দেখা যাবে না। ভদ্রলোকও বেরিয়ে প্রাঙ্গণের সেই বাগানে যাবেন বলে ভাবছিলেন—এমন সময় সেই পাগলটি আবার ফিরে এলেন, ফিরে এসে আবার বসলেন। কিন্তু তাঁর ভাব-সাব দেখে মনে হচ্ছিল না বসবার জন্য তিনি এখানে এসেছেন। কেন যেন তাঁর মনে হচ্ছিল এক্ষুনি তিনি আবার উঠে যাবেন। তিনি উঠলেই বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি তাঁর কিছু নেবেন বলে ঠিক করলেন। এ-জন্য তিনি আগেই উঠে গিয়ে দুয়ারের কাছে দাঁড়ালেন। আগন্তুকটি যখন বেরুবেন, তিনিও তাঁর পিছু নেবেন। তাঁর মনে হল এই পাগলের মধ্যে কিছু আছে। কেশবানন্দ ও তাঁর দলবল সত্যিই অন্তঃসারশূন্য। শিষ্যরা আর কেউ নয়, গুরুর প্রচারক, মডার্ণ কাগজ, রেডিও ও টেলিভিসনে বিজ্ঞাপনের মত। কোন ব্যক্তির জন্য বিজ্ঞাপনের যা কাজ, গুরুর জন্য এদের সেই কাজ। অধ্যাত্ম আলোচনা কিছুই হয় না, হয় গুরুর গুণকীর্তন।

দ্বিতীয়বার গুরুর এই গুণকীর্তনই হচ্ছিল। কি করে কেশবানন্দজীর এক ডাক্তারবদ্যি পরিত্যক্ত শিষ্যের চিকিৎসা করছেন তিনি সেই কথা বলছিলেন। ইতিমধ্যেই আবার সেই পাগল আগন্তুকটি প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সূর্যোদয়ে গ্রহ-উপগ্রহ সব নিভে গেল যেন, সবাই আবার চুপ করলেন।

দ্বিতীয়বার আগন্তুকটি কেশবানন্দজীর বৈঠকে প্রবেশ করলেও কোন কথা বললেন না। শুধুমাত্র আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভাবসাব দেখে মনে হল কেশবানন্দজী তাঁকে সেখান থেকে সরাতে পারলে বাঁচেন। তাই তিনি আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করলেন,—স্বামীজী, অব্ কিধার যানা ?

আগন্তুক অত্যন্ত কর্কশকণ্ঠে জবাব দিলেন, কাহে ? ইহাঁ কুছ তকলিফ হৈ তুমরা হামরা রহনে সে ? অর্থাৎ, কেন, আমি থাকাতে তোমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে নাকি ?

কেশবানন্দজী বললেন, না, না, সেকি ! আপনার মত মহাত্মাজী কাছে থাকলে আমাদের অসুবিধা হবে কেন ?

আগন্তুক বললেন, তব্ তুম বাৎ করো না, আপনে বাৎ।

কেশবানন্দজী যেন সত্যিই একটু ঘাবড়ে গেছেন। যেন তাঁর মনের কথা জেনে ফেলেছেন আগন্তুকটি এমন ভাব। সেইজন্য একটা অজুহাতের ভঙ্গীতে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলব তো বটেই, আপনার সামনে বলা যায় না এমন কথা তো আমরা বলছি না।

বাঙ্গালী ভদ্রলোক লক্ষ্য করে দেখলেন, কেশবানন্দজীর মধ্যে কোথায় যেন একটা অস্বস্তি। কোথায় যেন একটা বিরাট দুর্বলতা। এই আগন্তুকটি যেন তাঁর সেই দুর্বলতার খবর জানেন। যেন তিনি বুঝতে পারছেন যে, কেশবানন্দজী বিরাট অস্বস্তিতে আছেন। তিনি চলে গেলে তবে বাঁচবেন।

মূল দুর্বলতা কোথায় বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির বুঝতে বাকি থাকল না। পণ্ডিতের সামনে মূর্খরা পাণ্ডিত্যের বিষয় নিয়ে যে অস্বস্তি বোধ করে, কেশবানন্দজীদেরও যেন তাই হচ্ছিল। তাদের সেই

অস্বাস্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন আগন্তুকটি। যেন হুকুমের ভঙ্গীতে বললেন, অব্ হাম যায়ে গা, দো আনা তো দেও।

কেশবানন্দজী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দকে তিনি দু-আনা পয়সা এনে আগন্তুকের হাতে দিতে ইশারা করলেন। নিত্যানন্দ কালমাত্র বিলম্ব না করে দু-আনা পয়সা এনে আগন্তুকের হাতে দিল।

বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি বুঝলেন যে, আগন্তুকটি এবার পথে বেরুবেন। তিনি তাঁকে পাকড়াও করার জন্য পথের ধারে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পয়সাটা হাতে পেয়েই লোকটি হন্‌হন্ করে বেরিয়ে এলেন। অদ্ভুত লোকটি। বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক সেখানে এসে হাঁটার বেগ কমিয়ে দিলেন, যেন কেউ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে, এ-কথাটা তিনি জানেন। শুধু হাঁটার বেগ কমিয়ে দিলেন না, তার দিকে ফিরেও তাকালেন। তাকিয়ে স্পষ্ট ইংরেজীতে বললেন, তুমি তো বাঙ্গালী, কলকাতা থেকে আসছ?

বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সাধুসন্ত খুঁজতে বেরিয়েছ, তাই না?

—যথার্থই বলেছেন।

কি একটু তাকিয়ে দেখলেন তিনি বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির মুখের দিকে। তারপর বললেন, এই চোট্টাদের মত তুমি নও। যথার্থই খুঁজতে বেরিয়েছ। এই তাঁর মুখে প্রথম যেন একটু হাসি দেখা গেল। বললেন, আমাকে ধরবে বলে দাঁড়িয়ে আছ তো?

—হ্যাঁ।

—চলো।

এই 'চলো' শব্দের মধ্যে অদ্ভুত এক গতি আছে যেন। বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি নিজের মধ্যে অদ্ভুত এক লঘুতা অনুভব করলেন। অদ্ভুত একটা আনন্দের হিল্লোলও অনুভব করলেন রক্তের মধ্যে। তিনিও চলতে আরম্ভ করলেন।

বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির বয়স তখন ২৫ বা ২৬। অপরিচিত আগন্তুকের বয়স পঞ্চাশের কম নয়। কিন্তু তাঁর পদক্ষেপে যেন অকল্পনীয় গতি। কিছুতেই সেই যুবক বাঙ্গালীটিও তাঁর সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছিলেন না। তাঁর ভয়ানক উজ্জ্বল চোখে আগন্তুকটি যখন বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির দিকে তাকাচ্ছিলেন তখন যেন অদ্ভুত এক ঝল্‌সানো জ্যোতি দেখছিলেন তিনি তাঁর চোখে। সাধারণ মানুষের কাছে সে দৃষ্টি যেন অসহ্য। চলতে চলতে অনর্গল ইংরেজীতে কথা বলছিলেন আগন্তুকটি। তবে তাঁর সব কথা যে বোঝা যাচ্ছিল তা নয়। না বোঝার অন্যতম কারণ এই যে, আগন্তুকটির তালে তালে পা ফেলে বাঙ্গালীটি চলতে পারছিলেন না। বোধহয় এটা লক্ষ্য করেছিলেন আগন্তুকটি। সেইজন্য একবার একটু থেমে বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির কাঁধে হাত রাখলেন তিনি। আশ্চর্য! কাঁধে হাত পড়তেই বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি নিজের মধ্যে অদ্ভুত এক গতি অনুভব করলেন। মনে হল শরীরটা যেন অনেক হাল্কা। একটা হরিণ শিশুর মত ছুটতে পারেন তিনি।

তাঁরা দু'জনে কেশবানন্দজীর আশ্রম থেকে বেরিয়ে প্রথম এলেন যমুনার তীরে। তারপর আবার চলতে চলতে একটা পথ দিয়ে শহরের মধ্যে ঢুকলেন। শহরের একটা গোলি পথ দিয়ে গোপীনাথ মন্দিরের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

গোলিতে ঢুকে আগন্তুকটি একটু থামলেন। তারপর বাঙ্গালী যুবকটিকে বললেন: তুমি গাঁজা খাও?

বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি বললেন, আজ্ঞে না।

সেই দু-আনা পয়সা বাঙ্গালী যুবকটির হাতে তুলে দিয়ে তিনি বললেন, আমার জন্য গাঁজা কিনে নিয়ে এস।

বাঙ্গালী যুবকটি গাঁজার দোকান থেকে দু-আনার গাঁজা কিনে নিয়ে এলেন।

আগন্তুকটি সে গাঁজা নিজের হাতে নিলেন না। বললেন, তোমার কাছে রাখ। আমার সঙ্গে চল।

আগন্তুকটি গোলিপথে আবার এগিয়ে গেলেন। খুব বেশীদূর এগুতে হল না। একটা ঝুপড়ির কাছে এসে কার নাম ধরে ডাকলেন —শান্তজী।

পনের ষোল বছরের কিশোর একটি সাধু ঝুপড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

তরুণ সাধুটির মুখের দিকে তাকিয়ে আগন্তুকটি বললেন, মাল হৈ? সে বললে, জরুর।

আগন্তুকটি তখন ইঙ্গিতে বাঙ্গালীটিকে কাছে ডেকে কাগজে জড়ানো সেই গাঁজার প্যাকেটটি তরুণ সাধুর হাতে তুলে দিতে বললেন। বাঙ্গালী যুবকটি তাঁর নির্দেশ মত কাজ করলেন। তারপর আগন্তুকের নির্দেশে তাঁর পাশে বসে পড়লেন। কিশোর সন্ন্যাসীটি গাঁজার কল্কে সাজাতে লাগল।

বাঙ্গালী যুবক-ভদ্রলোকটি আগন্তুককে জিজ্ঞেস করলেন: সন্তজী, আপনাকে কি নামে ডাকবো?

আগন্তুক ইংরেজীতে জবাব দিলেন, আমার নাম পার্থসহায় আয়েঙ্গার। মাদ্রাজের কাছে বাড়ি।

গাঁজার কল্কে তৈরি হবার আগে দু'জনের মধ্যে ইংরেজীতেই খানিকক্ষণ কথাবার্তা হল। বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি বুঝলেন যে, ইংরেজী এই রহস্যময় আগন্তুকের কাছে মাতৃভাষার মতই সহজ। তিনি আয়েঙ্গারকে জিজ্ঞাসা করলেন, সাধু সন্ন্যাসীর উপর আপনি এত বিরক্ত কেন? এঁরা তো সবাই গৃহত্যাগ করে কৃচ্ছ্রসাধন করছেন ভগবানকে পাবার জন্যই?

যেন প্রচণ্ড একটি ধমক দিয়ে উঠলেন পার্থসহায় আয়েঙ্গার। বললেন, থামো, থামো, তুমি ছেলেমানুষ। কিছু জান না। এরা কিছুই ত্যাগ করেনি। আর, ভগবানকেও ডাকে না। এরা নিজেদেরই চেনে না। সাধু কে? যে আত্ম পরিচয় জানে সেই সাধু। শোননি উপনিষদে বলা হয়েছে 'আত্মানং বিদ্ধি'। নিজেকে জান। সাধনার

মূল লক্ষ্যই হল নিজেকে জানা। এরা কিছুই জানে না। ভগবানের নাম ক'রে গৃহস্থদের বঞ্চনা করে। তাদের ঘাড় ভেঙে নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করে। এরা চোর বাটপাড়ের চাইতেও অধম।

বাঙ্গালী যুবকটি বললেন, সবাই কি খারাপ।

আয়েঙ্গার বললেন, জান, যত গোল বাধিয়েছে ঐ 'ভগবান' শব্দটি। যে বস্তুর সঙ্গে মানুষের কোন সম্পর্ক নেই তাঁর জন্য তপস্যা করার কোন মানে হয়? যতো সব অপোগণ্ড ভূতপ্রেতের কাণ্ড।

বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি যেন রীতিমত চমকে উঠলেন। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। আয়েঙ্গার সাহেব বলেন কি? মানুষ ভগবানের নামে এই যে এত সব করছেন এ সবই একটা ভাবপ্রবণতা মাত্র! সেন্টিমেণ্ট। তিনি আয়েঙ্গার সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, মানুষ তাহলে ভগবানকে জানতে পারে না?

আয়েঙ্গার সাহেব পাগলের মত চিৎকার করে উঠলেন যেন, না, না, না। মানুষের পক্ষে ভগবান বলে কিছু চিন্তা করা অসম্ভব। ভগবান নামে কোন বস্তু মানুষের জানা অসম্ভব। মানুষ যে-ভগবানকে জানে সে-ভগবান হল দেবত্বে উন্নীত মানুষ—No man can know God. If God is known by man then it is a magnified man. ভগবানের কথা যাক, এবার অন্য কথা বল।

বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি বললেন, আমি যে ভগবানের কথাই জানতে এসেছি।

আয়েঙ্গার বললেন, যদি ভগবান নামে কাউকে জানতে চাও তাহলে ঘরে ফিরে যাও। তাঁকে কখনও পাবে না।

বাঙ্গালী যুবকটি বললেন, তা হলে! মানুষের যদি ভগবানে বিশ্বাস না থাকে তাহলে তো সর্বনাশ!

আয়েঙ্গার বললেন, কেন? মনুষ্য সমাজ উৎসন্নে যাবে?

—নিশ্চয়ই।

—তা যাক। যেতে দাও। যে অবস্থা মানুষের হয়েছে, তাতে

উৎসন্নের চেয়ে কম আছে কিছু? এরকম মিথ্যা প্রবঞ্চনা, ভণ্ডামো, ধর্মের নামে ব্যাভিচার, চুরি, ডাকাতি, খুন, পরাস্ব অপহরণের চেয়ে কোন্ অংশে ভাল? ভণ্ড জীবনকে কোন রকমেই সমর্থন করা যায় না। বাঙ্গালী যুবকটি বললেন, কিন্তু আয়েঙ্গার, আপনার কথা আমি সমর্থন করতে পারি না। সাধু কি নেই?

—না।

—সেকি! আপনি সাধু হয়ে একটাও সাধু দেখেন নি! তাহলে সাধু সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন?

আয়েঙ্গার বললেন, সাধু না দেখেছি তা নয়। একজন সাধু দেখেছি? তবে ঐ একজনই আছে আসল ত্যাগী সাধু।

বাঙ্গালী যুবকটি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, কে তিনি। কোথায় থাকেন? যদি দয়া করে তাঁর খবর দেন, তাহলে আমি সেই সাধু দেখে ধন্য হই।

আয়েঙ্গার বললেন, তিনি ঐ যমুনার তীরে থাকেন।' কেশীঘাটের দিকে হাত তুলে দেখালেন তিনি।

বাঙ্গালী যুবকটি বললেন, কেশীঘাটে থাকেন?

—হ্যাঁ। কেন, তুমি তাঁকে দেখনি?

—না। আপনার কাছে প্রথম জানলাম যে কেশীঘাটে কোন বড় সাধু থাকেন। গেলেই দেখতে পাব?

—বলা যায় না। কারণ, তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তিনি সব সময় নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখতে চান। ইচ্ছে করলেই যে তাঁর দেখা পাওয়া যাবে, তা নয়।

—কেন?

আয়েঙ্গার সাহেব এ-কথার জবাব দেবার আগেই গাঁজার কল্কে এসে গেল। কিশোর সন্ন্যাসীটি কল্কে সাজিয়ে আয়েঙ্গার সাহেবের হাতে তুলে দিল।

বোঝা গেল গাঁজার কল্কে হাতে পেলে আয়েঙ্গার সাহেব অন্য

কোন কথা শুনেন না, বা শুনলেও তার জবাব দিতে চান না। তিনি উবু হয়ে বসলেন, তারপর আর কোন দিকে না তাকিয়ে কল্কেতে টান দিলেন। প্রথম দিলেন ফুকো টান। তারপর এমন জোরে একটা শেষ টান দিলেন যে, কল্কের মাথাটা দপ্ করে জ্বলে উঠল। আশ্চর্য! এত বড় দীর্ঘ একটা টান দিয়েও ধোঁয়া ছাড়লেন না তিনি। কুম্ভক করে ধোঁয়াটা ভেতরে রেখে দিলেন। সেই কুম্ভক অবস্থাতেই কল্কেটা চেলার হাতে তুলে দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে অল্প অল্প করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। পাত্‌লা ধোঁয়া।

চেলাটিও গুরুর অনুরূপ গাঁজার কল্কেতে টান দিল। তারপর কল্কেটা আবার গুরুর হাতে তুলে দিল। আবার ঠিক আগের মতই আয়েঙ্গার কল্কেতে টান দিয়ে কুম্ভক করে ধোঁয়া ভেতরে রাখলেন। তারপর চেলার হাতে কল্কেটা তুলে দিলেন। এই রকম দেয়া নেয়ার পাট চলল বার তিনেক। শেষবার যখন গাঁজার ভস্মাবশেষ ছাড়া আর কিছুই রইল না, তখন কল্কেটা উপুড় করে সেই ভস্ম ফেলে দেওয়া হল। তারপর কল্কেটা পরিষ্কার করে ঝুলির মধ্যে তুলে রাখা হল। গঞ্জিকা সেবন পর্ব সমাধা হলে শিষ্যটি হাত জোড় করে গুরুর সামনে বসে রইল।

এবার হয়তো কথা বলা যেতে পারে এই ভরসা করে বাঙ্গালী যুবকটি বললেন: সেই মহাত্মাজীর নাম কি?

চোখদুটো যেন ঘোলাটে হয়ে এসেছে আয়েঙ্গারের। বললেন, —কোন্ মহাত্মাজী?

—সেই যে কেশীঘাটের সাধক?

একটু যেন গম্ভীর হলেন আয়েঙ্গার। কোন কথা না বলে শুধু মাথা নাড়লেন, হুম্।

—তাঁর কোন নাম আছে নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ।

—কি নাম?

—জগদীশ বাবা।

জগদীশ বাবা! বাঙ্গালী যুবকটি যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন, বৃন্দাবনে আসা অবধি সেই জগদীশ বাবাকেই তো খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি। কিন্তু কোন হদিস পাচ্ছেন না। আয়েঙ্গারকে বললেন, চলুন, তাহলে জগদীশ বাবার কাছে যাওয়া যাক।

আয়েঙ্গার এবার যেন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছেন, বললেন, না। এখন সম্ভবতঃ তাঁর দেখা পাওয়া যাবে না। তারচেয়ে বরং চল অন্য আর একটা জায়গায় যাই।

—কোথায়? অন্য কোন বড় সাধু?

আয়েঙ্গার বললেন, চলোই না। তুমি বড় বেশী প্রশ্ন কর।

—সাধু সন্ন্যাসী না হলে কার কাছে যাব!

—তুমি চলোই না আমার সঙ্গে, আয়েঙ্গার বাঙ্গালী ভদ্রলোকটিকে হাত ধরে টানলেন।

এ-সব লোকের খেয়াল খুশির মধ্যে আপাত অসংলগ্নতা থাকলেও একটা মহৎ উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকে বাঙ্গালী যুবকটি তা জানতেন। তাই তিনি অনেকটাই কৌতূহল বোধ করলেন। আয়েঙ্গার সাহেবের সঙ্গে এগিয়ে যেতে কোন ইতস্ততঃ করলেন না।

আয়েঙ্গার সাহেব, কারো মতে বাবাজী, চলতে চলতে বললেন: তুমিতো সাধু অনেক দেখেছ, ভক্ত দেখেছ?

—কি রকম ভক্ত?

আয়েঙ্গার চটে উঠলেন, ভক্ত, ভক্ত। তার আবার কি রকম কি? তবে কেশবানন্দের ভক্তদের মত নয়। চোরের শিষ্য বাটপার।

—তাহলে!

—তাহলে কি, তা স্বচক্ষে তোমাকে দেখবার জন্যই তো তোমাকে যেতে বলছি।

—কিন্তু ভক্ত দেখে আমার কি হবে?

আয়েঙ্গার বললেন, সাধু দেখেই বা তোমার কি হবে? অযথা

ঐসব অকর্মণ্য বিপথগামীদের প্রতি তোমার বড় বেশী আকর্ষণ। জীবনে অনেক কিছু ভাল কাজ করার আছে। ভণ্ড জোচ্চোর দেখে মূল্যবান সময় নষ্ট করবে কেন। ওদের পেছনে ঘুরলে তোমার ভবিষ্যৎ ঐসব অকর্মণ্য বিপথগামীদের মত হবে। ওদের মতই লোক ঠকাবে। গেরস্তদের ঘাড় ভেঙে খাবে। তাদের সর্বনাশ করবে। এ-সব সাধু সন্তের কাছ থেকে লোকে কিছু পায় না। পায় কেবল ধোঁকা। এই ধোঁকাবাজেরা ভগবানের নাম করে ঠকায়। নিজেরা কিছু পায় না, অপরের পাওয়ার পথও বন্ধ করে দেয়।

বাঙ্গালী যুবকটি বললেন, ঐ যে কেশীঘাটের……

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়েই আয়েঙ্গার বললেন: কেশীঘাটের জগদীশ বাবাকে আজ পাবে না। সুতরাং তুমি আমার সঙ্গেই চল।

আয়েঙ্গারকে কেশবানন্দজী পাগল মনে করেন। কিন্তু বাঙ্গালী যুবকটির মনে হল, আয়েঙ্গার পাগল নন, অত্যন্ত কঠোর সত্যবাদী। যে কথাই তিনি বলেন, তা এমন জোর দিয়ে বলেন যে, তাই সত্য বলে মনে হয়। এর বিরুদ্ধে কোন কথা বলার সাহস হয় না। সুতরাং বাঙ্গালী যুবকটিও কোন তর্কের অবতারণা করতে পারলেন না। অথচ মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন জমাট বেঁধে রয়েছে।

আয়েঙ্গার পাগল হলেও মানুষের অন্তর যেন পরিষ্কার দেখতে পান। বাঙ্গালী যুবকটির মনের এই দ্বন্দ্বও তিনি যেন ধরে ফেললেন। তাই পিঠে হাত রেখে মৃদু মৃদু চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন: দেখ, আমার বয়স যখন তোমার মত ছিল, আমিও সৎ বা ইনটেলিজেন্ট ছিলাম না। স্বভাব চরিত্রও ভাল ছিল না। বোকার মত সাধুসন্তের পেছনে ঘুরে বেড়াতাম। এই, মাত্র কয়েক বছর হলো আমার পরিবর্তন এসেছে। ধরো দশ বার বছর। এখন সাধু দেখবার বা বুঝবার ক্ষমতা হয়েছে।

বাঙ্গালী যুবকটি এবারও কোন কথা বললেন না।

আয়েঙ্গার তা দেখে নিজেই বলতে লাগলেন, চলো, জগদীশ বাবাকে

কাল দেখবে। আজ তোমাকে অন্য আর এক এক জায়গায় নিয়ে যাই।

তাকে তিনি প্রায় হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন।

বাঙ্গালী যুবকটি লক্ষ্য করে দেখলেন যে, চলতে গেলেই আয়েঙ্গার যেন উড়ে চলেন। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা সম্ভব হয় না। কিন্তু তিনি তার কাঁধে হাত দিলেই সমস্ত শরীরটা কেমন হাল্কা হয়ে যায়। তখন তাঁর পাশাপাশি একসঙ্গে চলতে কোন অসুবিধা হয় না। আয়েঙ্গার বাঙ্গালী যুবকটির কাঁধে হাত রেখেই চলতে লাগলেন। চলতে চলতেই বললেন, তুমি শুনছ তো?

বাঙ্গালী যুবকটি বললেন, হ্যাঁ। আপনি বলুন।

আয়েঙ্গার বললেন, তুমি আশ্চর্য শক্তি দেখতে চাও? যাতে শক্তিশালী লোকদের চেনা যায়?

বাঙ্গালী যুবকটি বললেন, যাঁরা আশ্চর্য শক্তি দেখায়, ভেল্কি দেখায়, তাঁরাই যে বড় সাধু একথা বলা যায় না।

—কেন?

—রামকৃষ্ণ পরমহংস ছিলেন একালের সব চাইতে বড় সাধক। তিনি কোনদিন অলৌকিক ক্ষমতা দেখাতেন না। তিনি বলতেন: যাঁরা এ-সব দেখায়, তাঁরা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পায় না।

আয়েঙ্গার যেন একটু রেগে গেলেন, বললেন, আবার তুমি সেই ভগবানের কথা বলছ? তোমায় বলেছি না মানুষের সঙ্গে ভগবানের কোন সম্বন্ধ হতে পারে না। ও-সব হল এক একজনে মনের বিকার।

—বিকার!

—হ্যাঁ।

—তাহলে এত লোক যে এতকাল ধরে এ-সব বলেছে?

—তাঁরা সবাই ভণ্ড, প্রতারক।

—আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না।

—তার কারণ, তুমি সাধারণ ধর্মকাহিনী পড়েছ। বাবা ঠাকুর্দার

বিশ্বাস নিজের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছ। উপনিষৎ বেদান্ত পড়নি। যোগ সাধনা করনি।

বাঙ্গালী যুবকটি বললেন: আপনি যথার্থই বলেছেন। আমি উপনিষৎ বেদান্ত পড়িনি। যোগ সাধনাও করিনি।

আয়েঙ্গার বললেন, অধ্যাত্ম সাধনার চূড়ান্ত কথা হল এই যে, নিজেকে জান। নিজেকে জানলে ভগবান টগবানের কথা ছেলে-মানুষি মনে হয়। তখন চরম সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ভগবান টগবান হল দুর্বলের কল্পনা। কল্পনা করে একটা বিরাট বস্তু ভাবতে থাক। ঐকান্তিক চেষ্টা থাকলে তোমারও ভগবান বলে একটা বস্তু দর্শন হবে। সে তোমার সঙ্গে কথা বলবে। এমনকি তোমার অপরিস্ফুট শক্তিকে পরিস্ফুট করে লোকচক্ষে তোমাকে শক্তিমান করে তুলবে। তখন তুমি যা ইচ্ছে করবে তাই ভোগ করতে পারবে, যা চাও তাই পাবে। এমন কি তুমিও লোকের চোখে ভগবান হতে পারবে।

বাঙ্গালী যুবকটি যেন অবাক হলেন। যদিও বেদ-বেদান্ত উপনিষৎ তিনি পড়েন নি, যোগ সাধনাও করেন নি, তবু এ-সব কথার কিছু কিছু তাৎপর্য বুঝতে পারেন। ছোটবেলা বাউলদের মুখে এই ধরনের গান শুনেছেন:

'এই মানুষে আছে রে মন,
যারে কয় মানুষ রতন।'

মানুষের মধ্যেই মানুষরতন আছেন। ভগবান টগবান বাইরে খোঁজার কোন মানে নেই। আয়েঙ্গারকে ক্রমশঃ তাঁর বদ্ধ উন্মাদ বলেই বোধ হচ্ছিল। কিন্তু এই কথা কয়টি শোনার পর তাঁর ধারণা পাল্টে গেল। তাঁর মনে হল, আয়েঙ্গার একটা গুহ্য তত্ত্ব জানেন। কিন্তু কোন্ পথে তাঁর সাধনা কে বলবে। তিনি অবাক দৃষ্টিতে তাঁকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। কিন্তু ভাল করে তাকে যে তাকিয়ে দেখবেন, তার উপায় নেই, আয়েঙ্গার চলছেন না তো যেন উড়ে চলছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত তাঁরা একটা প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে এসে থামলেন। উঁচু ভিতের পাথরের উপর একটা দোতালা বাড়ি।

বাঙ্গালী যুবকটি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কার বাড়ি?

আয়েঙ্গার বললেন, আমার আশ্রয়দাতার।

—অর্থাৎ?

—এখানে যাঁরা থাকেন, তারাই আমার আশ্রয়দাতা।

বাঙ্গালী যুবকটি বললেন, তার মানে এঁরা আপনার ভক্ত এই তো! কিন্তু কিরকম ভক্ত?

আয়েঙ্গার বললেন, এঁরা আমার সেবা করতে চান, আমার কাছে তত্ত্ব কথা শুনতে চান। এঁদের দেশ হল রাজপুতানায়। এঁরা আমাকে সেখানেও নিয়ে যেতে চান।

বাঙ্গালী যুবকটি বললেন, তাহলে আপনিও দেখছি সাধু সেজে গৃহস্তদের প্রতারণা করছেন।

প্রতিবাদ করে উঠলেন আয়েঙ্গার, না, না! তা হবে কেন। আমি তো এঁদের এড়িয়ে যেতে চাই। কিন্তু এঁরাই যে আমাকে চান।

অবশ্য এঁরা চাইলেও আমি যে এঁদের গ্রাহ্য করি, তা নয়।

—তার প্রমাণ কি?

—প্রমাণ এখনই পাবে, আমার সঙ্গে এস। এই বিকানীরের মহাজনটি স্ত্রী এবং কন্যা নিয়ে এখানে বাস করেন, ছেলে নেই। ভেতরে চল, সব বুঝবে।

আয়েঙ্গার বাইরের ঘরে একজন চাকরকে হাঁক দিয়ে উঠলেন: এই, হামকো লে চলো।

চাকরটি হয়তো একা আয়েঙ্গারকে দেখলে কোন আপত্তি করতো না। কিন্তু সঙ্গে আমাকে দেখে কেমন ইতস্তত করতে লাগল। বলল, শেঠ তো আভি ঘরমে নেহি জী!

আয়েঙ্গার যে তার কথা শুনে বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করলেন তা মনে হল না। ভাবখানা এই যে, শেঠ নেই তো কি। এ ঘরে ঢুকবার

জন্য শেঠের অনুমতির অপেক্ষা তাঁকে করতে হবে না। যেন শেঠের চাইতেও বড় কেউ তাঁকে আহ্বান করেছেন বলেই তিনি এখানে এসেছেন। যেন তিনি তাঁর তৃতীয় নয়নে এমন জিনিষ দেখতে পেয়েছেন যা আমি বা শেঠের ঐ দারোয়ান দেখতে পায়নি। তিনি নিতান্ত অবজ্ঞার হাসি হাসতে লাগলেন।

বাঙ্গালী যুবকটি তাঁর সেই হাসির অর্থ বিশ্লেষণ করতে যাবেন এমন সময় দেখতে পেলেন যে, একটি পরমা সুন্দরী তন্বী কিশোরী মেয়ে উপর থেকে তর্ তর্ করে নিচে নামছে। যেন বেতার তরঙ্গে আয়েঙ্গারজীর সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। আয়েঙ্গারজী যে আসবেন একথা সে জানে। সে সোজা নেমে এসেই হাত জোড় করে নমস্কার করল আয়েঙ্গারকে। বলল, আইয়ে বাবাজী। চলো, উপর চলো। কাৎ হয়ে আয়েঙ্গারকে পথ দেখিয়ে পায় পায় সে উপরে উঠতে লাগল। বাঙ্গালী যুবকটি তাকিয়ে দেখলেন আয়েঙ্গার মৃদু মৃদু হাসছেন। তিনি নিজে কি করবেন এটা ভাবতে পারলেন না। উপরে উঠবেন না চলে যাবেন! আয়েঙ্গারজী তা দেখে বললেন: কৈ দাঁড়িয়ে কেন? এস! তবুও ইতস্ততঃ করছিলেন বাঙ্গালী যুবকটি। কিন্তু তাঁর সমস্যা দূর করে দিয়ে সেই কিশোরীটি ডাকল, আইয়ে সন্তজী।

বাঙ্গালী যুবকটিও তাঁদের অনুসরণ করে উপরে উঠতে লাগলেন।

উপরে গিয়ে ওঁরা একটি বড় ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। ঘরটি এত বড় যে বাইরে থেকে তার বিন্দুবিসর্গ অনুমান করা যায় না। দুনিয়ার সব জিনিষ যেন সেই ঘরে স্থান পেয়েছে। এ-সবই এই বিকানীরের মহাজনটির। এ-থেকেই তাঁর ঐশ্বর্যের ব্যাপকতা কতদূর তা বোঝা যায়। মেঝের তিনদিকে তিনটি ধব্‌ধবে বিছানা পাতা। এক ধারে একটি চমৎকার কারুকার্যকরা বিছানার উপর রঙিন চাদর ঢাকা দেওয়া। অন্যদিকে চকচকে বাসনপত্র থরে থরে সাজানো! সাধারণতঃ এভাবে দোকানেই জিনিষপত্র সাজানো থাকে। নানা

আসবাবপত্র। অধিকাংশ কাঠের উপরই বাটালির কাজ। অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরিপাটি কাজ।

ঘরে ঢুকতেই মেয়েটি একটি ঘটি করে জল এনে আয়েঙ্গারের পা ধুইয়ে দিল। বাঙ্গালী যুবকটিকেও সাধু মনে করে তাঁর পা ধোয়াতে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, হম সাধু নহি। এই বলে তাড়াতাড়ি একঘটি জল নিয়ে নিজের পা নিজেই ধুয়ে নিলেন।

আয়েঙ্গার বাবা বাঙ্গালী যুবকটির আগেই ঘরের মধ্যে ঢুকেছিলেন। বাঙ্গালী যুবকটি ঘরের মধ্যে ঢুকেই দেখতে পেলেন যে, আয়েঙ্গার নিঃসঙ্কোচে ঘরের সবচেয়ে সাজানো খাটটার উপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়েছেন। ভাবখানা এমন যে, তিনি যেন অত্যন্ত ক্লান্ত। এবং তাঁর জন্যই যেন খাটটিকে এমন সুচারু ভঙ্গীতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। অথচ রাস্তায় আসতে আসতে একটু আগেই তিনি যে অলৌকিক গতি দেখিয়েছেন—তা দেখলে তাঁর কখনও ক্লান্তিবোধ সম্ভব এ-কথা চিন্তা করা দুষ্কর। আয়েঙ্গারকে বাঙ্গালী যুবকটির কাছে ক্রমশঃ রহস্যময় বলে মনে হতে লাগল। কি উদ্দেশ্যে তিনি যে তাঁকে এখানে নিয়ে এলেন কে জানে।

কিছুকালের মধ্যেই গৃহকর্ত্রীও এলেন। ঘি দুধ ও ফলের রস খাওয়া রাজপুতানীর চেহারা যে-রকম হয়, সেই রকম স্থূল বপু। হাত, গলা, বুক আর মাথা সোনায় যেন মোড়ানো। বয়সে প্রায় প্রৌঢ়া। তিনি এসে প্রথমে আয়েঙ্গারের দুই পা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সেই পায়ের উপর মাথা রেখে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করলেন। তারপর পায়ের কাছে বসে তাঁর মেদবহুল দুই নরম হাতে আয়েঙ্গারের পা টিপে দিতে লাগলেন—যাকে বলে পদসেবা। এত বিনয়প্রসূত পদসেবা যে, একে পদলেহনের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে।

বাঙ্গালী যুবকটি আশ্চর্য হয়ে কিছুক্ষণ এই পদসেবা লক্ষ্য করলেন। তারপর নানা কথা ভাবতে লাগলেন: এই আয়েঙ্গার কে?

যথার্থই কি তিনি যোগবলসম্পন্ন বিরাট এক সাধক? কিম্বা এই রাজস্থানী মহাজনের কুলগুরু? কুলগুরুকে এ-ধরনের শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের রীতি আছে।

গিন্নী এঘরে এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। কিছুকালের মধ্যেই আবার তাকে দেখা গেল। দেখা গেল মেয়েটি দুই হাতে দুই থালা খাবার নিয়ে এসেছে। সেই খাবার এনে সে আসনের পাশে রাখল।

ভাল খাবার দেখলে ছেলেমানুষের যে অবস্থা হয় আয়েঙ্গারের মধ্যে যেন সেই রকম একটা ভাব দেখা গেল। তিনি বাঙ্গালী বাবুটির দিকে তাকিয়ে বললন, জান, এ আমার ভারি আরামের জায়গা। এই কারণে বৃন্দাবনে এলেই আমি এঁদের কাছে থাকি। এঁরাও আমাকে অন্য কোথাও থাকতে দেয় না।

আয়েঙ্গার বাবা হাবভাব যা-ই দেখান না কেন মেয়েটির প্রত্যাশা তিনি পূরণ করলেন না। বললেন, আমি কোন খাবার খাব না! খাবার তুমি তুলে নিয়ে যাও। মেয়েটি করুণ দুটি চোখ করে—আয়েঙ্গার বাবার দিকে তাকালো। তার এত প্রত্যাশাকে আয়েঙ্গার কোন মূল্যই দেবেন না।

মেয়েটির মনের কথা যেন আয়েঙ্গার বাবা বুঝতে পেরেছেন। অর্থাৎ তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, মেয়েটি তাঁর প্রত্যাখ্যানে রীতিমত মর্মাহত হয়েছে। সেই জন্য তাকে কিছুটা সান্ত্বনা দেবার জন্য বললেন, বাঙ্গালী বাবুটি যদি কিছু খেতে চায়, তবে তাঁকে এই খাবার দাও মা। আমি এখন খাব না, কারণ এটি ঠিক খাবার সময় নয়।

বাঙ্গালী যুবকটিও খাবেন না একথা শুনে মেয়েটি যেন কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল। মনে হল তার দু-চোখে কেমন করুণ ভাব ফুটে উঠেছে। সে তার রাজস্থানী ভাষায় অত্যন্ত মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কি বলল। সে ভাষা প্রচলিত হিন্দী নয়। তবে বাঙ্গালী যুবকটি এইটুকু বুঝতে পারল যে, সে বলছে, তুমি খাবে না কেন মহারাজ? আমাদের কি কিছু

অপরাধ হয়েছে? নিশ্চয়ই কোন কসুর হয়ে থাকবে, তাই তুমি খাচ্ছ না। সাধু বাড়ি এসে যদি না খেয়ে চলে যান তাহলে যে আমাদের অমঙ্গল হবে।

অধ্যাত্ম জীবনের সন্ধানে যাঁরা গৃহত্যাগী—তাদের ভোজনের ব্যাপারে অত্যন্ত সংযমের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। অবেলায় আহার একান্ত নিষিদ্ধ। বাঙ্গালী যুবকটি সাধুসন্ত হলেও ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছিলেন অধ্যাত্ম জীবনের সন্ধানেই। সেই জন্য সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য যে সংযম সবই পালন করে চলছিলেন। কিন্তু মেয়েটির আন্তরিকতা ও করুণ ভাব দেখে অগত্যা তাঁকে রাজী হতেই হল। তিনি নিয়ম ভঙ্গ করেও কিছু খাদ্য গ্রহণ করলেন।

এসব যখন ঘটছিল আয়েঙ্গার তখন মৃদু মৃদু হাসছিলেন। তাঁর কি ইচ্ছা কে জানে। কেন যে তিনি বাঙ্গালী যুবকটিকে এখানে নিয়ে এসেছেন তাই বা বলবে কে। কিছুক্ষণ আগেও তাঁকে নিতান্ত একটা পাগল বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু রাস্তায় আসতে আসতে তাঁর কিছু কিছু কথা রীতিমত চিন্তার উদ্রেক করেছে। এখানে এই রাজস্থানী মহাজনের বাড়িতে তিনি কী খেলা খেলতে চান সেটাই বাঙ্গালী যুবকটির কাছে প্রচণ্ড কৌতূহলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো।

আয়েঙ্গার যে বিছানাতে টান টান হয়ে শুয়ে মা ও মেয়ের সেবা নিচ্ছেন তো নিচ্ছেনই। যেন স্বয়ং বিষ্ণু লক্ষ্মীর পরিচর্যা গ্রহণ করছেন বৈকুণ্ঠধামে বসে। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। ঘরে দীপ জ্বালা হল। আয়েঙ্গার তখনও শুয়ে আছেন। ওঠার নাম নেই। তিনি কেন এসেছেন? কি করতে এসেছেন? বাঙ্গালী যুবকটি অধৈর্য হয়ে উঠলেন। এই কর্মহীন আলস্যের অবস্থা তিনি যেন আর দেখতে পাচ্ছিলেন না। ভেতরে ভেতরে বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। মেয়েটি তাঁর টাক মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর আয়েঙ্গার পরম আনন্দে বিশ্রাম উপভোগ করছেন। বাঙ্গালী যুবকটির মনে হতে লাগল—আয়েঙ্গার সম্পর্কে কৌতূহল বোধ না করে কেশীঘাটে বরং জগদীশ

বাবার খোঁজ করলেই ভাল হত। এখানে আয়েঙ্গার বাবা তাঁকে কী দেখাতে চান? বিকানীরের নারীরূপ? তিনি মনে মনে এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে একবার আয়েঙ্গারকে কেশে উঠতে শুনলেন। এমনভাবে কাশলেন আয়েঙ্গার, যেন কত দীর্ঘ দিনের শ্লেষ্মার বেগ আছে তাঁর।

সেই কাশির আওয়াজে বাঙ্গালী যুবকটি আয়েঙ্গার বাবার দিকে ফিরে তাকালেন। দেখলেন আয়েঙ্গার উঠে ঘরের প্রদীপের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। কিন্তু একি! কী দেখলেন তিনি! এতো পার্থসহায় আয়েঙ্গারের মূর্তি নয়! তিনি দেখলেন এক অপূর্ব কমনীয় যুবাপুরুষ। তেজোদ্দীপ্ত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। স্বস্তিকাসনে বসে আছেন। হাতের উপরের দিকে কবচ। নিচে কঙ্কন। পরণে উজ্জ্বল রেশমী বস্ত্র। সোনালী পাড়। বাঁ কাঁধ থেকে উত্তরীয় নেমেছে। এমন অপূর্ব গৌরাঙ্গ মূর্তি সাধারণতঃ চোখে দেখা যায় না।

রাজস্থানী মা ও মেয়ে অপলক দৃষ্টিতে সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছেন। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, মূর্তিটিতে কোন প্রাণের স্পন্দন আছে বলে মনে হয় না। যেন পাথরের একটা মূর্তি।

এ-দেখা কি চোখের ভুল দেখা কিনা, বাঙ্গালী যুবকটি তাই ভাবতে লাগলেন। কয়েকবার চোখ কচলে আয়েঙ্গারের দিকে তাকালেন তিনি। কিন্তু সেই একই দৃশ্য। পার্থসারথি আয়েঙ্গারের সঙ্গে এই বৃন্দাবনে এসেই প্রথম পরিচয় বাঙ্গালী যুবকটির। এতক্ষণ তাঁকে মনে হয়েছিল আধপাগলা এক প্রৌঢ়। অত্যন্ত বদ-মেজাজী। কিন্তু এখন যেন সম্পূর্ণ অন্যরূপ। কোন্ ক্ষমতাবলে আয়েঙ্গার তাঁর রূপ বদল করেছেন? এ রূপবদল আবার কিসের বিভূতি! শোনা গেছে সিদ্ধ যোগীরা ইচ্ছামাত্রই এ-সব করতে পারেন। অনিমা লঘিমাদি সিদ্ধি থাকলে তবেই এরকম হওয়া সম্ভব। তবে সিদ্ধ পুরুষেরা সচরাচর এ-রকম করেন না। আয়েঙ্গার কেন এরকম করছেন! বাঙ্গালী যুবকটি নিজের মনের মধ্যে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন।

আপন মনে আশ্চর্য হয়ে বাঙ্গালী যুবকটি যখন ভাবছিলেন, যখন ঐ মূর্তিটি প্রসন্ন মুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, তারপর মাথাটা নিচের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়ে তাঁকে ইঙ্গিতে কাছে আসতে বললেন, এদিকে এস।

বাঙ্গালী যুবকটি উঠে গিয়ে তাঁর কাছে খাটের ধারে এসে দাঁড়ালেন। আয়েঙ্গার দীর্ঘ হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে তাঁকে বুকের সামনে টেনে এনে জড়িয়ে ধরলেন। এ এক আশ্চর্য আলিঙ্গন যেন। সেই আলিঙ্গনে আবদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন কী এক অব্যক্ত কারণে বাঙ্গালী যুবকটির সারা দেহ থর থর করে কাঁপতে লাগল। কাঁপতে কাঁপতে তিনি চৈতন্য হারিয়ে ফেললেন। তাঁর আর কোন বোধ থাকল না।

জ্ঞান হতে বেশ কিছুটা সময় লাগল। কিন্তু বাঙ্গালী যুবকটি জ্ঞান হলে দেখতে পেল যে, সেই যুবক ব্রহ্মচারীটি আর নেই। তাঁর জায়াগায় বসে আছেন এক প্রৌঢ় সন্ন্যাসী। তাঁরও বর্ণ বেশ উজ্জ্বল। কপালে চন্দনের ছাপ। কৌপিন পরা। তাঁর ডান দিকে একটি মাটির প্রদীপ জ্বলছে। বাঙ্গালী যুবকটি অবাক হয়ে দেখলেন যে, তিনি নিজে বসে আছেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন পার্থসহায় আয়েঙ্গার। তাঁর মনে হল প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর এ মূর্তি যেন তিনি কোথায় দেখেছেন। কিন্তু কোথায়? তিনি ভাববার চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন সময় পাশে দাঁড়ানো পার্থসহায় আয়েঙ্গার তাঁকে কানে কানে বললেন, এই হল জগদীশ বাবা। এঁকে প্রণাম করে চলো এখন যাই। কাল আবার তুমি আসবে। তখন আর আমার সঙ্গে আসার প্রয়োজন হবে না।

আয়েঙ্গারের এই কথা শোনামাত্রই বাঙ্গালী যুবকটি জগদীশ বাবাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন। আয়েঙ্গারের সঙ্গে একত্রে কুটির থেকে বেরুলেন। বেরিয়েই সামনে পেলেন একটি কুঞ্জবন। বড় বড় গাছ পেরিয়ে তাঁরা এসে যমুনার ধারে পড়লেন। আয়েঙ্গার আগের

মতই তাঁর কাঁধে হাত রেখে চলতে লাগলেন। আয়েঙ্গার তাঁর কাঁধে হাত রাখতেই দুজনে যেন এক সঙ্গে উড়ে চললেন। কেশীঘাটের কাছে এসে—আয়েঙ্গার বললেন, চলো, আমরা যেখান থেকে বেরিয়েছিলাম আবার সেখানেই ফিরে যাই।' একথা বলেই আয়েঙ্গার আবার বাঙ্গালী যুবকটিকে জড়িয়ে ধরলেন। আয়েঙ্গারের আলিঙ্গনের মধ্যে কী যে একটা অব্যক্ত স্পর্শ জড়ানো আছে কে বলবে। আবার বাঙ্গালী যুবকটি নিজের মধ্যে সেই বিহ্বলতা অনুভব করলেন। তাঁর সমস্ত দেহ যেন থর থর করে কাঁপতে লাগল। তিনি আগেরবারের মত এবারও জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। অনেকক্ষণ তাঁর আর কোন বোধশক্তি থাকল না। তারপর আবার যখন জ্ঞান হল তখন বাঙ্গালী যুবকটি দেখলেন যে, তিনি কোথাও যাননি। বিকানীরের সেই মহাজনের কুটিরের মধ্যেই রয়েছেন। আয়েঙ্গার তেমনি খাটের উপর শুয়ে আছেন। তাঁর টাক মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সেই মেয়েটি। পায়ের কাছে বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন মা। আয়েঙ্গার আবার একটু কেশে উঠলেন। সেই কাশির শব্দ শুনে বাঙ্গালী যুবকটির চৈতন্য যেন সম্পূর্ণভাবে ফিরে এল। চৈতন্য ফিরতেই তাকিয়ে দেখলেন, জ্বল জ্বল চোখে আয়েঙ্গার তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মুখে কেমন একটা অদ্ভুত পরিহাসের হাসি।

বাঙ্গালী যুবকটি উঠে দাঁড়াতেই আয়েঙ্গার বললেন, তাহলে যাচ্ছ? এস। কাল সকালেই জগদীশ বাবার কাছে যেও। রাস্তাটা কেশীঘাটের উপর দিয়ে সোজা—ঠিক যমুনার ধারে ধারে। মনে থাকবে তো? আধ্যাত্ম জ্ঞানপিপাসু যুবকটি বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই থাকবে। আয়েঙ্গার বললেন, আমার উপর ভক্তি হয়েছে তো?

এই ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা বা ভেল্কি দেখলে শ্রদ্ধা বা ভক্তি কতদূর জাগে কে জানে। তবে সমীহা জাগে। বাঙ্গালী যুবকটি ভাবতে লাগলেন, জগদীশ বাবাকে চেনাবার জন্য এত ক্ষমতা আয়েঙ্গার না দেখালেও পারতেন। আয়েঙ্গার যদি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের

মত নিজের পরিচয় দিতেন তাহলেই বোধহয় বাঙ্গালী যুবকটি বেশী খুশি হতেন। কিন্তু আয়েঙ্গার তাঁকে সবচেয়ে বড় যে শিক্ষা দিয়েছেন তা হল এই যে, সাধু সন্ন্যাসী চেনা সহজ নয়। সাধু সন্ত যে পোশাকে আশাকে থাকবে এমন কথা নয়। পথে প্রান্তরে অনেকেই হয়তো সাধু সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, চিনে নেওয়ার চোখ চাই। প্রবাদ বাক্যের গুরুত্ব হেলাফেলার জিনিষ নয়:

'যেথানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই
পেলেও পাইতে পার লুকানো রতন।'

মণিকর্ণিকার রহস্যময় সাধক

একান্নপীঠ ছড়িয়ে আছে ভারতের প্রায় সর্বত্র। মহাশৈবতীর্থ কাশী বা বারাণসীতেও রয়েছে একান্নপীঠের এক পীঠ। পীঠনির্ণয়ের মতে একান্নপীঠের অন্যতম এক পীঠ রয়েছে এখানে। আবার শিব-চরিতের মতে এটা পীঠ নয়, উপপীঠ। কাশীতে সতীপীঠ রয়েছে মণিকর্ণিকা ঘাটে। পীঠনির্ণয়ে এ-সম্পর্কে বর্ণনা আছে এই ভাবে :

'বারাণস্যা বিশালাক্ষী দেবতা কালভৈরবঃ।
মণিকর্ণীতি বিখ্যাতা কুণ্ডলং চ মম শ্রুতি ॥'

অর্থাৎ বারাণসীতে পড়েছিল সতীর কর্ণকুণ্ডল। দেবীর নাম বিশালাক্ষী। ভৈরবের নাম কাল। পীঠস্থান গঙ্গাতীরে মণিকর্ণিকায়।

বারাণসীতে বা কাশীতে বেড়াতে না গেছেন হেন পুণ্যার্থী বা ভ্রমণবিলাসী বাংলাদেশে কম। আমি নিজে গেছি চারবার। বিশ্বনাথ দর্শন করেছি, পূজো দিয়েছি। কিন্তু আশ্চর্য! পাণ্ডারা একবারও আমাকে মহাশাক্তপীঠ মণিকর্ণিকা ঘাটের কথা বলেনি। মণিকর্ণিকা ঘাটে গিয়েছি, কিন্তু অজ্ঞতা বশতঃ একবারও অনুমান করতে পারিনি যে, মহাশাক্তপীঠের পুণ্যস্পর্শ লাভ করছি এখানে দাঁড়িয়ে। পাণ্ডারা মণিকর্ণিকা ঘাট দেখিয়েছে কিন্তু তার ইতিহাস বর্ণনা করেনি। এই শাক্তপীঠ সম্পর্কে পাণ্ডাদের এত অনীহা কেন জানি না। শিব-তীর্থের পাণ্ডারা শাক্তদেবী সম্পর্কে তেমন আগ্রহী নয় সেই জন্য? শুনেছি এরকম একটা বিরোধও আছে। সেই জন্য শাক্তসাধক বামা ক্ষেপা নাকি শৈবধাম কাশীতে যেতে পারেন নি। দুর্ব্যবহার পেয়েছিলেন। কিন্তু শাক্ত আর শৈবের মধ্যে তো সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। পুরুষ শিব যখন ক্রিয়াশীল তখনই তিনি শক্তি। ভারত দর্শনের এই সব গুহ্য কথা অধিকাংশ ধর্মের ধ্বজাধারী লোকের কাছেই অজ্ঞাত।

সেই জন্য একসময় হিন্দুধর্মের মধ্যেও শাক্ত শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতিতে কলহের অন্ত ছিল না। শাক্তকবি ভারতচন্দ্র, যিনি অন্নদামঙ্গল লিখেছেন, বারাণসীতে শাক্তপীঠ সম্পর্কে তিনিও তেমন করে বলেননি। তাহলে? তাহলে কি কাশীতে শাক্তপীঠের চিন্তা এসেছে অনেক পরে? মূল পীঠনির্ণয়ে শাক্তপীঠের তালিকায় কাশীর নাম ছিল না? কিছুটা গোলমাল আছে সন্দেহ নেই। কারণ এ সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রকারের বর্ণনার মধ্যেও মিল নেই। শিবচরিতে বারাণসীকে মহাপীঠ বলা হয় নি। বলা হয়েছে উপপীঠ। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে একান্ন সতীপীঠের যে তালিকা দেওয়া আছে, তাতে লেখা আছে সতীর কুণ্ডল পড়েছিল বারাণসীতে। শিবচরিতের মত তিনিও একে উল্লেখ করেছেন উপপীঠ বলে। দেবীর নাম তিনি বলেছেন বিশালাক্ষী বা অন্নপূর্ণা। বড় ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখার্জী তাঁর Nationalism in Ancient India গ্রন্থে বলেছেন যে, সতীর বাম অঙ্গুলী পড়েছিল বারাণসীতে। দেবীর নাম অন্নপূর্ণা। আবার যাঁরা নিজেরা ঘুরে এসেছেন তীর্থপুণ্যের আশা নিয়ে, তাঁদের মতে দেবীর নাম বিশালাক্ষী, ভৈরবের নাম মহাকাল। কালভৈরব নামে শিব আছে বারাণসীর চকে। মূর্তি রূপোর। মন্দিরের সামনে আছে লিঙ্গ। পীঠস্থান হল গঙ্গার ধারে মণিকর্ণিকায়। মণিকর্ণিকার উৎপত্তি নিয়ে পুরাণে ভিন্ন রকম গল্প আছে। যার ফলে সতীর কর্ণকুণ্ডল পতনের কাহিনী অস্বীকৃত হয়েছে। গল্প হল এইরকম, যেমন, ভগবান বিষ্ণু চক্র দিয়ে কাশীধামে একট পুষ্করিণী তৈরি করেন। নিজের দেহ নির্গত স্বেদে সেই পুষ্করিণী পূর্ণ করে তার পাশে সহস্র বৎসর শিবের সাধনা করেন। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে হরপার্বতী এসে দেখা দেন। হঠাৎ পার্বতীর কর্ণভূষণ খুলে সেই জলে পড়ে। তখন থেকে এর নাম হয় মণিকর্ণিকা। সেই মণিকর্ণিকা পুষ্করিণীই মণিমর্ণিকা ঘাট। এইসব কাহিনী জানা ছিল না বলে মণিকর্ণিকা ঘাটে মহাশাক্ত পীঠের পুণ্য অর্জন করতে পারিনি আমি। তবে যদি ভিন্ন মতের কথাই সত্য

হয়, অন্নপূর্ণা যদি শাক্তদেবী হন, তাহলে আমি অবশ্য কাশীতে শাক্ততীর্থের পুণ্য অর্জন করেছি। যদি তিনি থাকেন মণিকর্ণিকায়, যদি হন বিশালাক্ষী তবে ভ্রান্তি বশতঃ তাঁকে পূজো দেওয়া হয়নি, কিন্তু সে পুণ্যমৃত্তিকার স্পর্শ লাভ করেছি। তবে সঠিক পুণ্য যাঁরা অর্জন করতে চান, যথার্থ দেবীকে পূজো দিতে চান, তাঁদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন কাশীর পণ্ডিতদের কাছে যথার্থ দেবীর খবর নিতে যান। তবে মণিকর্ণিকা যদি বারাণসীতে না হয়, তাহলে এর অস্তিত্ব খুঁজতে হবে ভিন্ন স্থানে। কোন কোন সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা গলায় মণিকর্ণিকা কুণ্ডের এক ধরনের মণি ধারণ করেন। আসলে এ মণি হল এক ধরনের উপলখণ্ড। হিমালয়ের মধ্যে কোন স্থানে একটি প্রস্রবণ আছে। সে প্রস্রবণের জলে চাল বসালে বিনা আগুনেই ভাত হয়ে যায়। সেই প্রস্রবণই মণিকর্ণিকা তীর্থ। কিন্তু সতী-কাহিনীর সঙ্গে এ তীর্থের যোগ আছে কিনা জানি না। তবে অধিকাংশেরই বিশ্বাস সতীদেহ বা অঙ্গভূষণের সঙ্গে যুক্ত মণিকর্ণিকা হল কাশীতেই বা বারাণসীতে। অন্ততঃ অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই এরকম ধারণা ছিল। সাধক রামপ্রসাদের সময়ও বারাণসী একান্ন-পীঠের অন্যতম একটি পীঠ হিসেবে গণ্য হত। রামপ্রসাদের গানের মধ্যেই এরকম ইঙ্গিত আছে। রামপ্রসাদের একটি গানে অছে :

‘কাজ কি আমার কাশী।
যাঁর কৃত কাশী তত্ত্বমসি বিগলিত কেশী।’
সেই জগদম্বার কুণ্ডল পড়েছিল খসি।
সেই হতে মণিকর্ণিকা বলে তারে ঘুসি।’

তর্কবিতর্ক যাই থাক না কেন, আমার নিজেরও বিশ্বাস যে, একান্নপীঠের অন্যতম একটি পীঠ মণিকর্ণিকা তীর্থ কাশীতেই অবস্থিত। সজ্ঞানে সেখানে আমি ৺মায়ের পূজো দিতে না পারলেও জনৈক শাক্ত-মহাসাধকের আমি সেখানে দেখা পেয়েছিলাম। সেই কাহিনীতেই আসছি।

১৯১৯ সালে একবার আমি কাশী গিয়েছিলাম। যাবার কোন কথাই ছিল না। অকস্মাৎই যাওয়া। কোন দৈবশক্তিই তখন আমাকে কাশীতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল কিনা, এখন সে-কথাই মনে পড়ে। গিয়েছিলাম কাটীহার। নিজের বাড়িতে। গিয়ে দেখি আমার জ্যাঠাইমাকে নিয়ে আমাদের আত্মীয় প্রতিম এক ভদ্রলোক কাশী যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য জ্যাঠাইমাকে তীর্থপুণ্য অর্জন করানো এবং সেই সঙ্গে নিজেও কিছু পুণ্য অর্জন করা। তবে দূর দেশে ঘোরার কোন বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা সেই ভদ্রলোকের নেই। এ-জন্য কিছুটা সঙ্কোচ ও ভীতি ছিল। ঠিক এমন সময় আমি গিয়ে কাটীহার উপস্থিত। আমার সঙ্গে অর্থকড়ি ধরতে গেলে কিছুই ছিল না। কিন্তু আমাকে ওঁরা চেপে ধরলেন, তাঁদের সঙ্গে কাশী যেতে হবে। শুধুমাত্র কাশী নয়, হরিদ্বার, মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থেও ঘুরবেন তাঁরা। বিদেশ বিভূঁয়ে একজন চলিয়ে বলিয়ে লোক সঙ্গে গেলে ভাল হয়। কিন্তু আমি একেবারেই অপ্রস্তুত। টাকাপয়সা নিয়ে যাইনি। তাই রাজী হচ্ছিলুম না। শেষপর্যন্ত সেই ভদ্রলোক বললেন, টাকা পয়সা তিনি দেবেন। আমি সঙ্গে গেলেই হল। পরে কোন এক সময় তাঁকে টাকা পয়সা দিয়ে দিলেই হবে।

তীর্থপুণ্যের কতটা লোভ আমার মধ্যে ছিল জানি না তবে দেশ-বিদেশের নেশা প্রচুর ছিল। সেই জন্য শেষপর্যন্ত রাজী হয়ে গেলুম। রাজী হয়ে গেলুম আর একটি বিশেষ কারণে,—তখন কি জানি কেন সাধুসন্ত সম্পর্কে আমার প্রবল একটা কৌতূহল ছিল। কাশী হরিদ্বার মথুরা বৃন্দাবন কোথাও না কোথাও বড় দু'একজন সাধুসন্তের দেখাও পেতে পারি এই আশা নিয়েই ভদ্রলোকের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম।

বাংলাদেশ থেকে সখের ভ্রমণ, তীর্থ ভ্রমণ, যে-জন্যই হোক না কেন কোথাও বাইরে যেতে হলে শুধু টিকিটের জন্যই দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি চাই। তার পরও ভিড়ের অভাব নেই। কিন্তু কাটীহার

থেকে ট্রেনে যাবার জন্য সে-রকম কোন কসরৎ করার প্রয়োজন নেই। রিজার্ভেশনের কথা বলতে ওখানকারই একজন টিকিট চেকার বললেন, এ লাইনে রিজার্ভেশনের দরকার নেই। শুয়ে বসে যেভাবে খুশি যাবেন। তবে···

'তবে'-র অর্থ আজ ভারতবাসীর সবার কাছেই অত্যন্ত পরিষ্কার। সুতরাং ব্যবস্থা হল। এবং সত্যি সত্যিই বসে বসে নয় শুয়ে শুয়েই কাশী গেলাম।

বারাণসী বা কাশীতে সেই আমার প্রথম যাত্রা। সাধুসন্ত দেখার লোভ তখনও আমার ছিল। শুনেছি কাশী বড় তীর্থস্থান। কাশীর শিব জগদ্বিখ্যাত, এ ছাড়া কাশীতে একান্নপীঠের অন্যতম কোন পীঠ আছে একথা কারো মুখে কখনও শুনিনি। একান্নপীঠের ইতিহাসটাই তখন পর্যন্ত আমার কাছে অজ্ঞাত। তন্ত্র সম্পর্কে ভীতি ছাড়া কোন শ্রদ্ধার ভাব মনে নেই। তন্ত্র যে একটা বড় সায়েন্স, একটা বিজ্ঞান-সম্মত অধ্যাত্ম সাধনার পথ, সেটা এতদিনে জেনেছি, জেনেছি তাও একজন বড় ভদ্র তান্ত্রিকের কথাতে। তিনি চাকুরী করেন। ফুলবাবু। অনেক মাইনে পান। বাইরে থেকে দেখলে বুঝবার উপায় নেই যে তিনি ধর্মের পথের কেউ। তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির কাছ থেকে একদিন শুনেছিলাম যে, তিনি তারাপীঠের সাধক। সে পরিচয় পরে পাই। তিনিই আমাকে তন্ত্রের খোঁজ করতে নির্দেশ দেন এবং স্পষ্ট করে বলেন যে, তন্ত্র আমার প্রাক্তন জীবনের অভিজ্ঞতা। তন্ত্রের সন্ধান আরম্ভ করলেই এর অনেক গুহ্যতত্ত্ব আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। কিছু খোঁজ করেছি সন্দেহ নেই। তবে কোন্ গূঢ় রহস্য আমার কাছে খুলেছে বলতে পারি না। কিন্তু একটা জিনিষ বুঝেছি যে, তন্ত্র একটা বড় বিজ্ঞান। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের অধুনাতম সিদ্ধান্তের সঙ্গে তন্ত্রের বক্তব্যের কোন ফারাক নেই। এখন অবশ্য সেই জন্য সাধুসন্তকে নতুন দৃষ্টিতে দেখি। অনেক অধ্যাত্ম গ্রন্থ পড়েও অত্যন্ত সহজভাবে বুঝতে পারি। কিন্তু সে কথা থাক, এ

ব্যাপার বুঝবার আগে কাশীতে আমার কি হয়েছিল তাই বলা যাক। অজ্ঞাতে কাশীর ঘাটে কি করে এক মহা শাক্তসাধকের দেখা পেয়েছিলাম সে কথাই বলি। সে অভিজ্ঞতা আজ আমার একাম্ন-পীঠের সাধক গ্রন্থে এভাবে কাজে লাগবে তা কল্পনার অতীত। বহুদিন পরে আজ তন্ত্র সাধকদের কাহিনী নিয়ে বই লিখব, কোনদিন ভাবতেও পারিনি। আর কাশীর সেই অভিজ্ঞতা যে একাম্নপীঠের সাধক প্রসঙ্গেই কাজে লাগবে—তা এতদিন পর্যন্তও ছিল আমার কাছে কল্পনার অতীত। বস্তুত আমরা যদি আমাদের নিজেদের জীবনটা বিচার করি—তাহলে দেখতে পাব যে, জীবনটা আমাদের ঐহিক ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। ঐহিক ইচ্ছা বলতে আমি সেই ইচ্ছার কথা বলছি, যে ইচ্ছা আমাদের সচেতন মনের। মনের মধ্যে আমাদের আরেক মন ঘুমিয়ে থাকে। সেই মনই হল আসল মন, সেই মনের ইচ্ছা অনুযায়ীই কাজ হয়। সচেতন মন সেই মনের ইচ্ছার কথা জানতে পারে না বলে ভাবে যে, নিয়তি করলো সেই কাজ। আসলে আপন ইচ্ছাতেই সব কাজ হয়, ভাল মন্দ সব। আত্মার এই গভীর রহস্যে যাঁরা ডুব দিয়েছেন তাঁরাই মাত্র এর খবর রাখেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে ডুব দিলেও অনেকে এ খবর পান, অধ্যাত্ম মন নিয়ে ডুব দিলেও। সেবারকার কাশীদর্শন আমার সেই গভীরতম মনের নির্দেশেই হয়তো হয়েছিল আমি বুঝতে পারিনি। এবং বহুদিন পরে আজকে সেই দর্শনই আমার সামান্যতম কাজেও লাগবে আমার সচেতন মন তখন তা কোনভাবেই বুঝতে পারেনি। আমার নিজের জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যা আমার সচেতন মনের নির্দেশে হয়নি এবং বহুদিন পরে আজ যখন সে সব কথা বিচার করি তখন কর্মের জন্য আর ফল প্রত্যাশা করার কোন আকাঙ্ক্ষা হয় না। কারণ আমি বুঝতে পারি যে, সচেতন মনের ‘আকাঙ্ক্ষা’ আকাঙ্ক্ষা মাত্র এবং তা যথার্থ আকাঙ্ক্ষা নয়। যথার্থ আকাঙ্ক্ষার মালিক বসে আছেন নিজের ভিতরেই। এবং তাঁর আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হবে।

সেবারকার কাশীদর্শন আমার সেই মনেরই আকাঙ্ক্ষা ছিল বলে এখন মনে হয়। কাশীতে তেমন বড় বড় গগনচুম্বী মন্দিরের চূড়া নেই একমাত্র বিড়লার শিবমন্দির ছাড়া। তবু কাশীর কাছাকাছি এসে পড়তেই আমার কিন্তু সেই সত্যেন দত্তের বারাণসী কবিতার কয়েকটি লাইন মনে পড়েছিল :

'যাত্রীরা সবে বলিয়া উঠিল দেখা যায় বারাণসী।
চমকি চাহিনু স্বর্গ সুষমা মর্ত্তে পড়েছে খসি।
এপারে সবুজ বজরার ক্ষেত, ওপারে পুণ্য পুরী,
দেবের টোপর দেউলে দেউলে কাঁপিছে কিরণ ঝুরি।'

একটা পবিত্র অধ্যাত্মতার গন্ধ পাচ্ছিলাম যেন। তার কারণ হয়তো রাত্রিবেলা গাড়িতে শুয়ে ঘুমোবার সময়কার একটি স্বপ্ন। যে স্বপ্নে আমি কাশী দেখবার আগেই কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের শিবলিঙ্গ, তাঁর মন্দির, মন্দিরের প্রবেশের মুখে গণেশের মূর্তি, অন্নপূর্ণা ইত্যাদি দেখেছিলাম। এর আগে কখনও ছবিতেও এসব আমি কিছু দেখিনি। কিন্তু যা স্বপ্নে দেখেছিলাম কাশীতে পৌঁছে যথার্থ সেই সবই দেখেছিলাম। অভিজ্ঞতার বাইরে এ-সব স্বপ্নেই বা আমি দেখেছিলাম কি করে—আজও তাই ভাবি। এই জন্যই প্রাক্তনের কথা মানতে হয়। হয়তো পূর্ব জন্মের অভিজ্ঞতার ফলেই এরকম হয়েছিল। কিন্তু এ-সব যে এক কথায় ব্যাখ্যা করা যাবে তা নয়। কারণ আমার জীবনে ছোটবেলা অদ্ভুত রকম অনেক স্বপ্ন আমি দেখতাম, যে স্বপ্নগুলিকে অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিচার করা চলে না। যেমন, কি ঘটবে, বাড়িতে কোন্ লোক আসছে, তা সবই স্বপ্নে আগে জেনে যেতাম। এ-সব রহস্য রহস্যই, ছকে বাঁধা ফরমুলায় ফেলে বিচার করবার নয়। সে যাই হোক, সেই স্বপ্নই হয়তো কাশী সম্পর্কে আমার মনে একটা এক্স্ট্রা অধ্যাত্ম চেতনা জাগিয়েছিল যে জন্য কাশীর কাছাকাছি আসতেই একটা পবিত্র অধ্যাত্মতার স্পর্শ পেয়েছিলাম। তাছাড়া ছিল আরও একটা কারণ। রাস্তায় আসতে আসতে আমাদের

আত্মীয়প্রতীম সেই ভদ্রলোক সাধুসন্তদের সম্পর্কে আমাকে অনেক গল্প শুনিয়েছিলেন। সবই অবশ্য কাশীর সাধু।

ভদ্রলোকের সাধুসন্তের অলৌকিকতার দিকেই ঝোঁক বেশী। কয়েকজন সাধুর সেই ধরনের অলৌকিকতার কথাই বলেছিলেন। তৈলঙ্গ স্বামীর কয়েকটি অলৌকিকতার কথা এখনও মনে পড়ে। তৈলঙ্গ স্বামী রামেশ্বর সেতুবন্ধে ছিলেন তখন। মহা সমারোহে সেখানে একটা বড় মেলা হচ্ছে। দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত এক ব্রাহ্মণের ছেলে মেলায় এসে হঠাৎ মারা গেলেন। সকলে ব্যস্ত হয়ে উঠল মৃতদেহ সংকারের জন্য। আত্মীয় পরিজনদের বিলাপ ও আর্তনাদ উঠল। ঠিক সেই সময় তৈলঙ্গ স্বামী যাচ্ছিলেন সেখান দিয়ে। কান্নাকাটি শুনে তাঁর মনে বেদনাবোধ হল। কমণ্ডুল থেকে জল নিয়ে মন্ত্রঃপুত করে সেই জল তিনি মৃতের দেহে ছিটিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। হাজার হাজার মানুষের সামনেই যুবকটি চোখ মেলল। সবাই দেখল মৃতদেহে আবার প্রাণ ফিরে এসেছে।

এই তৈলঙ্গ স্বামী নেপালে, নর্মদাতীরে প্রভৃতি নানা স্থানে তাঁর অলৌকিক যোগবিভূতি দেখিয়ে শেষপর্যন্ত আসেন বারাণসীতে। বারাণসীতে তিনি ইতিহাস তৈরি করে গেছেন। কাশীর ঘাটেও তিনি অনেক মৃত বা মৃতপ্রায়কে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন। কয়েকজন রাজাকে নিয়েও কাহিনী আছে। একদিক থেকে এ-সব কাহিনী কিছুটা শিক্ষামূলকও বটে। গল্পগুলো এই রকম: একজন দেশীয় রাজা এসেছেন কাশীতে বেড়াতে এবং তীর্থ করতে। দশাশ্বমেধঘাটের কাছে তিনি রাণী ও পরিবারের অন্যান্যদের নিয়ে স্নান করবেন। সে জন্য তোড়জোর চলছে। রাজার প্রাসাদ ঘাটেরই কাছে। পুরমহিলারা রক্ষণশীল, তাই তাঁদের স্নানের জন্য একটি বস্ত্র-বেষ্টনী তৈরি করা হয়েছে। প্রাসাদ থেকে দশাশ্বমেধ ঘাট পর্যন্ত সেই বস্ত্র বেষ্টনী প্রসারিত। রাজা ও রাণী এই বেষ্টনীর মধ্যে স্নান করতে নেমেছেন। এমন সময় এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। সিপাই সান্ত্রীদের কড়া

পাহারা এড়িয়ে কোন্ ফাঁকে এক উলঙ্গ সন্ন্যাসী এসে তাঁদের পাশে দাঁড়ালেন। ভীত সন্ত্রস্ত রাণী তাড়াতাড়ি একপাশে সরে গেলেন। রক্ষীরা এসে সন্ন্যাসীকে ঘিরে ধরল।

রাজা তো রেগে আগুন। সন্ন্যাসীকে শাস্তি না দিয়ে তিনি ছাড়বেন না। পাহারা দিয়ে সন্ন্যাসীকে নিয়ে যাওয়া হল প্রাসাদে। রাজা এ-সন্ন্যাসীর পরিচয় জানতেন না বটে, তবে সারা দশাশ্বমেধ ঘাটের লোকে তাঁকে চিনতেন। তিনিই বিখ্যাত মহাযোগী, মহাসাধক তৈলঙ্গ স্বামী। তাঁকে রাজা প্রাসাদে ধরে নিয়ে গেছেন সেপাই দিয়ে, পাহারা দিয়ে, এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের মধ্যে একটা আলোড়ন তৈরি হল। কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত রাজার কাছে গিয়ে স্বামীজীর পরিচয় দিলেন, তাঁর মাহাত্ম্যও বর্ণনা করলেন। সে কথা শুনে রাজা তাঁকে মুক্তি দেন। কিন্তু রাজার কয়েকজন অনুচর তাঁকে অপমান করেন। ফলে সেই রাতেই রাজা বাহাদুর, ভয়ানক এক দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করে উঠেন। স্বপ্ন দেখেন যে, জটাজুটধারী ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত এক পুরুষ—সক্রোধে ত্রিশূল নাড়ছেন আর রক্তচক্ষু করে রাজার দিকে তাকিয়ে বলছেন, এত বড় স্পর্ধা যে, তৈলঙ্গ স্বামীর পরিচয় পাবার পরও তোর অনুচরেরা তাঁকে অপমান করল? তুই এক্ষুনি কাশী থেকে দূর হ। রাজা স্বপ্ন দেখে এত ভয় পেলেন যে, আতঙ্কে ও উত্তেজনায় তাঁর সারারাত কেটে গেল। ভোরবেলায় তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটে তৈলঙ্গ স্বামীর পায়ে গিয়ে পড়লেন। বলা বাহুল্য স্বামীজী তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন।

এ-কাহিনীতে তেমন চমকপ্রদ অলৌকিকতা কিছু নেই। স্বপ্নটা তৈলঙ্গ স্বামীর অলৌকিক যোগিক বলে সফল হয়েছিল, না স্বয়ং মহাদেব এসে রাজাকে এই স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন বলা যায় না। তবে আধুনিক লোকেরা বলবেন ওটা বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কুসংস্কারাবদ্ধ মনেরই একটা বিকার মাত্র। তাঁরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা ফ্রয়েডীয় নীতির ভিত্তিতে করবেন। সুতরাং এ কাহিনী নয়,

আর একটি রাজার কাহিনীই এদিক থেকে বেশী অলৌকিক, চমকপ্রদ ও শিক্ষাপ্রদ। সে গল্পটি উজ্জয়িনীর মহারাজকে নিয়ে। গল্পটি এই ধরনের :

উজ্জয়িনীর মহারাজ এসেছেন কাশীতে। ব্যাসকাশী ও রামনগর দর্শন করে নৌকো করে এপার ফিরছেন—হঠাৎ দেখতে পেলেন গঙ্গার জলে বিশালদেহ এক সাধু ভেসে রয়েছেন। নৌকোর আরোহীদের মধ্যে অনেকে তৈলঙ্গ স্বামীকে চিনতেন। রাজার কাছে তাঁরা এই মহাসাধকের কথা বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল সেই সাধুটি তাঁদের দিকেই ভেসে আসছেন। নৌকোর কাছে এলে আরোহীরা তাঁকে সসম্মানে ধরাধরি করে নৌকোয় তুললেন। মহারাজ এবং তাঁর পার্শ্বচরেরা তৈলঙ্গ স্বামীকে প্রণাম করলেন।

সাধু কথা বলেন না। কিন্তু তাঁর দু'চোখে শিশুর মত কৌতূহল। উজ্জয়িনীর মহারাজের কোমরে ঝোলানো তরোয়ালের দিকে নজর পড়তে চোখ দুটো যেন তাঁর জ্বলজ্বল করে উঠল। তরোয়ালটি চেয়ে নিয়ে খানিকক্ষণ তিনি নেড়েচেড়ে দেখলেন, তারপর গঙ্গার জলে ফেলে দিলেন। সবাই তখন ভয়ে কাঠ হয়ে উঠেছেন—মহারাজ না জানি কি করে বসেন। কিন্তু স্বামীজী তখন অবুঝ শিশুর মত খল্‌খল্‌ করে হাসছেন।

তরোয়ালটি মহারাজ পেয়েছিলেন ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে তাঁর মর্যাদার স্বীকৃতি হিসেবে। সুতারাং সেজন্য মহারাজের কাছে এর মূল্যের সীমা ছিল না। তিনি সন্ন্যাসীকে শাস্তি দেবেন বলে শাসাতে লাগলেন।

নৌকার আরোহীদের মধ্যে যাঁরা তৈলঙ্গ স্বামীকে চিনতেন তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে রসিকতা করছেন। তাঁরা তাই তাঁকে অস্থির হতে বারণ করলেন। জানালেন, তরোয়াল ঠিক পাওয়া যাবে। ওদিকে নৌকো ঘাটের দিকে এগুতে লাগল। মহারাজের মন কিছুতেই সান্ত্বনা মানছে না। নৌকো ঘাটে ভিড়ল,

তবুও যখন তরোয়ালের কোন হদিশ পাওয়া গেল না—তখন মহারাজ ক্ষেপে গিয়ে বললেন—'নাঙ্গা সাধুকে ছাড়বে না। একে শাস্তি দেব।' রাজার মনের অবস্থা দেখে তৈলঙ্গ স্বামী মুচকি হেসে গঙ্গার জলে হাত ডুবিয়ে দিয়ে দুটো একই ধরনের তরোয়াল উঠিয়ে আনলেন। রাজার সামনে তরোয়াল দুটো ধরে বললেন, তোমার তরোয়াল চিনে নাও।'

হতবুদ্ধি রাজা যেন বোকা বনে গেলেন। হুবহু একই রকমের দুটো তরবারি। কোনটা তাঁর নিজের, আর কোন্‌টা নয়, চিনে নেওয়া দুঃসাধ্য। এবার স্বামীজী মুখ খুললেন, বললেন, 'মূর্খ—নিজের নিজের করছ, অথচ নিজের কোন্‌টি তাই চিনতে পারছ না। আসলে তোমার ভেতরটা পূর্ণ হয়ে আছে মোহ, দম্ভ আর অজ্ঞানতায়। শোন, নিজের বলে কিছু নেই। ইহকাল পরকালে যা মানুষের নিত্য সঙ্গী তাই শুধু নিজের। মৃত্যুর পর তরোয়াল তোমার সঙ্গে যাবে না। যে জিনিষ চিরকাল সঙ্গে রাখতে পারবে না তাকে নিজের বলে এত দম্ভ কেন?' এই ভাবে মহারাজকে তিরস্কার করে তাঁর যথার্থ সরকারী খেলাৎ পাওয়া তরোয়ালটি তাঁকে ফেরৎ দিলেন। বাকীটা জলে ফেলে দিলেন। মহারাজের এতক্ষণে হুঁশ হল। স্বামীজীর পায়ে ধরে বারবার ক্ষমা চাইতে লাগলেন।

ভদ্রলোক নিগমানন্দ সরস্বতীরও একটি অলৌকিক কাহিনী শুনিয়েছিলেন। তখন নিগমানন্দ পরিব্রাজক। ঘুরতে ঘুরতে এসেছেন কাশীতে। ভয়ানক ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে আছেন। সঙ্গে টাকাপয়সা কিছু নেই। তাছাড়া বারাণসী তাঁর কাছে অপরিচিত স্থান। কি করে যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করবেন তাই ভাবছেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল কাশীতে কেউ অভুক্ত থাকে না। কারণ কাশী হল অন্নপূর্ণার স্থান। তিনি ঠিক করলেন অন্ন সংস্থানের জন্য কোথাও চেষ্টা করবেন না। এখানেই ধ্যানে বসে থাকবেন। অন্নপূর্ণার কাশীতে সত্য সত্যই ক্ষুধার্তের জন্য অন্ন জুটে কিনা দেখা যাবে।

চোখ বুজে নিগমানন্দ ঘাটের ধারে বসে আছেন। আশেপাশে অগণিত নরনারীর ভিড়। স্নানার্থী, গৃহস্থ ভক্ত, সাধুসন্ত ও পরিব্রাজকদের যাতায়াতের বিরাম নেই। কিন্তু কেউ যে তাঁকে যেচে এসে অন্ন দিয়ে যাবে তেমন লক্ষণ দেখা গেল না। ক্রমে বেলা বেড়ে গেল। নিগমানন্দ ক্ষুধার তাডনা বেশী করে বোধ করলেন। এমন সময় দেখতে পেলেন এক স্নানার্থিনী তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন! স্নানার্থিনী দেখতে অত্যন্ত কুৎসিৎ। বার্ধক্যের ভারে দেহ ন্যুব্জ,—পরিধানের বস্ত্র মলিন ও ছিন্নভিন্ন। হাতে একটি বড় শালপাতার ঠোঙ্গা। নিগমানন্দের পাশে সেই ঠোঙ্গাটি নামিয়ে রেখে বৃদ্ধা বললেন, 'বাবা আমি চট্ করে স্নানটা সেরে আসি। ঠোঙ্গাটা তোমার কাছে রইল।' নিগমানন্দের উত্তরের অপেক্ষা না করেই বৃদ্ধাটি তর্ তর্ করে জলে নেমে গেলেন। নিগমানন্দ আবার ধ্যানে বসলেন। এবার ধ্যান বেশ গাঢ় হয়ে উঠল তাঁর। কখন বেলা গড়িয়ে রাত্রির অন্ধকার নেমে এল—সেদিকে তাঁর হুঁশ থাকল না। যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরল তখন দেখতে পেলেন যে, রাত অনেক হয়েছে। ক্ষুধার তাড়না আরও বেশী করে অনুভব করলেন। মনে মনে ভাবলেন, রাত তো অনেক হল, কৈ, তবু তো মা অন্নপূর্ণার কাশীতে কেউ তাঁর অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করল না? তাহলে কি অন্নপূর্ণা সম্পর্কে যে গল্পকথা আছে তা মিথ্যে!

তিনি এভাবে চিন্তা করছেন, হঠাৎ পাশে শালপাতার ঠোঙ্গার দিকে নজর পড়তে চমকে উঠলেন। সেই দুপুরবেলা এক বৃদ্ধা ঠোঙ্গাটি তাঁর কাছে রেখে স্নানে গিয়েছিলেন, আর তো ফিরে আসেন নি! হয়তো আর ফিরে আসবেন না। ভুলে চলে গেছেন। ততক্ষণে ক্ষুধা অসহ্য হয়ে উঠেছে। নিগমানন্দ ঠোঙ্গাটি খুললেন। খুলেই দেখলেন, একগাদা সুগন্ধি মিহিদানা ও সীতাভোগ রয়েছে তার মধ্যে। এ হল বাংলাদেশের বর্ধমানের বিখ্যাত খাবার। স্বামীজী আর সহ্য করতে পারলেন না। সেই সীতাভোগ ও মিহিদানা খেতে আরম্ভ করলেন।

অমন সুখাদ্য খাবার জীবনে তিনি কোনদিন খেয়েছেন বলে মনে পড়ল না। আশ্চর্য রকম ক্ষুন্নিবৃত্তি হল। শরীরে যেন অদ্ভুত এক প্রশান্তি আর শক্তিও অনুভব করলেন তিনি। ভোজন শেষে অঞ্জলিপূর্ণ করে গঙ্গাজল পান করে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

সেই রাতে একটি ভগ্নগৃহের বারান্দায় যখন স্বামী নিগমানন্দ ঘুমিয়ে ছিলেন—তখন স্বপ্ন দেখলেন যে, জননী অন্নপূর্ণা রূপের ছটায় দশদিক আলো করে তাঁর সামনে আবির্ভূতা হয়েছেন। মধুর কণ্ঠে তাঁকে ডেকে বলছেন 'বাবা, এবার তো তোমার বিশ্বাস হল যে, কাশীতে কেউ অভুক্ত থাকে না। খাবারগুলো আমিই তোমায় দিয়েছিলাম।' নিগমানন্দ বললেন 'মা তুমি তো আমাকে এগুলো দাওনি। এক বৃদ্ধা মানবী আমার কাছে খাবারগুলো রেখে গিয়েছিলেন।' হাসতে হাসতে মা বললেন 'বাবা, আমি ব্রাহ্মণ, সগুণে আমিই শক্তি। আমি যখন শক্তি তখন রূপ ধরতে বাধা কি?'

নিগমানন্দ বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীর শিষ্য, এসব যেন সহসা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তখন মা বললেন, 'বাবা তোমার সাধনা এখনো পূর্ণ হয়ে উঠেনি। তুমি এবার ভাবের সাধনা, প্রেমের সাধনার দিকে এগিয়ে যাও, লীলা-রহস্য আয়ত্ত করার চেষ্টা করো।' নিগমানন্দের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের অপূর্ণতার কথা বুঝতে পারলেন। বিশ্বজগৎ যখন অস্তিত্বে বিরাজমান তখন লীলারহস্য এখানে রয়েছেই। তিনি সেই লীলারহস্য খোঁজ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

আমার জ্যেঠাইমাও কাশীর মাহাত্ম্য নিয়ে দু' তিনটে ঘটনার কথা বলেছিলেন, যেমন, কাশীতে নাকি কখনও ভূমিকম্প হয় না। এখানে টিকটিকি কখনও ডাকে না, সাপও দেখা যায় না। এই সব কথা ও কাহিনী এবং বিশ্বাস এবং আমার ঐতিহ্যমণ্ডিত রক্তের ধারা, সব মিলিয়ে কাশী সম্পর্কে আমার ভিন্ন একটা ধারণা হয়েছিল। সেই জন্যই বোধহয় কাশীর কাছাকাছি আসতে সত্যেন দত্তের কবিতার

পংক্তি কয়টি মনে পড়েছিল আমার। কাশীতে ঢুকতে ঢুকতে সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে সব কিছু বিচার করে দেখছিলাম।

দুনিয়াতে যতটা আমাদের চোখের দেখা তার চেয়ে অনেক বেশী মনের দেখা। কোন সুন্দরী রমণী যদি যথার্থ সুন্দরীও হন, কিন্তু তাঁর জীবনের ইতিহাস যদি তার সম্পর্কে অশ্রদ্ধা জাগায়, তাহলে চর্মচক্ষুতে তাকালেও তাঁকে সুন্দর বলে ঠেকেনা। আবার অসুন্দরীও ভালবাসার পাত্রী হলে মনের কল্পনার দৌলতে অপূর্ব সুন্দরী হয়ে উঠেন। সুতরাং কাশীতে আমার সবকিছুই ভাল ঠেকতে লাগল। সত্যি সত্যি সর্বত্রই যেন একটা অতীন্দ্রিয়তার স্পর্শ অনুভব করতে পারলাম। আমাদের মালদহের বিষ্ণুদার তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে কাশী সম্পর্কে। পাণ্ডাদের পাল্লায় পড়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন তিনি। তিনি তাই আসবার আগে আমাদের বলে দিয়েছিলেন যে, কাশী হল ষণ্ডা, গুণ্ডা আর পাণ্ডার জায়গা। সাবধান। কিন্তু তাঁর সাবধানবাণী মনে থাকল না।

ঠিক করেছিলাম রামকৃষ্ণ মিশনে উঠব কাশীতে। তবে বন্ধুজনেরা বলে দিয়েছিলেন যে, রামকৃষ্ণ মিশন বড়লোকের জায়গা। সেখানে কোন ব্যবস্থা হবে না। কিন্তু তাঁদের কথা অগ্রাহ্য করে রামকৃষ্ণ মিশনের দিকেই যাব বলে ঠিক করলাম। কাশী ষ্টেশনে নেমে রিক্সায় চেপে মিশনেই নিয়ে যেতে বললাম তাকে। রিক্সাওয়ালা অবশ্য নবাগত যাত্রীদের অজ্ঞতার কথা জেনে যা ভাড়া তার দশগুণ ভাড়া নিয়ে, গোলি ঘুঁজিতে নানা জায়গা ঘুরিয়ে শেষপর্যন্ত রামকৃষ্ণ মিশনেই নিয়ে এল আমাদের। কিন্তু সত্যি সত্যিই রামকৃষ্ণ মিশনে তেমন সাড়া পেলুম না। স্বামীজীরা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গেই জানিয়ে দিলেন যে, ঠাঁই নেই। ফিরে আসছি, হঠাৎ কে বললেন, ঐ বুদ্ধু মহারাজ আসছেন। 'বুদ্ধু মহারাজ কে?' জিজ্ঞেস করতেই জানতে পারলাম যে, উনিই এই মিশনাধ্যক্ষ। হঠাৎ আমার কি মনে হল, ভাবলাম, স্বয়ং অধ্যক্ষকে একবার অনুরোধ করে দেখলে হয় না? আমি বুদ্ধু মহারাজের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আমার

মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখলেন খানিকক্ষণ। বললেন, কোথায় উঠেছ? জবাব দিলাম, কোথাও নয়। এখানে উঠব বলেই এসেছি। তিনি বললেন, কিন্তু এখানে তো জায়গা নেই। সঙ্গে কে আছে? বললাম, আমার বিধবা জ্যেঠাইমা এবং তীর্থপুণ্যপ্রয়াসী এক ভদ্রলোক। খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মহারাজ কি ভাবলেন, তারপর বললেন, মিশনে জায়গা নেই। তবে মিশনের উল্টোদিকে আমাদের একটা ভাড়া বাড়ি আছে। কয়েকজন মহিলা থাকেন সেখানে। সেখানে ইচ্ছে করলে থাকতে পার। দৈনিক ভাড়া এক টাকা। খেতে আসতে হবে এই মিশনে। মাছ মাংস নেই। মিল প্রতি এক টাকা।

ভূ-ভারতে এত সস্তায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা কল্পনার বাইরে। বিনয়ে ভেঙে পড়ে মহারাজের পায়ে হাত দিয়ে আবার নমস্কার করলাম। আমার মনে হল এটাও দৈব আনুকূল্য। নিগমানন্দকে অন্নপূর্ণার অন্নদানের মতই আমাদেরও আশ্রয় দান। জ্যেঠাইমার সঙ্গে আসা সেই ভদ্রলোক বললেন—'অন্নপূর্ণা যথার্থই অন্নদাত্রী ও আশ্রয়দাত্রী দুই-ই!'

আশ্রয় পেয়ে গেলাম। তীর্থস্থানে পরমার্থের সন্ধান করতে এসে যে-ধরনের আশ্রয় পাওয়া দরকার তাই পেলাম। কয়েকজন নিরাশ্রয়া বয়স্কা বিধবা মহিলা সেখানে থাকেন। পুণ্যতীর্থকামী সম্পর্কে তাঁদের কাছ থেকে অনেক খবরই পেলাম। তাঁদের নির্দেশেই এর পর থেকে কাশী ঘুরতে লাগলাম।

রামকৃষ্ণ মিশন থেকে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট খুব দূরে নয়। সেখানে যাবার জন্য অবশ্য কারো নির্দেশেরই কোন প্রয়োজন নেই। পাণ্ডার উৎপাত সঙ্গে নিয়ে, কিছু গচ্চা দিয়ে প্রথমেই দর্শন করলাম বিশ্বনাথকে এবং তাঁর অনুসঙ্গী আরো অনেক দেবতা, এবং নানা রূপে স্বয়ং তাঁকেই। বিশ্বনাথ দর্শন করে গেলাম অন্নপূর্ণার মন্দিরে। ঐশ্বর্য আছে বটে, তবে পার্থিব অর্থে যে জাঁকজমক, বিশ্বনাথ বা

অন্নপূর্ণার মন্দিরে তা নেই। একটা অধ্যাত্ম বিশালতা আছে, অন্ততঃ আমার কাছে। পাণ্ডার প্রতারণা ও উৎপাত সত্ত্বেও, আমার ভালই লাগল।

কাশীতে আসাতক কিন্তু মনের মধ্যে বংশ-পরম্পরায় সঞ্চিত অলৌকিক শক্তিধর সাধুসন্তের সাক্ষাতের আশা ঘুরপাক খাচ্ছিল। যেভাবে ছোটবেলা থেকেই কাশীর মাহাত্ম্য শুনে আসছি, তাতে আমার ধারণা ছিল যে, কাশীর অলিতে-গলিতে সর্বত্র মহাশক্তিধর সাধকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ভেবেছিলাম, মন্দিরের মধ্যে উজ্জ্বল কান্তি দেবদ্যুতিতনু বহু সাধকের সাক্ষাৎ পাব। কিন্তু কিছু সংখ্যক ধর্মের ধ্বজাধারী অধার্মিক পাণ্ডা ছাড়া আর কিছুই দেখলাম না। জ্যেঠাইমার তীর্থপ্রদর্শক সেই ভদ্রলোককে এ-কথা জানাতে তিনি বললেন, 'সাধুসন্তরা মন্দিরের ভেতর থাকেন না। তাঁদের দেখতে হলে গঙ্গার ঘাটে যেতে হবে।'

মন্দিরের কাছেই দশাশ্বমেধ ঘাট। মন্দিরে বিশ্বনাথ দর্শনের পর সবাই সেখানে একবার যাবেই, আমরাও গেলাম। আমি ভাবতে লাগলাম পথে অগণিত সাধুসন্তের ভিড় দেখব। কিন্তু আশ্চর্য! রাস্তার ছ'ধারে অসংখ্য ভিখারী ছাড়া আর কিছুই দেখলাম না।

তখন সন্ধ্যা। ঘাটের ধারে ইতস্ততঃ প্রদীপ জ্বলছে। বাঁধানো গঙ্গার পার। ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঁচু পার থেকে নিচে নেমে গেছে। নেমে গেছে জলের নিচে। হাজার হাজার পুণ্যার্থী নিত্য সেখানে স্নান করেন।

গোল তালপাতার বা কাঠের ছাতা দাঁড়িয়ে আছে ঘাটের এদিক ওদিক ইতস্ততঃ নানা জায়গায়। রঙিন হ'লে এক একটিকে ডালিয়া ফুল বলে ভাবলেও ভুল হত না। ছাতাগুলো দিনের বেলা সূর্যের নিচে কর্মকাণ্ডে রত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বসবার জন্য হয়তো। ব্রাহ্মণেরা ওর নিচে বসে পুজো করেন, বেদপাঠ করেন। ছ'একটা ছাতার নিচে তখনও কিছু ব্রাহ্মণ ছিলেন। রামায়ণ মহাভারত বেদ যে যার মত পাঠ করছিলেন বোধহয়। কিছু পুণ্যার্থী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন।

পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন। এ-সব দৃশ্যের মধ্যে অধ্যাত্মতার একটা স্পর্শ থাকলেও আমি যা খুঁজছি, তা যে এখানে পাওয়া যাবে না সে বুঝতে আমার বিলম্ব হয়নি। অনেকেই ধর্মের নামে ভাঁড়ামি করছে। কেউ ফুল-বেলপাতা বিক্রী করছে। পুণ্যার্থীকে প্রতারণা করার যত পথ সবই আছে সেখানে। সে দৃশ্য আমার মন টানল না। আমি খুঁজতে লাগলাম একজন তৈলঙ্গ স্বামীকে, তেজপুঞ্জকায় অলৌকিক শক্তিধর সাধককে। কিন্তু সেরকম কোন কিছু নজরে পড়ল না। দু-একজন গেরুয়া পরা শ্মশ্রুগুম্ফ বিজড়িত সাধু দেখলাম বটে কিন্তু তাঁদের মুখ যেন ঝরে পড়ার আগে ফুলের মত। সুতরাং কিছুটা হতাশ হলাম তবে সাধকের অভাবে হতাশ হলাম বটে, দৃশ্যের অভাবে নয়। দৃশ্য বলতে যে নয়ন মুগ্ধকর দৃশ্য, তার কথা বলছি না। কাশীর ঘাটের দৃশ্য শ্রীনগর উপত্যকার দৃশ্য নয়। এ-দৃশ্য দেখলে মোগলাই বিলাসের উদ্রেক হবে না। তপোবনের ভারতবর্ষ অন্তরাত্মার মধ্যে অনুরণিত হয়ে উঠবে।

জ্যাঠাইমার পুণ্যসঙ্গী সেই ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, 'কৈ সাধুসন্ত কৈ?'

তিনিও দেখলাম কেমন একটু হতাশ। বললেন, তাইতো দেখছি যেমন শুনেছিলাম তেমন দেখছি না।

আমাদের কথা শুনে অযাচিতভাবেই পাশ থেকে একজন বললেন —এখানে লোকের উৎপাতে এখন সাধুসন্ত কেউ থাকে না।

বললাম, কোথায় গেলেন তারা?

—শুনেছি সব হিমালয়ে গেছেন। যাঁরা এখন কেদারবদ্রী যান গঙ্গোত্রী যমুনেত্রী যান, তাঁরা মাঝে মাঝে দু'একজন শক্তিধর সাধকে দেখা পান।

—তাহলে কাশীতে কোন সাধুসন্তের সাক্ষাৎ পাওয়ার আশা নেই

লোকটি বললেন, ওপারে ব্যাসকাশীতে একজন বড় সাধক আছে বলে আমাকে বলছিলেন একজন। কিন্তু আমি যাইনি।

—কেন ?

অন্নপূর্ণার অভিশাপে ব্যাসকাশীতে তো কোন পুণ্য হবার নয়। পুণ্যাত্মা কোন সাধুসন্ত তাই সেখানে থাকবেন আমার মনে হয় না।

কথাটা শুনে আমার ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের কয়েকটি লাইন মনে পড়ে গেল, যেমন :

'মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডানকরে ভাঙা লড়ি বামকক্ষে ঝুড়ি॥
ঝাঁকর মাকড় চুল নাহি আদি সাঁদি।
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়া কাঁদি॥

এই বেশেই ব্যাসকে অন্নপূর্ণা ছলনা করেছিলেন। এ বেশ হল জরতী বেশ। অন্নদামঙ্গলের সেই দৃশ্যটি মনে পড়তেই ভদ্রলোকের মত আমারও বিশ্বাস হল যে ব্যাস-কাশীতে কোন মহাত্মা সন্ন্যাসী নেই। তৈলঙ্গস্বামী বা নিগমানন্দ স্বামীকে পাওয়া গেলে কাশীর ঘাটেই পাওয়া যাবে, নইলে নয়।

রাত আটটা নাগাদ মিশনের সেই অনাথ-আশ্রমে ঢুকতেই আশ্রিতা মহিলারা বললেন, 'কি গো বাবা বিশ্বনাথ দর্শন হল ?'

বললুম, হল মাসিমা। কিন্তু কোন সাধুসন্তের দর্শন পেলুম না। ঘাটের সেই ভদ্রলোকের মত মিশনের আশ্রিতা মহিলারাও বললেন, এখন আর এখানে কোন সাধু থাকে না।

—কেন ?

ওঁরা বললেন, লোকে এত বিরক্ত করলে কি করে থাকবে বাবা।

আমি বললুম, আগে তো তৈলঙ্গস্বামী থাকতেন !

ওঁরা বললেন, তখন এত ভিড়-ভাট্টা ছিল না। আর তাছাড়া যাঁরা তীর্থ করতে আসতেন, তাঁরা নিজেরাও ধার্মিক ছিলেন। এখন তো সবাই ধার্মিক নয় বাবা। অনাচার হচ্ছে যথেষ্ট।

কথাটা হয়তো ঠিক। সেই জন্যই হয়তো এখন কোন সাধুসন্ত

নেই। নিতান্তই হতাশ হয়ে পড়লাম। যখন হতাশ হয়ে পড়ছিলাম সেই মুহূর্তে একজন মহিলা এসে বললেন, তবে শুনেছি, সঙ্কট মোচনের মন্দিরে মাঝে মধ্যে বড় বড় সাধু আসেন। সেখানে একবার গিয়ে দেখতে পার।

তাঁর কথা মত দুর্গাবাড়ি, মানসমন্দির, সঙ্কটমোচন, বিড়লা মন্দির, বেনারস হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় সব ঘুরলাম কিন্তু সাধু কোথাও নজরে পড়ল না। সবাইকে দেখলাম শুধু চাই চাই করে দেবতার মন্দিরের সামনে হত্যা দিচ্ছে। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী চাইবেন কেন? ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী স্বয়ং ভগবান, তিনি দেবেন। ঋষি বাকের মত আত্মদর্শন হলে বলে উঠতো, আমিই সেই। আত্মদর্শন হলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস কালীর পায়ে ফুল না দিয়ে নিজের পায়ে দেন। সুতরাং প্রায় এই সিদ্ধান্তই নিয়ে ফেললাম যে কাশীতে বর্তমানে কোন সাধুসন্ত নেই।

কাশীতে সাধু নেই এই কথাটা মিশনে তীর্থপুণ্যপ্রয়াসী এক আগন্তুক ভদ্রলোককে বলতে তিনি মৃদু হেসে বললেন, তাই নাকি!

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, কিন্তু একজন সাধু আছেন. আমি তার দেখা পেয়েছি?

—কোথায়? আমার হৃদপিণ্ডের ভেতর থেকে যেন চিৎকারের শব্দের মত একটা আওয়াজ বেরুলো।

আগন্তুকটি বললেন, মণিকর্ণিকার ঘাটে!

—কি নাম সে সাধুর?

হেসে আগন্তুকটি বললেন, প্রকৃত যিনি সাধু, তিনি নাম ত্যাগ করেন, নাম ধরে কোন কিছুর উপাসনাও করেন না।

বললাম. তবুও একটা না একটা পরিচিতি তো থাকে!

—কি রকম?

—যেমন, হরিদ্বারের বাঙ্গালী বাবা।

হাসতে হাসতে আগন্তুকটি বললেন, না, তেমনও কিছু শুনি নি।

তবে অস্ফুট শব্দে কার মুখে যেন একবার এই শব্দটি শুনেছিলাম— মণিকর্ণি বাবা।

জিজ্ঞাসা করলাম' সে আবার কি?

আগন্তুকটি বললেন, আমিও এর অর্থ জানি নে। সম্ভবতঃ মণিকর্ণিকার ঘাটে বসেন বলেই লোকে এমন নাম দিয়ে থাকবে। তবে এ নামও যে বহুল প্রচারিত তা মনে হয় না। মণিকর্ণি বাবা বলে কাশীতে কোন সাধুর নাম আগে শুনিনি।

জিজ্ঞাসা করলাম, সাধু যে বুঝলেন কি করে?

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, মিষ্টি যে মিষ্টি, আপনাকে কেউ বোঝাতে পারবে? তুলনামূলক হাজারো বর্ণনা দিতে পারবে। কিন্তু মিষ্টির মিষ্টত্ব বোঝাতে পারবে না। মিষ্টি না খেলে মিষ্টি চেনা যায় না। আমার কাছে না শুনে আপনি নিজেই একবার যান না।

বুঝতে পারলাম, আগন্তুক ভদ্রলোকটিও ঠিক সাধারণ পুণ্যার্থী বলতে যা বোঝায় তা নয়। তিনি কাশীতে বাইরেটা কুড়াতে আসেননি, ভেতরটা বুঝে নিতে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কোন বাদানুবাদ করলাম না। বাদানুবাদ তো আমারও উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য রসগোল্লার স্বাদ বোঝা। বর্ণনা হাজার শুনলেও রসগোল্লাকে চেনা যাবে না। রসগোল্লা চিনতে হলে তাকে খেতে হবে। অবশ্য চর্মচক্ষু দিয়ে নয়, মনের চক্ষু দিয়ে। রত্ন যদি চিনতে হয়, নিজেকেও তো জহুরী হতে হবে। তবে আমি পাকা জহুরী না হলেও রত্ন কিছু কিছু চিনতে পারি।

পরদিন ভোরবেলা কাউকে না জানিয়ে একা একাই রওনা হলাম মণিকর্ণিকা ঘাটের দিকে। কিন্তু ঘাট দেখে অবাক। মণিকর্ণিকার ঘাট সম্পর্কে এ-ধরনের কোন ধারণা ছিল না আমার। সাত সকালেই দেখি পাঁচ সাতটা চিতা জ্বলছে একবারে। পরে শুনেছি রাবণের চুল্লি এই মণিকর্ণিকার ঘাটে। দিনে রাতে কখনও চিতা নেভে না। না নেভার কারণও আছে। মণিকর্ণিকার ঘাটে যে শুধুমাত্র কাশী থেকেই

মৃতদেহ দাহের জন্য আসে তাই নয় আশেপাশের বিরাট এক পশ্চাৎ-ভূমি থেকে অধিকাংশ মৃতদেহই এখানে আসে। এ-আসার কারণ একটা লৌকিক বিশ্বাস। লোকের ধারণা মণিকর্ণিকার ঘাটে দেহ ভস্মীভূত হলে চিরকালের জন্য বন্ধন থেকে মুক্তি। তাই মৃতের ইচ্ছানুসারে ও তাঁর আত্মীয়স্বজনদের কল্যাণে আশেপাশের সব মৃতদেহই এখানে আসে। তাই মণিকর্ণিকার চিতা কখনও নেভবার অবসর পায় না।

কাশীর ইতিহাস ভাল করে সেদিনও জানিনি, আজও জানি না। তখন আমার মনে হয়েছিল যে, রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্য হারিয়ে কাশীর এই মণিকর্ণিকার ঘাটে এসেই বুঝি আশ্রয় নিয়েছিলেন। রোহিতাশ্বের সেই মৃতদেহ-সংকারের দৃশ্য স্মরণ করে মনে মনে কুমুদরঞ্জনের সেই কবিতার কয়টি লাইনও বোধহয় আওড়েছিলাম :

'বুঝি সেদিনও অমনি ধাঁধায় বিজলি দু'নয়ন
আঁধার নিশার আঁধার বাড়ায়ে অনুখন।
বারাণসী ধামে গঙ্গার তীরে
ধূলি লুণ্ঠিতা শৈব্যার ক্রোড়ে—
চণ্ডাল বেশী নৃপতি নেহারে
মৃত পুত্রের সে বদন।

পরে আমি জেনেছি যে, হরিশ্চন্দ্র মণিকর্ণিকার ঘাটে নয় কেদার ঘাটে ডোম হয়েছিলেন। শৈব্যা সেই কেদার ঘাটেই গিয়েছিলেন। সে-যাই হোক, প্রশ্ন সেটা নয়, প্রশ্ন এই চিতা। এমন অনির্বাণ চিতা সত্যিই বিস্ময়কর।

অবাক হয়ে দেখছিলাম পাঁচ সাতটি মড়া পুড়ছে। নির্বিকার ডোমেরা একদা সযত্ন বিন্যস্ত দেহের প্রতি বিন্দুমাত্র মায়া না করে পিটিয়ে পিটিয়ে মাথা ভাঙছে, হাত পা গুটিয়ে দিচ্ছে ইত্যাদি। ভাবছিলাম নির্মম সত্যের সম্মুখীন হয়ে এইসব মানুষ কি জীবন রহস্যটা

ভেদ করতে পেরেছে। বুঝতে পেরেছে কি যে, দৈহিক এই 'আমিত্ব'টা সত্য নয়। এটা চিরস্থায়ী নয়। এবং সে জন্য নিরাসক্ত হওয়ার যে সাধনা, তা তারা করেছে কি? অভিজ্ঞতা অবশ্য আশ্চর্য কথা বলে। প্রদীপের নিচেও অন্ধকার থাকে। নির্মম সত্য নিয়ে রোজ যারা চলা-ফেরা করছে সেই ডোমেরা পানাসক্ত, নারী আসক্ত, কোন্ আসক্তিতে আবদ্ধ নয়।

শ্মশান দর্শন আমার জীবনে খুব কমই হয়েছে। তবে যে-কোন মৃতদেহকে 'হরিবোল' ধ্বনি তুলে নিয়ে যেতে দেখলেই আমার মনের উপর কেমন একটা অদ্ভুত বৈরাগ্য ভর করে। মুহূর্তের জন্য জীবনের একটা নতুন অর্থ খুলে যায় আমার কাছে। কিন্তু আশ্চর্য! সেটা বেশীক্ষণ থাকে না। আবার নিজের চিন্তা, নিজের কল্পনাবিলাসে ভেসে বেড়াই। কল্পনা দিয়ে যে স্বপ্নজগৎ তৈরি করি তাকেই পাবার জন্য প্রাণান্ত করি।

শ্মশানে শবদাহ দেখছিলাম আর এই সব ভাবছিলাম। মুহূর্তের জন্য ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমি এখানে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম—সাধু দর্শনের জন্য। হয়তো সে-কথা মনে করতেই পারতাম না—যদি না এক অদ্ভুত দর্শন ব্যক্তির চোখদুটি আমার উপর পড়ত। সেই লেলিহানশিখা চিতার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক অদ্ভুত দর্শন ব্যক্তি। প্রায় উলঙ্গ বললেই চলে। পরনে খুব ক্ষীণ একটা লেংটী। গায়ে কিছু নেই। মাজায় শুধু একটা গাঁজার কল্কে আছে। অবিন্যস্ত চুল ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হয়ে কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে। কতকাল যেন ধূলায় ধূসরিত হয়ে আছে। কাঁচাপাকা একমুখ দাড়ি গোঁফ। কলকাতার রাস্তায় এধরনের বহু লোক দেখা যায়। ডাষ্টবিন থেকে এই ধরনের লোক খাবার কুড়িয়ে খায়। পাগল বলেই আমার ধারণা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর চোখদুটোই আমাকে কেমন আটকে দিল। মধ্যাহ্ন-সূর্যের দিকে তাকালে তার মধ্যে জ্বলজ্বলে যেমন একটা ভাব দেখা যায় যেন ঠিক তেমনি। আমার কাছে অনেকটা লকলকে

ইস্পাতের মত। সে চোখ দুটি যেন চাবুকের মত এসে গায়ে পড়ে, এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

আমার চোখে চোখ ফেলে হে হে করে হাসলেন লোকটি। এমন করে হাসলেন যেন আমাকে কতদিন চেনেন। তাই আর একটু ভাল করে দেখে আমি রীতিমত চমকে উঠলাম। বাঁ হাতে একটা অর্ধদগ্ধ শবের পা রয়েছে। সেই দগ্ধ পাটা তুলে তিনি মাংসল অংশে আবার কামড়ে ধরলেন। ভয়াবহ দৃশ্য সন্দেহ নেই। মনে হল চিৎকার করে উঠি। আমার অন্তরাত্মা একটা ধৃত পাখির মত থর থর করে কাঁপতে লাগল। আশ্চর্য! তিনি আমার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগলেন। দাঁতের ফাঁকে তখনও কিছুটা দগ্ধ মাংস লেগে রয়েছে। সেই দাঁত দিয়ে হাসতে হাসতে আমার কাছে এসে বললেন, 'কি রে, গা শির্ শির্ করছে, এ্যাঁ!'

গা শির্ শির্ করছিল, কাঁপছিল, সবই। অজ্ঞাতেই বোধহয় পকেট থেকে রুমালটা বের করে নাকে দিতে যাচ্ছিলাম—একটা দুর্গন্ধ পাব এই আশঙ্কা করে। কিন্তু কি আশ্চর্য! কোন দুর্গন্ধ দূরের কথা, একটা মিষ্টি ফুলের বন থেকে যেমন মন মাতানো গন্ধ আসে—ঠিক যেন সেইরকম গন্ধ পেলাম! আমি কেমন যেন দিশেহারা বোধ করতে লাগলাম নিজেকে।

তিনি এগিয়ে এসে প্রায় আমার গায়ে গা লাগিয়ে সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, মদ খাস?

মন্ত্রমুগ্ধের মত বললুম, হ্যাঁ।

—মাংস খাস?

—হ্যাঁ।

—মাছ, পাঁঠা আর মানুষ এ তিনের মধ্যে কে বড় বলত?

বললুম, মানুষ।

—তাহলে মানুষের মাংসকে এত ঘৃণা কেন? এ্যাঁ! এই যে তুই যার জন্যে পাগল—ধর্ যদি এটা তারই মাংস হত?

আমি চমকে উঠলাম। আমি যার জন্যে পাগল—একথার মানে ? তাহলে কি ?… । সত্যি কথা বলতে দ্বিধা করে লাভ নেই। আমি বিরাট সাধুসন্ত কেউ নই। অধ্যাত্ম জগৎ সম্পর্কে আমার একটা অনুসন্ধিৎসা আছে, এই মাত্র। এবং যে-কোন অজ্ঞাত কারণেই হোক না কেন অধ্যাত্ম রহস্য আমার কাছে খুব একটা জটীল বলে মনে হয় না। আমি যেন অতি সহজেই বুঝতে পারি। কখনও কখনও নির্জনে যদি আত্মরহস্য নিয়ে চিন্তা করি, বিশ্বরহস্য নিয়ে চিন্তা করি সত্য যেন তখন নগ্ন হয়ে দেখা দেয়। আমার মনের মধ্যেই যেন তখন আমি অদ্ভুত এক সত্যের স্পর্শ পাই। কত নির্জন মুহূর্তে সেই সত্যের স্পর্শ লাভ করে আমি একা একাই চিৎকার করে উঠেছি—আমি, আমি, আমি। আমাদের অধ্যাত্ম পুরুষেরা যেমন সত্যের কিনারা লাভ করে বলে উঠেছিলেন 'সোঽহং' সেইরকম আর কি। কিন্তু এ-বোধ আমার বেশীক্ষণ থাকে না। আবার ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর মায়ায়ই আমাকে বেঁধে ফেলে। ইহলোক, ইহজগৎ, এবং আমার সঙ্কীর্ণ প্রাপ্তির গণ্ডির মধ্যে পড়ে আমি আবার হাবুডুবু খাই।

দুর্বলতা খুব বেশী একটা নেই আমার এ সংসারে। নামযশের জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা নেই। অর্থের জন্যও নেই। কিন্তু একটা দুর্বলতা আমার আছে। ভালবাসা। আমি ভালবাসতে চাই—ভালবাসা পেতে চাই। কিন্তু ভালবাসলে আমি বলতে পারি না এই আমার দুর্বলতা। যাকে ভালবাসি তার হৃদয়ে কোন অনুরণন জেগেছে কিনা তাই জানবার জন্য অপেক্ষা করি। আমার তখন বয়স অল্প। সবে পাশ করে কলেজে ঢুকেছি। বলতে দ্বিধা নেই আমি একজনকে ভালবাসতাম। কিন্তু মুখ ফুটে কখনও বলতে পারি নি। যতই বলতে পারি নি ততই মনের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা যেন সমুদ্র মন্থন করে আমাকে উত্তজিত করেছে। ততই ভালবাসার পাত্রী আমার কাছে আরও বেশী সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছে। বুঝতে পারলাম এই অদ্ভুত দর্শন ও অদ্ভুত-ব্যবহার লোকটি আমার সেই আকাঙ্ক্ষিত প্রণয়িনীর কথাই বলছেন।

সে-কথা শুনে আমার বাক্যস্ফুরণ হল না। এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হল কলকাতার রাস্তায় ডাষ্টবিনে ভুক্তাবশেষ খুঁজে বেড়ানো ভবঘুরে পাগল এ নয়। এঁর মধ্যে গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে। আমি যেন তাঁর অদ্ভুত শক্তির প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, জলজ্যান্ত মাংসপিণ্ডই লোভের? মরে গেলে লোভ থাকবে না কেন রে, এ্যাঁ?

আমি যেমন মৌনী ছিলাম তেমনই মৌনী থাকলাম।

শবের দগ্ধ দেহাংশ জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি আবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন—কি রে, সাধু দেখতে পেয়েছিস?

আমার মনের কথাটা উনি জানেন বুঝতে পারলাম।

—সাধু দেখলে চিনতে পারিস? তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

এইবার প্রথম কথা বললাম, হ্যাঁ।

—আমি সাধু কিনা বল তো?

—হ্যাঁ।

—কি করে বুঝলি?

—চোখ দেখে।

—আমার চোখে কি আছে যে আমাকে সাধু ঠাঁওরালি?

—সূর্য।

—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ অট্টহাসিতে যেন ভেঙে পড়লেন তিনি।

তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের পিঠটা আমাকে দেখিয়ে বললেন, কিছু লেখা আছে?

বললাম, না।

—পিঠে কিছু লেখা না থাকলে সাধু হয় রে, এ্যাঁ।

বুঝলাম নকল সাধুদের কথা বলছেন তিনি—যাঁরা বিজ্ঞাপনের দৌলতে সাধু। বললাম, পিঠে যাঁদের লেখা থাকে তাঁরা সাধু নন।

তিনি হেসে বললেন, অন্ততঃ একটা নাম তো চাই রে।

বললাম, হ্যাঁ, নামতো আপনার আছে।

—নাম! কি নাম? হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি।

বললাম, আপনিই মণিকর্ণি বাবা।

মণিকর্ণিবাবা! হো হো হো হো হো হো, যেন ধূলায় গড়িয়ে পড়লেন তিনি।

আমি বলমাম, হ্যাঁ, আপনিই মণিকর্ণি বাবা। মিশনে আপনার কথা শুনে আপনার দেখা পাবার জন্যেই এখানে এসেছি আমি।

বললেন, কেনরে! হঠাৎ এত সাধুসন্তের ঝোঁক কেনরে চোট্টা! ভেবেছিস—সাধুকে ঘুষ দিয়ে নিজের নোংরা ইচ্ছেগুলি পূরণ করবি!

এমন নির্মম কথা শুনে আমার মুখে যেন ভাষা হারিয়ে গেল।

তিনি আবার হাসতে হাসতে বললেন,—কিরে ঠিক বলিনি?

আমি চুপ করে থাকলাম।

তিনি বললেন, যাকে ভালবাসিস, তাকে পাবি কিনা এই জানতে চাস তো?

আমাব বুকের ভিতর একটা প্রচণ্ড অজগর যেন মোচড় দিয়ে উঠল। হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, এই হল নির্মম সত্য। সেই মুহূর্তে যাকে ভালবাসি তাকে পাওয়ার চাইতে আর কোন বড় বাসনা আমার ছিল না। মুখে ভালমানুষ, নীতিবাগীশ হবার যা-ই চেষ্টা করি না কেন, যতই মুখোস আটি না কেন, নির্মম সত্য তখন আমার কাছে শুধু ওই একটিই। বুকটা আমার ধুক্ ধুক্ করতে লাগল! ঐ একটি প্রশ্নের জবাব জানার জন্য আমি কী না করতে পারি! আমি আকাঙ্ক্ষা কম্পিত বুকে মণিকর্ণি বাবার মুখের দিকে তাকালাম। তিনি নিষ্ঠুর ব্যাঙ্গের ভঙ্গীতে যেন খানিকক্ষণ আমাকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর হে হে করে খানিকটা হাসলেন, মনের মধ্যে মন আছে জানিস?

—না।

—স্বপ্ন দেখিস?

—হ্যাঁ।

—কে স্বপ্ন দেখে বল তো? তুই যখন ঘুমিয়ে পড়িস তোকে কে স্বপ্ন দেখায় বল তো?

বললাম, এমন করে তো কখনও চিন্তা করিনি।

—তোর জাগ্রত মনের বাইরে আরও মন আছে বুঝলি?

ফ্রয়েডের মনের স্তর বিশ্লেষণের কথা মনে পড়ে গেল আমার। চেতন অবচেতন ও অচেতন মনের কথা বলছেন তিনি। মনে পড়ে গেল যে, একজন শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে আলোচনাতে মনের আঠারটি স্তরের কথাও বলেছিলেন। সে-কথা মনে পড়তে বললাম, হ্যাঁ-হ্যাঁ শুনেছি।

তিনি বললেন, তিনটে নয়, আঠারটা নয়, কতো যে স্তর আছে কে হিসেব দেবে বল্। সবার শেষের স্তর হল তূরীয়াতীত। সেটাই হল আসল মন। প্রত্যেকের মধ্যেই সেই স্তর আছে। স্তরে স্তরে ভেতরে ঢুকলে তবে তার সন্ধান পাওয়া যায়। সেই স্তরে গেলে তখন তোর মন আর আমার মন বলতে কিছু থাকে না। সব তখন এক হয়ে যায়। জানিস, সেই মনই সবকিছু করে। সেই মনের ইচ্ছেতেই সব কিছু হয়। মানুষ বাইরে যা-কিছু করে, নকল মনের ইচ্ছায় নকল কাজ করে। নকল মনের ইচ্ছায় কাঁদে, নকল মনের ইচ্ছায় হাসে। যখন যথার্থই হাসা উচিত, তখন কাঁদে, যখন কাঁদা উচিত তখন হাসে। বুঝলি, এই যে আঁকুপাঁকু করছিস সে-তোর নকল মনের জন্য। আসল মনের খবর পেলে এ-সবের জন্য কোন উচাটন ভাব থাকত না।

অনেক বড় গভীর কথা হয়তো, কিন্তু তা বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। হয়তো এই আসল মনকেই বাউল কবিরা বলেছেন, 'মানুষ রতন' যাকে নিয়ে গান লিখেছেন 'এই মানুষে আছে রে মন, যারে কয় মানুষ রতন।' মানুষ রতনের কি ইচ্ছা তা সত্যিই আমি জানি না। তাই অধীর আগ্রহে পরম আকাঙ্ক্ষিত একটি প্রশ্নের জবাব পাবার জন্য মণিকর্ণি বাবার দিকে তাকালাম।

তিনি বললেন, পাবি না, বুঝলি, কোনদিনই পাবি না।

আমার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল।

তিনি বললেন, বহুবার বহুজনকেই ভালবাসবি, কিন্তু কাউকে পাবি না জানিস।

আমি বোধহয় পাংশু ও বিবর্ণ হয়েছিলাম। কোন জবাব দিইনি, কোন প্রশ্ন আর করিনি।

মণিকর্ণি বাবা বলেছিলেন, তোর আসল মনের ঐটেই ইচ্ছে বুঝলি। না পাওয়ার মধ্য দিয়ে পাওয়ার অতীতকে পাবার চেষ্টা। অদ্ভুত আলোছায়ার খেলা রে তোর মধ্যে, অদ্ভুত আলোছায়ার খেলা। কত আশা, কত নিরাশা. কত কান্না, তবে হাসি কম। সুন্দরী প্রণয়িনী, অর্থ, নাম যশ, কোন কিছুই পাবিনে। না পেতে পেতে একদিন কিছু আর চাইবিনে জানিস। তখন দুঃখেও আর তোর কান্না পাবে না, আনন্দেও মুখে হাসি ফুটবে না। চমৎকার! চমৎকার! কি আশ্চর্য লীলা!

আমি মনের মধ্যে মুহূর্তের মধ্যে গীতার সেই অংশটি মনে করলাম, বীতরাগ ভয়ক্রোধ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার লাইনটিও মনে পড়ল 'যখন ছেড়েছি উচ্চে উঠার দুরাশা হাতের নাগালে পেয়েছি সবারে নিচুতে।'

জানি না, কত হতাশা, কত দুঃখের মধ্য দিয়ে আমি গেছি! তবে একথা ঠিক, জীবনে পাইনি কিছুই। একদিন আকাঙ্ক্ষা ছিল, সে আকাঙ্ক্ষাকে কে যেন দীর্ঘদিন ধরে থেঁত্‌লে থেঁত্‌লে পিষে পিষে মেরে দিয়েছে। বিচিত্র ঘটনা জীবনে ঘটেছে—যা ছিল কল্পনার অতীত। চেষ্টা কোন ফল দেয়নি, অদ্ভুতভাবে ফলনাশ করেছে। পরম কোন অধ্যাত্ম সত্য আমার অনুভবের মধ্যে আজও উদয় হয়নি। তবে এইটুকু বুঝেছি 'আমার ইচ্ছাই ইচ্ছা নয়। আমার ইচ্ছামত কোন কাজ হয় না। আর একটি ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করে। সে ইচ্ছা তুরীয়াতীত স্তরের কোন্ গভীরতম মনের ইচ্ছা আমি জানি না। সে

মনের সন্ধান করবার সৌভাগ্য আমার আজও হয়নি। আমি স্থিতধীও হইনি। তবে নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে শিখেছি। দেহের চেতনাবদ্ধ 'আমি' একটা অসহায় দর্শকমাত্র দেহের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা একটি পরম 'আমি'র কাছে। দেহের 'আমি' আমার সঙ্গেই চলেছে, মনের আমির খবর আমি জানিনে।

মণিকর্ণি বাবা হঠাৎ প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে নিলেন। বললেন, বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করেছিস ?

বললুম, হ্যাঁ।

—কে এই বিশ্বনাথ বল তো ?

বললাম, মহাদেব।

হাসতে হাসতে উনি বললেন, ওটা কি একটা জবাব হল।

—তাহলে ?

তিনি বললেন, শিব আছে তিন রকম।

—কি রকম ? আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

তিনি বললেন, কৃষ্ণশিব, শ্বেতশিব আর শিবলিঙ্গে প্রতীক শিব। এর অর্থ জানিস ?

বললাম, না।

—শোন্ তবে। তিনি এর ব্যাখ্যা দিলেন : কৃষ্ণশিব হলেন অব্যক্ত ব্রহ্ম। অতি প্রাচীনকালে মিশরে এই কৃষ্ণশিবের পূজা হত। আমাদের দেশেও হয়। তন্ত্রসারে কৃষ্ণশিবের মন্ত্র আছে এই রকম :

'মহাকালং যজেদ্দেব্যাদক্ষিণে ধূম্রবর্ণকম।
বিপ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখম শিশুম ॥'

এই কৃষ্ণশিব হল পরম সত্য। সৃষ্টির আদিতে এক এবং অদ্বিতীয়, যাকে এক কথায় বলা যায় অব্যক্ত ব্রহ্ম। গুণ সাম্য প্রকৃতি বীজ হল শিবলিঙ্গ। যেখানে লিঙ্গ রয়েছে যোনির সঙ্গে যুক্ত। একেই বলে সদাশিব। অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ তখনও রয়েছে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে। অর্থাৎ নির্বিকল্প পুরুষের অহম বা আমি, এই বোধ, 'ইহা'

যাকে বলে 'ইদম' তার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে ব্রহ্মপুরুষের কল্পনার মধ্যেই, প্রকাশিত হয়নি। পরম পুরুষের এই অধ্যায়ের চেতনাকেই বলে সদাশিব। শাস্ত্র মতে সাদাখ্যতত্ত্ব। এ থেকেই নানা তত্ত্বের আবির্ভাব, যা থেকে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। আর এই তত্ত্বগুলির মধ্যে মহত্তত্ত্বই হলেন শ্বেত-শিব। এবার বল্ কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরে তুই কি দেখলি?

কিছু না বলে মণিকর্ণি বাবার দিকে তাকিয়ে থাকলাম শুধু। শিবের যে এমনতর কোন অর্থ আছে তা জানা ছিল না। ভগবান, ঈশ্বর, ব্রহ্মণ, এ-সব ব্যাপারে যথার্থ অভিজ্ঞতা আমার নেই। আমি মূর্তি অনুসারেই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী দেবদেবীর কল্পনা করি। ইতিহাসে দেবদেবী সম্পর্কে নানারকম ব্যাখ্যা আছে বটে, সে-সব পড়িও কিন্তু বিশ্বাস করি না। দেবদেবীদের তাঁদের আসন থেকে সরিয়ে দিয়ে পাণ্ডিত্য দেখাবার স্পর্ধা আমার নেই। আমি দার্শনিক হিউমের মত সত্যসন্ধানী নই যে, বলব Truth without God. আমি বরং কান্টের মত চাই God without certain truth. ঐতিহাসিকেরা বলতে চান, শিব হলেন তিব্বতের কোন মহাসাধক। অধ্যাত্ম সন্ধানে তিনি এক সহজ সর্বজনগ্রাহ্য পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন। আর্যদের ধর্ম সাধনার থেকে তাঁর সাধনার ধারা ছিল ভিন্ন। আর্যদের চোখে তাঁর সাধনার ধারাকে প্রথমটা হেয় ও নিকৃষ্ট মনে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে শিব নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিলে শেষপর্যন্ত আর্যরাও তাঁর সাধনপদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শিব বা তাঁর শৈব সাধনার ধারা অনেক প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল। আর্যরা আসবার আগে মহেন-জো-দড়তে শিবের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। কিন্তু ইতিহাসে যাই থাক না কেন আজ শিব ইতিহাসের অতীত। লিঙ্গের অর্থ জানি না, তাকে পরম জ্ঞানে পূজা করি। কৃষ্ণ-শিব শ্বেতশিবের অর্থ জানি না, তাদেরও পরম জ্ঞানে পূজা করি। আমাদের জ্ঞান নেই, বিশ্বাস বড়। তাই মণিকর্ণি বাবাকে জিজ্ঞেস

করলাম—গূঢ় ব্যাখ্যা গুহ্য ব্যাখ্যা, কোনটাই জানি না। এ-সব না জেনেও শিবকে শ্রদ্ধা করি, পূজা করি, ভগবান বলে মানি। এতে কি আমাদের মত সাধারণ মানুষের কোন ফল হয় না?

মণিকর্ণি বাবা হাসতে হাসতে বললেন, যে কাজই কর তার ফল আছে। লিঙ্গমূর্তি বা শিবমূর্তিতে শুধু যদি শিবের কথাই ভাব তাহলে শিব পাবে। লিঙ্গ ভাবলে লিঙ্গ, শিব ভাবলে শিব। ঐ পর্যন্ত, আর কিছু নয়। যে পরম আনন্দের সন্ধান মূল লক্ষ্য, সেটা হবে না। তবে দেবদেবীর উপর পরম নির্ভর অন্ততঃ ভক্তজনকে পার্থিব আকাঙ্ক্ষার হাত থেকে মুক্তি দেবে। মুক্তি দেবে তবে বন্ধন মুক্তি ঘটাবে না। সংসার বন্ধন থেকে শিবের বন্ধনে বাঁধা পড়বে। মুক্তি বলতে যা বোঝা যায় তা পাবে না।

আমার হঠাৎ কি মনে হল জিজ্ঞাসা করলাম: মুক্তি বলে কি কোন কিছু আছে?

তাঁর উজ্জ্বল দুটি চোখ তুলে মণিকর্ণি বাবা আমার দিকে তাকালেন। বললেন, কেন নেই?

বললাম, মুক্তিই যদি পরম লক্ষ্য, তাহলে এই বন্ধন কেন? মুক্ত পুরুষ নিজেই কেন বন্ধন সৃষ্টি করলেন? আকাঙ্ক্ষার অতীত জগতে পৌঁছুলে আবারও তো আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই ফিরে আসতে হবে। মুক্তি আর বন্ধনের খেলাই তো চলেছে আবহমানকাল ধরে। মুক্তি হলেও তো আবার বন্ধন হবে?

মণিকর্ণি বাবা আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, সাব্বাস। এই তো স্থূলতার ঊর্ধ্বে উঠবার বুদ্ধি দেখা দিয়েছে। তবে কি বাবা জানিস? একদিকে কথাটা সত্য বটে, আর একদিকে আবার সত্যও নয়।

—কি রকম?

—যা আছে, তাই নেই। যা বন্ধন তাই মুক্তি। এটাই হল আসল সত্য। বন্ধন মুক্তি আসলে এ-সব কিছুই নেই এই বোধটি দরকার।

বললাম, আমাকে বুঝিয়ে বলুন।

তিনি বললেন, এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখছিস এটা কি ?

বললাম, বস্তুজগৎ, আর কি ?

—বস্তু এল কোথেকে ?

—কেউ বলতে পারে নি।

—বস্তুর অতীত থেকে। এল বললে ভুল হবে, বস্তুর অতীতকে বস্তু বলে মনে হল।

—বুঝিয়ে বলুন।

মণিকর্ণি বাবা বললেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হল শক্তি। অর্থাৎ পুরুষের অর্থাৎ শিবের অর্থাৎ নির্বিকল্প ব্রহ্মের গুণ। ধর একটা রূপোর টাকা। একদিকে তার রাজার মাথা আর এক দিকে লেখা। রাজার মাথাই দেখ আর পেছনের লেখাই দেখ, আসলে টাকাটা টাকাই, একই মূল্য। বস্তুই দেখ, অবস্তুই দেখ আসলে সবই এক। যখন বস্তু হিসেবে দেখি না তখন ব্রহ্মণ। যখন জগৎ হিসেবে দেখি তখন বস্তু। সেই 'এক' যখন নির্গুণ তখন ব্রহ্মণ, যখন সগুণ তখন প্রকৃতি। এই প্রকৃতিই কালী, দুর্গা ইত্যাদি।

বললাম, এদের তাহলে মূর্তি ভিন্ন ভিন্ন কেন ?

মণিকর্ণি বাবা বললেন, 'প্রতীক দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে, তাই এরকম। যে-যেরকম প্রতীক ব্যবহার করেছেন আর কি। যেমন ধর না অঙ্কে যে বিন্দু ব্যবহার করিস সেটা তো একটা প্রতীক। শূণ্য বা বিন্দু দেখতে ছোট কিন্তু ব্যাখ্যা করলে অর্থ অনেক বড়। এইসব প্রতীকেরও তেমনই অর্থ আছে।'

মণিকর্ণি বাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি একটু দেখলেন, তারপর বললেন, তুমি তো বাবা শক্তিরই পুজারী—শিবের নয়। অর্থাৎ তুমি সগুণ ব্রহ্মের উপাসক। চালাক আছ বটে। দারোয়ানকে ঘুষ না দিলে রাজার কাছে যাওয়া যায় না, রাজদর্শন পাওয়া যায় না—এ-কথা জান। ভাল, ভাল। কিন্তু বাবা যখন একটা মেয়েকে ভালবাসছে

তখন তো চাঁদ মুখ দেখে, কিন্তু যখন মাকে ভালবাসছ তখন এমন ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরে নিয়েছ কেন ?

বললাম, মা,-মা, তিনি কুৎসিৎ হলেও সুন্দর, সুন্দর হলেও সুন্দর। সুতরাং ভয়ঙ্কর অভয়ঙ্কর চিন্তা আসবে কেন।

হেসে মণিকর্ণিবাবা বললেন, ভালই বলেছ বাবা। বেড়ে বুদ্ধি আছে, তবে কি জান, এটা সত্য বুদ্ধি নয়। মায়ের অর্থটাই জানা দরকার। তুমি তো জান মা কালী, বাবা শিব। কালী স্ত্রী, শিব স্বামী। তাই না ?

বললাম, হ্যাঁ।

—মা যদি বাবার বুকে দাঁড়ায় তাহলেও শ্রদ্ধা হয় কেন বল।

বললাম, আপনার সঙ্গে তর্কে পারব না। আপনিই এবার মায়ের ব্যাখ্যা করুন।

মণিকর্ণি বাবা বললেন, আসলে শিব হলেন পরম পুরুষ, নির্গুণ ব্রহ্মণ। কিন্তু অব্যক্ত কারণে নির্গুণ ব্রহ্মণের মধ্যে যখন 'ইদম' বোধ জাগে, তখন দেখা দেয় প্রকৃতি। প্রকৃতি থেকে জন্ম নেয় নানা তত্ত্ব। শেষপর্যন্ত ফুটিয়ে তোলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। নানা স্তরে সেই তত্ত্ব বস্তু-জগতের রূপ নেয়। কালী হল পরমের মানসী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপে ফুটে উঠা প্রকৃতি। বর্ণ কৃষ্ণ, কারণ, তাঁরও স্বরূপ বোধের অতীত। চিরকালই অব্যক্ত ব্রহ্মণের মত রহস্যে আবৃত। প্রকৃতি থেকেই হচ্ছে লয়, সৃষ্টি। তাই মায়ের দু'হাতে ধ্বংস, দু'হাতে পালনের বরাভয়। ব্রহ্মণের মতন প্রকৃতিও সীমাহীনা। তাকে আবৃত করবে কে ? তাই তিনি নগ্না। তিনিই সক্রিয় পরম পুরুষ বলে শিবের বক্ষস্থিতা। তাঁর গলায় ও হাতে যে একান্নটি মুণ্ড রয়েছে তাই হল তাঁর যথার্থ পরিচয়। তন্ত্রের মতে সৃষ্টি ফুটে উঠেছে একান্নটি পর্যায়ে। এই একান্নটি পর্যায়কে বলে বর্ণ। এই বর্ণকে যখন প্রতীক দিয়ে ধরা হয় তখন তাকে বলে অক্ষর। এই একান্নটি বর্ণই আমাদের একান্নটি অক্ষর। এর মধ্যেই রয়েছে সমস্ত সৃষ্টি রহস্য ঘুমিয়ে। মায়ের এই স্বরূপ বুঝলে তবেই তাঁকে যথার্থ বোঝা যায়।

কলকাতার ডাস্টবিনে ভুক্তাবশেষ খুঁজে পাওয়া কোন ভবঘুরের মুখ থেকে যদি কেউ কখনও এ-কথা শুনত তাহলে নিশ্চয়ই সে চমকে যেত, কিন্তু মণিকর্ণিকার ঘাটে জ্বলন্ত চিতার পাশে মণিকর্ণি বাবার মুখে এধরনের ব্যাখ্যা শুনে তাঁকে ক্রমশঃই অতীন্দ্রিয় পুরুষ বলে মনে হচ্ছিল। আরও বেশী শ্রদ্ধা ভরে তাঁর কাছ থেকে অন্য কিছু জানবার ইচ্ছে হতেই জিজ্ঞেস করলাম: কালীর ব্যাখা করলেন—যদি একটু দুর্গার ব্যাখ্যা করতেন?

তিনি বললেন, দুর্গা ও কালী তো একই। দুর্গা যখন পরমা প্রকৃতি তখন তিনি ব্রহ্মণেরই মতন দুরাধিগম্য। সেই জন্য দুর্গা। দুর্গা শব্দের অর্থ দূর+গ অর্থাৎ যাকে সহজে ভেদ করা যায় না। আসল দুর্গা সত্যিই দুর্ভেদ্য। কিন্তু দশদিক বাপী যে জ্ঞান, শৌর্য, বিদ্যা, ঐশ্বর্য, পার্থিব অহংকার ইত্যাদি নিয়ে তিনিই আমাদের কাছে বিরাজিতা। নইলে দুর্গাও সগুণ ব্রহ্ম।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, দুর্গার বাহন সিংহ কেন? আর তাঁকে বা পার্বতীই বলা হয় কেন?

মণিকর্ণিবাবা বললেন, ব্যাটার মাঝে মাঝে বোধোদয় হয় দেখছি। তবে বাবা মেয়েছেলেকে ভালবাসবার মন কেন? ভেতরের প্রাক্তনটাকে একটু স্থিতধী হয়ে বসে অনুভব করতে পারিস না? একটু বসলেই তো পেয়ে যাস! যে-মন নিয়ে একটা মেয়েকে পাবার জন্য ভাবিস, সেই মন নিয়ে একটু নিজেকে ভাব্ না। যাক, সে কথা যাক, তোর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি, শোন। পর্বত কাকে বলে? সবচেয়ে উঁচু জায়গা, এই তো?

বললাম, হ্যাঁ।

—পশু কাকে বলে?

আমি মাথা চুলকাতে লাগলাম। পশু কাকে বলে বলা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। প্রতি শব্দ হিসেবে Beast বা Animal এই পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারি আর বেশী কিছু নয়। সুতরাং আমি যেন কিছুটা বোকা বনে গেলাম।

হাসতে হাসতে মণিকর্ণি বাবা বললেন, পাশ দ্বারা আবদ্ধ যে জীব তাকেই বলে পশু। এই পাশ কিসের পাশ? মায়াপাশ। যে-নিজের যথার্থ স্বরূপ বুঝতে না পেরে অজ্ঞানতার পাশে আবদ্ধ হয়ে আছে সেই হল পশু। ছাগল ভেড়া কুকুর বেড়াল মানুষ সবই এই শ্রেণীভুক্ত।' পশুর এই ব্যাখ্যা করে মণিকর্ণি বাবা আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন, পশুর অর্থ বুঝলি?

বললাম, হ্যাঁ।

—আচ্ছা এবার তাহলে বল্। পর্বত যদি সবচাইতে উঁচু জায়গা হয় তাহলে মানুষের সব চাইতে উঁচু জায়গা কোন্‌টা?

আমি মাথায় হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলাম।

তিনি বললেন, এটাই হল পর্বত।

তিনি এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, পশুরাজ কে?

বললাম, পশুর যে রাজা, সেই পশুরাজ। সিংহ।

তিনি হেসে বললেন, পশুরাজ হল পাশবদ্ধ পশুর মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মায়ার স্বরূপ বুঝতে পেরেছে। যে ব্যক্তি মায়ার স্বরূপ বুঝতে পারবেন তাঁর চেতনা স্থূল থেকে সূক্ষ্ম অর্থাৎ মস্তিষ্কে অর্থাৎ তন্ত্রমতে ব্রহ্মরন্ধ্রে বিচরণ করে। সেখানেই প্রকৃতি অহং-অসুরকে নাশ করে পরম নির্গুণ ব্রহ্মণের সঙ্গে মিশে যান। এটাই হল দুর্গার অর্থ।

কলেজে পড়ার সময় বাবা আমাকে একটা বই পড়তে দিয়েছিলেন —Soul of India, লেখক বিপিনচন্দ্র পাল। একই দিনে নাকি বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দের পরমের অনুভব হয়েছিল। অরবিন্দ ঋষি হন। বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল হন পরম বৈষ্ণব। অধ্যাত্ম জ্ঞানে অনুপ্রাণিত হবার পরই তিনি লেখেন Soul of India. এখানে মূর্তি রহস্যের তিনি ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, তিনি মনে করেন মানুষের পরিবেশ ও বুদ্ধিবৃত্তি উন্মেষের স্তরে স্তরে মূর্তিও রূপ কল্পনা পাল্টেছে। আদিম হিংস্র পশু অধ্যুষিত অরণ্যে শক্তি জগদ্ধাত্রী

মূর্তিতে আবির্ভূতা। তিনি পশুকুলকে বশ ও শাসন করে জগৎ নিয়ন্ত্রণ করছেন। জগতের অগ্রগতিতে যখন মানুষের উৎপত্তি মানুষ তখন গোষ্ঠীবদ্ধ জীবমাত্র। সভ্যতার চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয় নি। ক্রোধ তখনও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত নয়। হানাহানি চলছে। তখন শক্তি কালীমূর্তিতে আবির্ভূতা। কিন্তু সভ্যতা যখন পরিপূর্ণ বিকশিত, জ্ঞানে, বিদ্যায়, ঐশ্বর্যে, শৌর্যে তখন সভ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশের কালে শক্তির কল্পনা দুর্গা রূপে। একসময় এই ব্যাখ্যাটাই আমার কাছে দারুন মনের মত হয়েছিল। এতদিন এই ব্যাখ্যা নিয়েই তৃপ্ত ছিলাম। কিন্তু আজ মণিকর্ণিকার ঘাটে মণিকর্ণি বাবার ব্যাখ্যা শুনে তা যেন জলের স্রোতে ভেসে গেল। অধ্যাত্ম দর্শনের ব্যাখ্যা, অধ্যাত্ম পুরুষের কাছ থেকে যা পাওয়া যায়, গৃহী বা অর্ধ গৃহী বা অর্ধ সাধকের কাছ থেকে তা পাওয়া যায় না। অধ্যাত্ম সত্যের সন্ধানে অধ্যাত্ম পুরুষের কাছেই যাওয়া উচিত।

মণিকর্ণি বাবার মুখে কালী ও দুর্গার ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে আমি যেন কোন্ জগতে চলে গিয়েছিলাম। তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অতীন্দ্রিয় কোন জগতের সন্ধান করছিলাম হয়তো। কোন তৈলঙ্গ স্বামী দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি বটে কিন্তু যাকে পেলাম সেই বা কম কি? মনে হচ্ছিল না ছেড়ে যাই। অদ্ভুত আকর্ষণ মণিকর্ণি-বাবার। প্রথম দিকের বীভৎসতা কাটিয়ে উঠে তিনি কখন যে দেবোপম সৌন্দর্যে ভরে উঠেছিলেন কে জানে।

মণিকর্ণি বাবা আমার বিহ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন: —কি রে, মড়া খাই বলে আমাকে আর ঘৃণা হচ্ছে?

আমি কোন কথা বললাম না।

তিনি বললেন, সব চাইতে পবিত্র জিনিষ হল মড়া, কেন, জানিস? সমস্ত দেহের মধ্যে তখন বাসনা কামনা কিছু থাকে না। শব তখন শিব হয়ে যায়। তাই আমি মড়া খেতে ভালবাসি, মড়ার কাছে থাকতে ভালবাসি। হঠাৎ কি ভেবে তিনি বললেন, প্রসাদ খাবি, প্রসাদ?

সশ্রদ্ধায় হাত পাতলাম। মণিকর্ণি বাবা একটুকরো কি দিলেন মড়ার মাংস কিনা জানি না। কিন্তু তখন সে-কথা ভাববার সময় ছিল না। প্রসাদ মুখে দিয়ে মনে হল অমৃত। অমৃত কী জানি না দেবতারা ছাড়া কেই বা তার স্বাদ অনুভব করেছে। কিন্তু আমার মনে হল, এই হল অমৃত। সমস্ত শরীরে একটা অভূতপূর্ব স্নিগ্ধতা অনুভব করলাম যেন। হয় তো কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মণিকর্ণি বাবা বাধা দিলেন। বললেন, না, আর কোন কথা নয়। ফিরে যা, তোকে সবাই খুঁজছে। না বলে ঘর থেকে বেরিয়েছিস কেন?

সে-কথায় কান না দিয়ে আমি আর একটা প্রশ্ন করব বলে আকুলি-বিকুলি করতে লাগলাম। অর্থাৎ আমার জানবার ইচ্ছা ছিল ভবিষ্যৎ জীবন আমার কেমন যাবে?

মণিকর্ণি বাবা আমাকে সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে দিলেন না। আমার মনের কথা আগেই বুঝে নিয়ে তিনি বললেন, মনে রাখবি জীবনে যাই আসুক তাকে মেনে নিয়ে চলবি। ভাল আর মন্দ কি, তোরা কী বুঝিস? বুঝতে হলে নিজের গভীর মনের দিকে তাকাতে হয়। সব কিছুই মেনে নিবি। মনে রাখবি, সবই গভীরতর মনের ইচ্ছা। তোর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে। সেই ইচ্ছার স্বরূপ জানবি নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে জীবনে। তোর মনের এটাই অপূর্ব লীলা। ভালবাসা না পেলেই পূর্ণ হয়। পেলে অপূর্ণ থেকে যায়। ভালবাসতে হবে অনেকবার। বহু ভালবাসার মধ্য দিয়েই যথার্থ ভালবাসার সন্ধান পাবি শেষপর্যন্ত। যা, যা, ফিরে যা এবার, ফিরে যা।

আমাকে আর কিছু ভাববার অবকাশ দিলেন না মণিকর্ণি বাবা যেন উড়ে চলে গেলেন মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে থেকে। দেখতে দেখতে তর্ তর্ করে নেমে গঙ্গার জলে ডুবে গেলেন। কিছুকাল আর তাঁকে দেখতেই পেলাম না। অনেকক্ষণ পরে দেখলাম মাঝ নদীতে ভেসে উঠেছেন। তৈলঙ্গ স্বামীর মত ভাসমান হয়ে জলের উপর চলেছেন। জানি না কোন্ মহারাজকে তিনি তাঁর অহংকারচ্যুত

করবেন, জানি না কোন্ মৃতকে তিনি জীবন দান করবেন, জানি না কোন বঞ্চিত তাঁর কাছে ঐশ্বর্য পাবেন, কোন্ দরিদ্রের দারিদ্র্য কাটবে তাঁর আশীর্বাদে। আমি শুধু জানতে পারলাম আমার ভবিষ্যতের নির্মম নিয়তিকে। ঐশ্বর্যহীন, নামহীন, প্রেমহীন বঞ্চনার জীবন আমাকে যাপন করতে হবে। যথার্থই তা করেছি। মণিকর্ণি বাবার ভবিষ্যৎবাণী বর্ণে বর্ণে আমার জীবনে ফলেছে। কায়ক্লেশে আমার অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। ভালবাসা বঞ্চনা করে গেছে। নাম যশ একবারও জীবনের দুয়ারে উঁকি দেয়নি। মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে চাইলেও দুর্ব্যবহার পেয়েছি। নিজের অর্থ পরের জন্য ব্যয় করে প্রতারক আখ্যা নিয়েছি। প্রথম প্রথম এ-সব ভয়ানক বুকে বাজত, এখন বাজে কম। আকাঙ্ক্ষাকে নিঃশেষিত করতে পেরেছি বুক থেকে একথা বলতে পারি না, তবে আকাঙ্ক্ষিত জিনিষ না পেলে এখন আগের মতন তেমন আর দুঃখ পাই না। এত বঞ্চনার মধ্যেও অন্তরের অভ্যন্তরে ডুব দিয়ে যে পরমার্থের সন্ধান করব সে-সময় করে উঠতে পারি না। এক ভুলের মাশুল গুণে শেষ না করতেই অন্য ভুল করে বসি। তবে কখনও কখনও চেষ্টা করি মনের গভীরতর প্রদেশে ডুব দিতে। একান্নপীঠের সাধক-কাহিনী লিখতে বসে মণিকর্ণিকার ঘাটের সেই মণিকর্ণি বাবার কথাই বার বার মনে পড়তে তাঁর কাহিনী লিখলাম। সেদিন যে-কথা জানতে পারিনি আজ সে-কথা জানতে পেরে এই তৃপ্তি যে, বারাণসীর মণিকর্ণিকার ঘাট একান্নপীঠের অন্যতম একটি পীঠ :

বারাণস্যা বিশালাক্ষী দেবতা কাল ভৈরবঃ।
মণিকর্ণিতি বিখ্যাতা কুণ্ডলং চ মম শ্রুতে ॥

আর মণিকর্ণি বাবা একান্নপীঠেরই অন্যতম এক সাধক। তবে আরও কয়েকবার পর পর কাশী গিয়েও মণিকর্ণি বাবার আর সাক্ষাৎ পাইনি। বহুজনের কাছে জিজ্ঞাসা করে তাঁর নামও জানতে পারিনি। মণিকর্ণি বাবা একেবারেই অজ্ঞাত কাশীর সাধারণ মানুষের কাছে।